গণিত-শিক্ষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গণিতের ইতিহাস

[History of Mathematics]

যে কোন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ইতিহাস জানার একটা সার্থকতা আছে। গণিত-শিক্ষায় তার ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী। J. W. L. Glaisher বলেছেন, "গণিতকে তার ইতিহাস থেকে পৃথক করলে তার যা ক্ষতি হয়, অন্য কোন বিষয়েই এতটা ক্ষতি হয় না"।

আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন স্তরেই গণিতের ইতিহাস পড়ানো হয় না। সাধারণ ইতিহাস পড়ানোর জন্য বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। ইতিহাস আখ্যা দিয়ে যা পড়ানো হয়, তা' রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়া কিছুই নয়। ইতিহাসের নামে বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয়, তা' মূলতঃ এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের অথবা ব্যক্তি বিশেষের একাধিপত্য স্থাপনের বিবরণ মাত্র।

মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে গণিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। গণিতের নব নব আবিষ্কার ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতাও যেমন এগিয়ে গেছে, তেমনই সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে গণিতেরও অগ্রগতি হয়েছে। বস্তুতঃ গণিতের ইতিহাস সভ্যতারই ইতিহাস। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রয়োগ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষ্টি প্রভৃতি যা কিছু মানব-সভ্যতার নিদর্শন তার মূলে আছে গণিতের অবদান। গণিতকে বাদ দিলে আমাদের বর্তমান সভ্যতা তার আদিম অবস্থায় ফিরে যাবে। সভ্যতার যে কোন স্তরে গণিতের অগ্রগতির দ্বারা সেই স্তরের মূল্যায়ন করা সম্ভব। গণিতের অগ্রগতির দ্বারা শুধুই যে সভ্যতার বর্তমান অগ্রগতি নিরূপণ করা যায়, তা নয়। সভ্যতার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অগ্রগতিরও একটা ধারণা গণিতের বর্তমান অগ্রগতির দ্বারা সূচিত করা সম্ভব। বিশুদ্ধ গণিতের বিভিন্ন যুগান্তকারী আবিষ্কার যুগে যুগে সভ্যতাকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করেছে।

প্রাপ্ত-যৌবনে শিক্ষার্থীর মনোজগতে একটা বিপ্লব দেখা দেয়। এই সময় সে সবকিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়। সর্ব বিষয়ে তার একটা অদম্য কৌতূহল দেখা দেয়। এই সময়ই গণিতের ইতিহাস শেখানোর প্রকৃষ্ট সময়। আমাদের দেশের পাঠক্রমে এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবহেলিত। পাশ্চাত্য দেশে মাধ্যমিক স্তরে

গণিতের ইতিহাস ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মনে হয় গণিতের ইতিহাস-শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধিকালের সচেতন কৌতূহল চরিতার্থ করতে এই শিক্ষার যথেষ্ট মূল্য আছে। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ এই বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। ইতিহাস না পড়ানোর কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে গণিতের পাঠক্রম অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল। সমস্ত পাঠ্যবস্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করাই কঠিন হয়। তার উপর গণিতের ইতিহাস সংযুক্ত হলে শিশুদের শিক্ষার উপর চাপ বেশী পড়বে এবং নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্য বিষয় শেষ করা সম্ভব হবে না। আমাদের মনে হয়, এরূপ চিন্তার পিছনে গতানুগতিক মনোভাব বিদ্যমান। যে কোন বিষয় শিক্ষায় সফলতা নির্ভর করে বিষয়টির উপর শিক্ষার্থীর কতখানি আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় তার উপর। গণিতের ইতিহাস যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। সুতরাং গণিতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে তার ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। বিষয়টি জীবন্ত করে তুলতে হলে এ শিক্ষা দরকার।

অনেকে বলে থাকেন যে, গণিত হ'ল রহস্যময় প্রতীক-সম্বলিত একটি বিমূর্ত বিষয়। ইহার সহিত দৈনন্দিন জীবনের কোন যোগ নেই। সুতরাং গণিতের ইতিহাস পাঠেরও কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, আদিম যুগ থেকেই গণিত মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিষয়টির প্রথম সৃষ্টি হয়, সেটি গণিত। সকল যুগে, সকল দেশে, সকল অবস্থায় মানুষের মনের মধ্যে গণিত বদ্ধমূল আছে। এখন আমরা গণিতের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করব।

আমরা আগেই বলেছি যে, সভ্যতা ও গণিতের অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রস্তরযুগের আদিম মানব বন্য প্রাণী অপেক্ষা সামান্য মাত্র উন্নত জীবন যাপন করত। জীবন ধারণের জন্য খাদ্য-সংগ্রহে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করত। এ ১৫০০০ বছরেরও আগেকার কথা। ফরাসী ও স্পেন দেশের গুহাগাত্রে গুহাবাসী মানুষের অঙ্কিত যে চিত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা' থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সে যুগের মানুষের নানারূপ জ্যামিতিক আকার সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। এই সময়কেই আমরা গণিতের ইতিহাসের প্রথম যুগ বলতে পারি। পরবর্তী ৮০০০ বছরে সভ্যতারও যেমন বিশেষ অগ্রগতি হয়নি, গণিতেরও তেমন বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না।

গুহাবাসী মানুষ যখন দলবদ্ধ শান্তিপূর্ণ গোষ্ঠী জীবন বা সমাজ জীবনে অভ্যস্ত হ'ল, তখনই সভ্যতার সূত্রপাত হ'ল বলা যেতে পারে। আদিম মানব পৃথিবীর বিভিন্ন নদী-উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে সভ্যতার পত্তন করেছিল। মিশরের নাইল নদীর তীরে, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটস নদীর তীরে, ভারতের সিন্ধুনদের তীরে, চীন দেশের হোয়াংহো নদীর তীরে প্রথম সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল ৭০০০ বছরেরও আগে।

সংখ্যার জন্ম ঃ

সভ্যতার মূলে আছে গণিত এবং গণিতের ভিত্তিমূল সংখ্যা। আমরা প্রথমেই সংখ্যা-গণিতের আলোচনা করব।

সংখ্যার জন্ম ঠিক কবে হয়েছিল এ কথা বলা যায় না। তবে একথা বলা যায় যে, আদিম মানব ভাষা আবিষ্কারের পরেই সংখ্যা আবিষ্কার করেছিল। এ ঘটনা বহু সহস্র বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

আদিম মানুষের জীবনে বৃহৎ সংখ্যার প্রয়োজন ছিল না। প্রথমে দশটি আঙুলের সাহায্যে দশ পর্যন্ত গণনাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পরে যখন সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে পশু পালন করতে শিখল, তখনই তার প্রয়োজন হল বেশী সংখ্যা গণনা করতে শেখা। দুই হাতে (৫+৫) দশটি আঙুল ও দুই পায়ে দশটি আঙুল থাকায় মানুষ ক্রমে ক্রমে ৫, ১০ ও ২০র দলে বেশী সংখ্যা গণনা করতে শিখল। আদিম মানুষের কাছে বিমূর্ত সংখ্যা বলে কিছু ছিল না। তার কাছে সংখ্যা মাত্রই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হত। যেমন, ৪টি মাছ, ১০টি গরু ইত্যাদি। সংখ্যা শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে সর্বত্র ৫ অথবা ৫-এর গুণিতককে (৫, ১০, ২০ বা ৬০) গণনায় মূল ধরা হয়েছে। কেবল মাত্র সিরিয়াক প্রণালীতে ২ এবং ৪-এর দলে সংখ্যা গণনা করা হয় (২ হাত ও ২ পা)। দক্ষিণ আমেরিকায় কোন কোন আদিম জাতি আজও ৫ কে ১ হাত, ১০ কে ২ হাত, ১৫ কে ২ হাত ও ১ পা, ২০ কে ২ হাত ও ২ পা আখ্যা দিয়ে গণনা করে।

মানুষের পশু-সম্পদ এবং কৃষি-উৎপাদন যখন বেশ বৃদ্ধি পেল, তখন তার গণনা-প্রণালীর উন্নতি সাধনের ও হিসাব সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হল। সে তখন নুড়ি পাথরের সাহায্য গ্রহণ করল। এক-একটি নুড়িকে ৫ অথবা ১০-এর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হ'ল। পরবর্তী পর্যায়ে ১০ কে একটি বিশেষ চিহ্নের (প্রতীক) দ্বারা প্রকাশ করতে মানুষ শিখল।

১০-এর প্রতীকটির সাহায্যে পরবর্তীকালে অনেক বড় বড় সংখ্যা গণনা করা সম্ভব হ'ল। ১০-এর প্রতীককে ভিত্তি করেই বর্তমানের দশমিক প্রণালীর উদ্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—১২ মানে ১০+২ (১+২ নয়)।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার লাভ করে। এর জন্য বড় বড় সংখ্যার হিসাব রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১০-সংখ্যাটি এই হিসাব রাখার পক্ষে ছোট সংখ্যা বলে অনুভূত হয়। সুতরাং আরো বড় বড় সংখ্যাকে ভিত্তি করে গণনা করার দরকার হয়। দশের গুণিতক আরো বড় বড় সংখ্যার জন্য বিভিন্ন প্রতীক নির্দিষ্ট করে এই কাজ চালানো হ'ত।

আমাদের বর্তমান দশমিক গণনা-পদ্ধতির মূলে যে আমাদের দুই হাতের দশটি আঙুল বর্তমান তা এখন সুপরিস্ফুট। দুই হাতে যদি দ্বাদশটি আঙুল থাকত তা'হলে নিশ্চয়ই একটি দ্বাদশমিক গণনা-পদ্ধতি চালু হ'ত।

বর্তমান সংখ্যাপ্রতীক ও দশমিক স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখন-প্রণালীর ইতিহাস এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বর্তমানে ব্যবহৃত সংখ্যা প্রতীক ও সংখ্যার স্থানীয় মান তত্ত্বের আবিষ্কার ঃ

লিখনের আবিষ্কারের বহু পূর্বেই আদিম মানুষ সংখ্যা লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে প্রথমে আঙুলের সাহায্যে গণনা করা হত। এখন একটি আঙুলকে টালি দাগের মত দাগের দ্বারা চিহ্নিত করার কথা ভাবা যায়। বস্তুত টালি দাগের দ্বারাই আদিম মানুষ সংখ্যা লিপিবদ্ধ করত। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমে ক্রমে ১টি দাগের দ্বারা ১ সংখ্যা, ২টির দ্বারা ২ সংখ্যা, ৩টির দ্বারা ৩ সংখ্যা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হতে থাকে। রোমান সংখ্যালিপিতে ৫ সংখ্যাটি V অক্ষর দ্বারা লিখিত হয়। হাতের ৪টি আঙুল একত্রে রেখে বুড়ো আঙুল ফাঁক করে রাখলেই V-আকার ধারণ করে। এইভাবেই ৫-সংখ্যাটি V-প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত হয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, গ্রীস দেশে বর্ণমালার এক-একটি অক্ষরকে এক-একটি সংখ্যার প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হত। গ্রীক বর্ণমালার ২৪টি বর্ণ ক্রমিক ১ থেকে ২৪ পর্যন্ত সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করত। এ ছাড়া আরো তিনটি প্রতীক ছিল পরবর্তী তিনটি সংখ্যার জন্য।

বর্তমানে ০, ১, ২, ৩,……৯ পর্যন্ত দশটি সংখ্যা প্রতীকের সাহায্যে যে কোন বৃহৎ সংখ্যা লেখার যে পদ্ধতি চালু আছে, তা আবিষ্কার করতে মানব-সমাজের হাজার হাজার বৎসর সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই দশমিক স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যালিখন-প্রণালী আবিষ্কারের আগে কোন বৃহৎ সংখ্যার গণনা করা এবং যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সমন্বিত হিসাব রাখার জন্য বিশেষ জটিলতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হত। এগুলি সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়।

বোম্বাই-এর নাসিকে অনেকগুলি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গুহাগুলির গাত্রে নানাবিধ খোদিত লিপি পাওয়া যায়। এই খোদিত লিপিগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যা-প্রতীকও পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মতে নাসিক-গুহায় এই সংখ্যা প্রতীকগুলি ২০০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়। এই প্রতীকগুলি ভালো করে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, বর্তমান ইংরাজী সংখ্যা প্রতীকগুলির সহিত তাহাদের খুব নিকট সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মনে করেন যে, বর্তমানে ব্যবহৃত ইংরাজী সংখ্যা-প্রতীকগুলি হিন্দুদের আবিষ্কৃত প্রতীকগুলির রূপান্তর মাত্র। ঐ সমস্ত গুহা-উৎকীর্ণ সংখ্যা-প্রতীকগুলির মধ্যে ০ শূন্য-প্রতীকটির স্থান নেই। এইজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, শূন্য প্রতীকটির আবিষ্কার পরবর্তী কালে হয়েছে এবং ২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতেও বর্তমান দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালী আবিষ্কৃত হয়নি। *Al-khó-warizmi* নামক একজন আরব গণিতজ্ঞ ৮২৫ খৃষ্টাব্দে একখানি গণিতের বই লেখেন। ইহাতে ১, ২, ৩,…৯ ও ০ এই দশটি প্রতীকের সাহায্যে বর্তমান দশমিক মান অনুসারে সংখ্যালিখন-প্রণালীতে গণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই পদ্ধতি হিন্দুদের দ্বারা আবিষ্কৃত। ভারতে আবিষ্কৃত ৮৭৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলিতেও ০ প্রতীকটি দেখা যায়। এর আগেই যে, ০ শূন্য প্রতীকটি ভারতে

আবিষ্কৃত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সুতরাং বর্তমানে ব্যবহৃত দশটি সংখ্যা-প্রতীক হিন্দুদের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং ঐ প্রতীকগুলির সাহায্যে দশমিক স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যালিখনের আবিষ্কারও হিন্দুরা করেছেন। ভারত থেকে এই নতুন সংখ্যালিখন-পদ্ধতি আরব ব্যবসায়ীদের দ্বারা পাশ্চাত্ত্যে অনুপ্রবেশ লাভ করে। ভারতে কে এবং কোন্ সময়ে এই আবিষ্কার করেছিলেন, তা আজ আর জানার কোন উপায় নেই। এই বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু গণিতবিদ্‌গণ সম্পূর্ণ নীরব। পুরাণের মতে ইহার আবিষ্কর্তা ব্রহ্মা। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ভারতে এই আবিষ্কার হয়। রায় সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, ৪৯৬-৪৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আর্যভট্ট কর্তৃক স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সংকেতটি উদ্ভাবিত হয়েছিল।[১] ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্তের মতে, ভারতে এ আবিষ্কার বহু প্রাচীন। মূল মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, মহাভারতের যুগেও সংখ্যার স্থানীয় মানতত্ত্বটি ভারতে জানা ছিল।[২] ২০০ খৃঃ পূর্বাব্দে লিখিত কিছু কিছু জৈন পুথিতে শূন্য সংখ্যা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।[১] সে যাই হোক্, গণিতের ইতিহাসে এত বড় যুগান্তকারী আবিষ্কার আর হয় নি। আমাদের গর্বের বিষয় যে, এ আবিষ্কার ভারতের। গণনা-পদ্ধতির এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের ফলেই গণিতের অগ্রগতির শিথিল বেগ ক্রমে ক্রমে ঝড়ের বেগে পরিণত হয়েছে এবং বিজ্ঞানের সর্ববিধ উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

এখন আমরা বিভিন্ন দেশে গণিতের অগ্রগতি ও তাদের গণিতবিদ্‌দের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

মেসোপটেমিয়া (**Mesopotamia**) :

খৃঃ পূঃ ৪০০০—২০০০ বৎসর পর্যন্ত এখানে সুমেরীয় সভ্যতা স্থায়ী ছিল। পারস্য উপসাগরের প্রবেশপথে *Tigris* ও *Euphrates* নদীর মাঝামাঝি সুমেরীয়গণ বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে বেশ উন্নত হয়েছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিসাব রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। যতদূর জানা যায় সুমেরীয়গণই প্রথম কাদার চ্যাপ্টা ফলকে স্টাইলাস (*Stylus*) নামক পেন্সিল আকারের এক প্রকার বস্তু দিয়ে দাগ কেটে হিসাব সংরক্ষণ করতেন। স্টাইলাসের এক প্রান্ত বৃত্তাকার ও অপর প্রান্ত ত্রিভুজাকৃতি। কাদার ফলকগুলি পরে রোদে শুকিয়ে নেয়া হত। এঁরাই প্রথম রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন। পরবর্তী ৩০০ বছরে ব্যাবিলোনিয়ায় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই সময়ে হাম্মুরাবি নামে একজন মহান্ রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে ব্যাবিলোনিয়া খুব উন্নত হয়। তিনি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী ৯০০ বছরের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তারপর

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—ত্রিচত্বারিংশভাগ—পৃঃ ১১০-১১৯।
২। ঐ —একচত্বারিংশভাগ—পৃ: ১-১৩ ও ত্রিচত্বারিংশভাগ—পৃঃ ১৬১-১৬২।

আসে খৃঃ পূঃ ৮০০-৬০০ ও ৬০০-৫০০ আসীরীয় ও চাল্ডীয় সভ্যতা। এই সময় ব্যবসায়-বাণিজ্যের আরো প্রসার লাভ ঘটে। রৌপ্য মুদ্রাই বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম ছিল এই সময়ে।

মেসোপটেমিয়ার ৩৫০০ বছরের ইতিহাসে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণিতের বেশ অগ্রগতি ঘটে।

আগেই বলা হয়েছে যে, সুমেরীয়গণ কাদার ফলকে স্টাইলাসের সাহায্যে হিসাব রাখতেন। তাঁরাই সংখ্যা-প্রতীকের উদ্ভাবক। ১ থেকে ৯ সংখ্যার জন্য ১ থেকে ৯টি একই আকারের দাগ কাটা হত। দাগটা চাঁদের কলার মত অথবা ত্রিভূজাকৃতি। ত্রিভুজটির শীর্ষ বিন্দু নিচে থাকে। সংখ্যাগুলি তিনের সারিতে লিপিবদ্ধ হত। ১০ সংখ্যার জন্য বৃত্ত বা শায়িত ত্রিভুজ (শীর্ষ বিন্দু বাম পার্শ্বে) প্রতীক ব্যবহার করা হত। ৬০ সংখ্যা ও ১ সংখ্যার জন্য একই প্রতীক ব্যবহার করা হত। প্রতীকটির অবস্থান ও অঙ্কের হিসাব দেখে কোনটি ৬০ ও কোনটি ১ বুঝতে হ'ত।

শতমূলক (*Centesimal*) ও **ষষ্ঠীমূলক** (*Sexagesimal*) উভয় পদ্ধতিরই উদ্ভাবক সুমেরীয়গণ এবং উভয় পদ্ধতিতেই লেখা হত। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ক্রমে ক্রমে শতমূলক পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়।

ভগ্নাংশের ব্যবহারে সুমেরীয়গণ দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। তাঁরা অন্যোন্যক (*Reciprocal*) সংখ্যার আবিষ্কারক এবং ভগ্নাংশকে কয়েকটি অন্যোন্যক সংখ্যার সমষ্টি হিসাবে প্রকাশ করতেন। যেমন, $\frac{৫}{৮}$ এর স্থলে $\frac{১}{২}+\frac{১}{৮}$ লেখা হত।

গুণন যে পুনঃ পুনঃ যোগের ফল তাও সুমেরীয়গণ আবিষ্কার করেন এবং এইভাবে বিভিন্ন গুণফল লিপিবদ্ধ করেন। আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ এটাও তাঁদের আবিষ্কার। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে তাঁরা ৩ ধরতেন।

ব্যাবিলোনীয়দের সময়ে গণিতের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তাঁরা অন্যোন্যক-গুণন তালিকা প্রস্তুত করেন। বর্তমানের গুণন-তালিকায় যে কোন সংখ্যা n-এর অন্যোন্যক $\frac{1}{n}$ কে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করে ব্যবহার করা হয়। ব্যাবিলোনীয়েরা তাঁদের তালিকায় অন্যোন্যককে ষষ্ঠীমূলক ভগ্নাংশে পরিণত করে ব্যবহার করতেন। পীথাগোরাসের সমকোণী ত্রিভুজ-সংক্রান্ত উপপাদ্যের সীমাবদ্ধ জ্ঞান তাঁদের ছিল। যে আয়তক্ষেত্রের দুইটি বাহু ৩ ও ৪ অথবা ৫ ও ১২ তার কর্ণের বর্গ যে $৩^২+৪^২$ অথবা $৫^২+১২^২$ হবে তা' তাঁরা জানতেন। সকল সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যে ঐরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান সেটি অবশ্য তাঁরা জানতেন না। হাম্মুরাবীর সময়ে বীজগণিতের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে দ্বি-ঘাত, ত্রি-ঘাত এমন কি চার-ঘাত সহজ সমীকরণের সমাধান করা হয়েছে এবং এইসব সমীকরণের সমাধানের সাধারণ সূত্রগুলিও তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন। সমীকরণের ঋণাত্মক বীজ পরিত্যক্ত হত। ব্যাবিলোনীয়গণ জ্যামিতি সম্বন্ধেও চর্চা করেন। বৃত্তে বর্গক্ষেত্র অন্তর্লিখিত করার উপায় তাঁদের জানা ছিল।

জ্যোতির্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষের চর্চা সুমেরীয় যুগ থেকেই সুরু হয়। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৭০০ বছরের আগে এ বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই সময়ে আসীরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আসীরীয়গণ জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত নির্ভুল বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। এই সমস্ত বিবরণীর সাহায্যে গ্রহণ অথবা ধূমকেতুর আবির্ভাব সংক্রান্ত গণনা করা যেত।

চাল্ডীয়গণ জ্যোতির্বিদ্যায় প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেন। খৃঃ পূঃ ৫০০ বছরে *Nabu-Rimannu* নামক একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের সন্ধান আমরা পাই। তিনি চন্দ্র ও সূর্যের দৈনিক গতি লিপিবদ্ধ করেন এবং সৌর বৎসরের মান ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ও ৪১ সেকেণ্ড নির্ণয় করেন। বর্তমানের গণনা অনুযায়ী তাঁর ভুলের পরিমাণ মাত্র ২৬ মিঃ ৫৫ সেঃ। টেলিস্কোপের সাহায্য ব্যতিরেকে এরূপ সূক্ষ্ম গণনা করা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই ঘটনা থেকেই বুঝা যায় যে, সে যুগে গণিতের কতদূর অগ্রগতি হয়েছিল। *Nabu*র ১০০ বছর পরে *Kidinnu* নামে আর এক জ্যোতির্বিদ আরো নির্ভুলতার সঙ্গে গণনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মিশর ঃ

নাইল নদীর তীর বরাবর মিশরীয় সভ্যতা বিকশিত হয়।

প্রাচীন মিশরের গণিতের ইতিহাস *Papyrus*-এ লিখিত দুটি পুঁথি থেকে পাওয়া যায়। প্রথমটির নাম *Rhind Papyrus*। ইহা ১৬০০ খৃঃ পূর্বাব্দে লিখিত এবং বর্তমান ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত। দ্বিতীয়টির নাম *Moscow Papyrus*। ইহা আরো প্রায় ২০০ বছর পরে লিখিত এবং মস্কোয় আছে।

মিশর ও মেসোপটেমিয়ার গণিতে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে মিশরে গণনায় সম্পূর্ণরূপে দশমিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। রোমানদের মত মিশরীয়রা দশ ও তার বিভিন্ন গুণিতকের জন্য বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করতেন। তাঁরা ডান থেকে বাম দিকে লিখতেন। সংখ্যা দুই ভাবে লেখা হত—(১) ছবির সাহায্যে, (২) দাঁড়ি-রেখার সাহায্যে।

মিশরেও মেসোপটেমিয়ার মত ভগ্নাংশকে কতকগুলি অন্যোন্যক-সংখ্যার (*Reciprocal number*) সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা হ'ত। $\frac{2}{n}$ জাতীয় ভগ্নাংশকে (যেখানে n-এর মান 5 থেকে 331 পর্যন্ত যে কোন অযুগ্ম সংখ্যা) অন্যোন্যক-সংখ্যার সমষ্টিরূপে দেখানো হয়েছে *Papyrus*-এ। যেমন—

$$\frac{2}{7}=\frac{1}{4}+\frac{1}{28}$$

$$\frac{2}{97}=\frac{1}{56}+\frac{1}{679}+\frac{1}{776}$$

পরিমিতিতে (*Mensuration*) মিশরীয়গণ যে যথেষ্ট উন্নত হয়েছিলেন তার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁদের পিরামিডগুলি থেকে। পীথাগোরাস উপপাদ্যের সূত্র $B^2+P^2=H^2$, ৩, ৪, ৫ ও ৫, ১২, ১৩ সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যবহার করেছেন।

পিরামিডগুলি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জ্যামিতির খুব সূক্ষ্ম পরিমাপের পরিচয় পাওয়া যায়। সমকোণী আকৃতিতে সর্বোচ্চ ১২″ বা সমকোণের $\frac{1}{২৭০০০}$ ভাগ ভুল পরিদৃষ্ট হয়। *Trapezium* ও বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র তাঁরা আবিষ্কার করেন। *Rhind Papyrus*-এর গণনা থেকে দেখা যায় π এর মান 3·1604 এবং *Moscow Papyrus*-এ $\pi = 3·14$ দেখা যায়। ঘন জ্যামিতির চর্চাও তাঁরা করেছেন। বর্গ পিরামিডের **frustum** গণনায় তাঁরা নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করেছেন।

$$\text{frustum} = \tfrac{1}{3}h\,(a^2 + ab + b^2),$$ যেখানে

a = ভূমির দৈর্ঘ্য, b = উপরের প্রান্তিক দৈর্ঘ্য ও h = উচ্চতা।

আধুনিক গণিতের সাহায্য ব্যতীত এই সূত্র তাঁরা কি ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ঐ সূত্রটি ইউরোপে আরো ৩০০০ বছর পর আবিষ্কৃত হয়।

সরল সমীকরণের সাহায্যে সমস্যা সমাধানও মিশরীয়রা করেছেন। এইরূপ সমাধানে অজ্ঞাত রাশি, যোগ, বিয়োগ ও সমান এইগুলির প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। সমান চিহ্ন হিসাবে ⩾ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রতীকটি থেকেই বর্তমানে ব্যবহৃত সমান প্রতীকটি এসেছে বলে মনে হয়।

গণিতের চর্চা মিশরে পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

গ্রীস ঃ

গ্রীকেরা মেসোপটেমিয়া ও মিশরের গণিতের উত্তরাধিকারী হয়েও তাঁদের সম্পূর্ণ অনুকরণ করেননি। তাঁরা স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন ও তাঁদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল। জীবন সম্বন্ধে তাঁদের প্রচুর আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা যে, জনসাধারণের কাছ থেকে জ্ঞানকে গোপন করে রাখার মত কোন পুরোহিত-সম্প্রদায় তাঁদের মধ্যে ছিল না। মিশরে পুরোহিত-সম্প্রদায়ই জনসাধারণকে অজ্ঞ রেখে জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে দেন নি। গ্রাস দেশে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ধনীদের দৈনন্দিন কাজকর্ম দাসেরাই সম্পন্ন করত এবং তাঁরা জ্ঞান সাধনা ও বুদ্ধিগত আলোচনাতে বেশী সময় নিয়োগ করতেন। এর ফলেই সে দেশে যুক্তিগ্রাহ্য পথে সব কিছু বুঝা ও জানার প্রয়াস হয় এবং একটি বিশেষ যুক্তি-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এই পদ্ধতিতে জানা সহজ সত্যকে অবলম্বন করে বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে তাঁরা অজানা সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। তাঁরাই বর্তমান প্রমাণ-সিদ্ধ জ্যামিতির জনক। *Geometry* শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ—*Geo* (=*earth*) এবং **metria** (=*measurement*) হ'তে উদ্ভূত। ইহার অর্থ দাঁড়ায় জমি-জরিপ। মিশরীয়রা জমি-জরিপ-ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তক। গ্রীকেরা তাঁদের কাছ থেকে উহা গ্রহণ করেন এবং ঐ বিদ্যার নামকরণ করেন *Geometry*। পরবর্তী কালে জ্যামিতি তার মূলগত অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে না। স্বতঃসিদ্ধ (*axioms*), সংজ্ঞা (*definitions*) ও স্বীকার্য (*postulates*) অবলম্বন করে গ্রীকগণ তাঁদের আবিষ্কৃত বিশুদ্ধ যুক্তি-পদ্ধতির সাহায্যে জ্যামিতিকে তার

বর্তমান রূপে উত্তীর্ণ করেন। গ্রীকগণই গণিতকে বিমূর্ত বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। তাঁরা গণিত সংক্রান্ত যে সমস্ত আবিষ্কার করেন সে যুগে তার বিশেষ কিছু বাস্তব মূল্য ছিল না। পাটীগণিত ও বীজগণিত অপেক্ষা জ্যামিতিতেই তাঁরা বেশী দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। এর জন্য অবশ্য তাঁদের প্রতিকূল সংখ্যা লিখন পদ্ধতি দায়ী ছিল। তাঁরা বর্ণমালার এক-একটি অক্ষর দ্বারা এক-এক সংখ্যা নির্দেশ করতেন। যদিও দশমিক পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু দশমিক স্থানীয় মান তত্ত্ব তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। জ্যামিতি বলতেই আমরা ইউক্লিডের (*Euclid*) জ্যামিতি বুঝি। কিন্তু তিনি ইহার জনক নন। থেলস (*Thales*) ৬৪০—৫৫০ খৃঃ পূর্বাব্দ ও পীথাগোরাস (*Pythagoras*) ৫৮২—৫১০ খৃ: পূর্বাব্দ—এই দুজনই প্রকৃতপক্ষে গ্রীক জ্যামিতির জনক। এখন আমরা গ্রীক গণিতজ্ঞদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

থেলস (**Thales**) ঃ

ইনি জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও সংখ্যাশাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখান। তাঁর প্রধান কীর্তি—বর্তমান প্রমাণসিদ্ধ জ্যামিতির প্রবর্তন। তিনি নিম্নলিখিত ৬টি উপপাদ্য প্রথম প্রমাণ করেন।

১। ব্যাস বৃত্তকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

২। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিস্থ কোণ দুটি সমান।

৩। দুটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করলে বিপ্রতীপ কোণদ্বয় পরস্পর সমান হয়।

৪। অর্ধ-বৃত্তস্থ কোণ সমকোণ।

৫। দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতী।

৬। একটি ত্রিভুজের ২টি কোণ ও একটি বাহু অপর একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ ও অনুরূপ বাহুর সঙ্গে সমান হলে, ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হবে।

পীথাগোরাস (**Pythagoras**) ঃ

ইনি থেলসের শিষ্য ছিলেন। জ্যামিতি ও সংখ্যাবিজ্ঞানে তাঁর অনেক অবদান আছে। জ্যামিতিকে প্রমাণসিদ্ধ একটি নিখুঁত বিজ্ঞানের পর্যায়ে তিনিই উন্নীত করেন। তাঁর নাম-চিহ্নিত সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্যটি তিনিই প্রমাণ করেন বলে কথিত আছে। অবশ্য ব্যাবিলোনীয় ও মিশরীয়গণ ১৫০০ বছর পূর্বে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ঐ সূত্রের ব্যবহার জানতেন। চীনারাও তাঁর ১০০ বছর পূর্বে উহা জানতেন। হিন্দুরা বহু পূর্বেই তাহা জানতেন। তবে তাঁর আগে কেহ এই সূত্রটি প্রমাণ করেছেন বলে জানা যায় না। জ্যামিতির আরো কতকগুলি উপপাদ্য তিনি প্রমাণ করেন। তার মধ্যে 'ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ' অন্যতম। ক্ষেত্রফল ও ঘনফল সংক্রান্ত বহু সূত্র তিনি আবিষ্কার করেন। সংখ্যাবিজ্ঞানেও তাঁর প্রচুর অবদান আছে। তিনিই সমগ্র সংখ্যাকে যুগ্ম ও অযুগ্ম রাশিতে বিভক্ত করেন। তিনি দেখান যে, যে

কোন অযুগ্ম রাশি দুইটি বর্গরাশির অন্তরফলের সমান $\{2n+1=(n+1)^2-n^2\}$। তিনি আরো দেখান যে 1 থেকে $2n+1$ পর্যন্ত সমস্ত অযুগ্ম রাশির যোগফল একটি বর্গ রাশি $(n+1)^2$.

হিপোক্রেটস (৪৬০ খৃঃ পূঃ) (Hippocrates) ঃ

ইনি গণিত সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই প্রথম বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বর্গ অঙ্কন করেন এবং ২টি সংখ্যার মধ্য-সমানুপাতী নির্ণয় করেন। বৃত্তসম্বন্ধীয় কয়েকটি উপপাদ্য তিনি প্রমাণ করেন। যেমন—

১। দুটি বৃত্তের সদৃশ বৃত্তাংশস্থিত কোণগুলি সমান।
২। দুটি বৃত্তের ক্ষেত্র তাদের ব্যাসের বর্গের সমানুপাতী।
৩। দুই বৃত্তাংশের ক্ষেত্র তাদের জ্যায়ের বর্গের সমানুপাতী।

অনেকের মতে বিন্দু ও রেখাকে বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করার রীতির তিনিই প্রবর্তক।

প্লেটো (৪০০ খৃঃ পূঃ) (Plato) ঃ

ইনি একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। জ্যামিতিতে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি মনে করতেন জ্যামিতি ভাল করে না জানলে কোন জ্ঞানই আয়ত্ত হয় না। তাঁর প্রবেশ-দ্বারে লেখা থাকত 'জ্যামিতি-অজ্ঞ ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ'। জ্যামিতি-অঙ্কনে রুলার ও কম্পাস ব্যতীত অন্য কিছু ব্যবহার তিনিই নিষিদ্ধ করেন।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ঃ

পরবর্তী গ্রীক গণিতের চর্চা আলেকজাণ্ড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রাভূত হয়। গ্রীক্-সম্রাট আলেকজাণ্ডার মিশরে নাইল নদীর মুখে আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর নির্মাণ করেন এবং সেখানে আলেকজাণ্ড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল ৬৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। আলেকজাণ্ডার নানা দেশ জয় করেন এবং সেই সময় ভারত ও ব্যাবিলন থেকে গণিত-সম্বন্ধীয় বহু পুঁথি ও ফলক সংগ্রহ করে এখানে সংরক্ষিত করেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর টোলেমির (*Ptolemy*') সময়ে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে জ্ঞান চর্চা করেন।

ইউক্লিড (Euclid) ঃ

ইউক্লিডের জীবনী সম্বন্ধে খুব বেশী জানা যায় না। তিনি মিশরীয় ছিলেন এবং আলেকজাণ্ড্রিয়াতে জ্ঞান লাভের জন্য আসেন। পরবর্তীকালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রধান অধ্যাপকের পদে সমাসীন হন। এ প্রায় ৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দের কথা। ইউক্লিডের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—*Elements* নামক জ্যামিতির বইটি। অদ্যাবধি তাঁরই লিখিত *Elements* অবলম্বনে পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যালয়ে জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

Elements মোট ১৩টি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহা একটি সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একটি অংশে তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বীজগণিতের ক্ষেত্রফল-সংক্রান্ত বিভিন্ন সূত্রের প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সঙ্গীত সম্বন্ধেও বই লেখেন।

ইরাটস্‌থিনস (২৭০—১৯০ খৃঃ পূর্বাব্দ) (Eratosthenes) ঃ

ইনি আলেকজাণ্ড্রিয়াতে গ্রীসের দ্বিতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি *'Sieve'* নামে একটি বই লেখেন। ভূগোল-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তিনি স্মরণীয়।

আর্কিমিডিস (২৮৭—২১২ খৃঃ পূর্বাব্দ) (Archimedes) ঃ

ইনি সিসিলীর অধিবাসী ছিলেন এবং আলেকজাণ্ড্রিয়াতে শিক্ষা লাভ করেন তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও আবিষ্কারের বিষয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনিই প্রথম যান্ত্রিক শক্তির উদ্ভাবন করেন। তবে গণিতেই তিনি বিশেষভাবে আগ্রহশীল ছিলেন। গণিতের প্রায় সকল শাখায় তিনি পুস্তক রচনা করেন। তবে জ্যামিতেতেই তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

নিম্নলিখিত উপপাদ্যগুলির তিনিই আবিষ্কর্তা।

১। বৃত্তের ক্ষেত্রফল, উহার পরিধির সমান ভূমিবিশিষ্ট ও ব্যাসার্ধের সমান উচ্চতাযুক্ত একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান অর্থাৎ$=\frac{1}{2}a\ (2\pi a)$, যখন $a=$বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

২। বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও উহার ব্যাসের বর্গের অনুপাত প্রায় 11 ঃ 14 অর্থাৎ $\pi a^2 : 4a^2 :: 11 : 14$.

৩। π $3\frac{1}{7}$ অপেক্ষা ছোট এবং $3\frac{10}{71}$ অপেক্ষা বড়।

Quadrature of the Parabola ও *Spirals* সম্বন্ধেও তাঁর প্রচুর গবেষণা আছে। *Sphere, Cylinder* এবং *Conoids* ও *Spheroids*-সম্বন্ধীয় গবেষণায় তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সংখ্যা-গণিতেও তাঁর অবদান আছে। তিনিই প্রথম সূচক নিয়মের ব্যবহার করেন। *Hydrostatics*-এর ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা অতুলনীয়।

অ্যাপোলোনিয়াস (২৬০ খৃঃ পূর্বাব্দ) (Apollonius) ঃ

ইনি আলেকজাণ্ড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে সেখানেই অধ্যাপনা করেন। তাঁর সময়েই এবং বিশেষ করে তাঁর শঙ্কু-ছেদ (*Conical Section*) সংক্রান্ত গবেষণার ফলে গ্রীক গণিত চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। একটি পূর্ণ শঙ্কু বা দ্বিশঙ্কুকে (একই অক্ষসম্বলিত বিপরীতমুখী দুটি শঙ্কু) একটি সমতল দ্বারা চারটি বিভিন্ন উপায়ে ছেদ করে তিনি দেখান যে চারটি বক্ররেখা সৃষ্টি করা যায়—যাদের নাম বৃত্ত, অধিবৃত্ত, উপবৃত্ত ও পরাবৃত্ত। যদিও শঙ্কু-ছেদ দ্বারা উৎপন্ন বক্ররেখাগুলি সম্পর্কে পূর্বেই গণিতজ্ঞেরা বিদিত ছিলেন, অ্যাপোলোনিয়াসই ঐ

বক্ররেখাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করেন এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাঁর গবেষণার উপর কোন নতুন আলোক সম্পাত হয়নি। সংখ্যাগণিতেও তাঁর অবদান আছে। তিনি π-এর অধিকতর নির্ভুল মান বের করার একটি পন্থা আবিষ্কার করেন।

ডায়োফ্যান্টাস (খৃঃ পূঃ ৩য় শতক) (Diophantus) ঃ

ইনিই আলেকজাণ্ড্রিয়ার শেষ খ্যাতনামা গণিতবিদ্। তাঁর আগে আরো দুজন গণিতবিদের নাম পাওয়া যায়;—**হিপারকাস** (*Hipperchus*) ও **টোলেমি** (*Ptolemy*)। যতদূর জানা যায় হিপারকাসই প্রথম ত্রিকোণমিতিক কোণ-সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং এইরূপ কোণের মান-নির্দেশক একটি সারণী প্রণয়ন করেন। টোলেমি হিপারকাসের সারণী অবলম্বন করে *Almagest* নামক একটি সুসংবদ্ধ পুস্তক রচনা করেন। ঐ পুস্তকটি খৃষ্টীয় ১৭০০ শতাব্দী পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যার একটি পাঠ্য পুস্তক ছিল।

ডায়োফ্যান্টাসের *Arithmet ca* পুস্তকটি গণিতের একটি মূল্যবান সম্পদ। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু ছিল বীজগণিত। এই পুস্তকে তিনি সমীকরণের সাহায্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেন এবং বীজগণিতে প্রতীকের প্রবর্তন করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে তাঁর *Arithmetica* পুস্তকটি সমাদৃত হয়নি।

রোম ঃ

রোমানগণ খুব বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মদক্ষ জাতি ছিলেন। গণিত বা অন্যান্য বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁদের বিশেষ কোন অবদান নেই। ব্যবহারিক জীবনে জমি-জরিপ, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে তাঁরা গণিতের ব্যবহার করতেন। এই সমস্ত কাজের উপযোগী গণিতের জ্ঞান অন্যান্য দেশ থেকে তাঁরা আহরণ করেন। **জেমিনাস** (*Geminus*) নামক একজন রোমান গণিতজ্ঞ গণিতকে বিশুদ্ধ (*Pure*) ও ফলিত (*Applied*) এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষর দ্বারা তাঁরা সংখ্যা নির্দেশ করতেন। যেমন I, V, X, L, C, D, M। এই সংখ্যাসারি এখনও বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ভারত ঃ

ভারতের হিন্দু সভ্যতা খুব প্রাচীন। খৃষ্টজন্মের বহু পূর্বেই এখানকার সভ্যতা বেশ উন্নত ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে গণিতের অগ্রগতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাচীন ভারতের গণিত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বেদ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যা-জ্ঞানের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে ফলিত-জ্যোতিষেরও ভারতে খুব উন্নতি হয়েছিল—এ তথ্য আমরা নানাবিধ সূত্রে জানতে পারি। গণিতের যথেষ্ট উন্নতি না হলে

যে এগুলি সম্ভব হ'ত না, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সংখ্যার বর্তমান প্রতীকগুলি এবং দশমিক স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যা-লিখন-প্রণালী ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সংখ্যার স্থানীয় মান তত্ত্ব মহাভারতের যুগেও ভারতে অজ্ঞাত ছিল না এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। বস্তুত ইহা ব্রহ্মা-সৃষ্ট বলে যে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে—তা থেকেই বুঝা যায় যে, ভারতে ঐ পদ্ধতি কত প্রাচীন কাল থেকে জানা ছিল। ভারতীয়েরা পুঁথি-সংরক্ষণে বিশেষ পটু ছিলেন না এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত থাকার ফলেই আবিষ্কৃত বহু তথ্য ইতিমধ্যে বিনষ্ট হয়েছে। বহু বার বৈদেশিক আক্রমণ এবং বৈদেশিক শাসনের ফলেও বহু পুঁথি বিনষ্ট বা অন্যদেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণের পর ভারত থেকে গণিতের বহু পুঁথি আলেকজাণ্ড্রিয়ায় নিয়ে যান। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতের গণিত সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাও এ পর্যন্ত হয় নি। আমরা যা কিছু জেনেছি, তা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মারফত। ভারতীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে গবেষণা করলে নতুন আলোকপাত করতে পারবেন বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আনুমানিক ৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারত গণিত চর্চার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠে। পরবর্তী ৬০০-৭০০ বছরে যে সমস্ত বিশিষ্ট গণিতবিদ্ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হ'ল।

আর্যভট্ট (Arya Bhatta) :

জন্ম ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে।[১] তিনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্ ছিলেন। গণিত সম্বন্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তকটির চারটি অংশ আছে। তিনটি জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত ও চতুর্থটিতে আছে পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে তেত্রিশটি নিয়ম। রায় সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুরের মতে, তিনিই দশমিক স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যা লিখনের প্রবর্তক। বর্তমানে বিদ্যালয়ে যে বীজগণিত শিক্ষা দেওয়া হয় আর্যভট্টই তার সূচনা করেন। তিনি শ্রেণী (*series*), সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণ সম্বন্ধেও গবেষণা করেন। বর্গমূল নির্ণয়ের একটি নিয়ম তিনি আবিষ্কার করেন। একটি সূত্রের সাহায্যে π-এর মান 3·1416 নির্দিষ্ট করেন। ত্রিকোণমিতিতে তাঁর অবদান স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহন করে যা পরবর্তী যুগে বিষয়টির অগ্রগতিকে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

ব্রহ্মগুপ্ত (Brahmagupta)

৬২৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ইনিও একজন বড় গণিতবিদ্। পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে বই লেখেন। পাটীগণিত অংশে সংখ্যা, ভগ্নাংশ, প্রগতি, সুদ-কষা, তিনের নিয়ম (*Rule of three*), পরিমিতি ও জ্যামিতি-সংক্রান্ত কিছু সমস্যার আলোচনা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বীজগণিতের প্রয়োগ তিনিই প্রথম করেন।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—ত্রিচত্বারিংশভাগ পৃঃ ১১০—১১৯।

ঋণাত্মক রাশি-সংক্রান্ত নিয়ম ও $x^2+px+q=0$ জাতীয় দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের সূত্র তিনি আবিষ্কার করেন। π-এর মান তিনি $\sqrt{10}$ ধরেছেন।

মহাবীর (Mahabir) :

৮৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। মহাবীর ব্রহ্মগুপ্তকে অনুসরণ করেন এবং তদানীন্তন গণিতের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। তাঁর গ্রন্থটিতে ৯টি অনুচ্ছেদ আছে। যোগ, বিয়োগ, বর্গ, বর্গমূল প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ঋণাত্মক সংখ্যা ও শূন্য সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি নিয়মের স্রষ্টা। শূন্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

কোন রাশিকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে গুণফল শূন্য হবে।

কোন রাশিকে শূন্য দিয়ে ভাগ, যোগ বা বিয়োগ করলে রাশিটি অপরিবর্তিত থাকবে।

ভগ্নাংশের ভাগ-ক্রিয়ায় ভাজকের বিপরীত সংখ্যা দ্বারা গুণ করার প্রচলিত নিয়ম তিনিই প্রবর্তন করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে এই নিয়মটি অপরিজ্ঞাত ছিল। তিনি দ্বিঘাত সমীকরণ সম্বন্ধেও গবেষণা করেন। ব্রহ্মগুপ্তের মত π-এর মান $\sqrt{10}$ বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন।

ভাস্কর (Bhaskar) :

আনুমানিক ১১০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীতে শিক্ষালাভ করেন। জ্যোতির্বিদ্যা, পাটীগণিত, বীজগণিত ও পরিমিতি সম্বন্ধে তাঁর বই আছে। 'লীলাবতী' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। পাটীগণিত ও পরিমিতি এর বিষয়বস্তু। কিন্তু বীজগণিত ও বিশেষ করে বিন্যাস সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা আছে। এই গ্রন্থে দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা করা হয়েছে। ০-সংখ্যারও যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। ০-সংখ্যা-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলিও লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি মহাবীর কৃত নিয়মগুলির অনুরূপ। কেবলমাত্র $a \div 0$ জাতীয় সংখ্যার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা যায়। এরূপ সংখ্যাকে তিনি অসীম রাশি বলে বর্ণনা করেছেন। দিক্-নির্দেশক সংখ্যা, ঋণাত্মক রাশি, অজ্ঞাত রাশি ও সরল এবং দ্বিঘাত সমীকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি সফলতার সঙ্গে যথেষ্ট গবেষণা করেন। তাঁকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা হ'ত।

আরব দেশ (Arabia) :

গণিতে আরবদের নিজস্ব অবদান খুব কম। তবে তাঁরা দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণ করে সংরক্ষণ করেন এবং তাঁরাই ইউরোপে এই জ্ঞান বহন করে নিয়ে যান। আরবগণ এইভাবে জ্ঞান সংরক্ষণ না করলে গ্রীস ও ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্য দেশের গণিতের অবদান সম্বন্ধে বর্তমান বিশ্ব অনেকটা অজ্ঞ থাকত।

মধ্যযুগে দীর্ঘকাল-স্থায়ী ধর্মযুদ্ধের ফলে ইটালীর ভেনিস, জেনায়া প্রভৃতি

বন্দর ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠে। এইজন্য সেখানে গণিত-চর্চারও প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইটালীয় ও আরবীয় গণিতবিদ্‌গণ এখানে পরস্পরের জ্ঞানের আদান-প্রদান করেন। এই সময়ে একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞের আবির্ভাব ঘটে। তিনি *Leonardo Fibonacci*।

Leonardo Fibonacci :

ইনি আরবীয় শিক্ষকের কাছে হিন্দু সংখ্যাগণনা-পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করেন। সংখ্যা-গণিতে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন এবং বহু দেশ পর্যটন করে নিঃসন্দেহ হন যে, সংখ্যা-গণনায় হিন্দু-পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সংখ্যা-গণিত সম্বন্ধে একটি পুস্তক লেখেন। এই বইয়ের মাধ্যমে দশমিক স্থানীয় মান-পদ্ধতি ইউরোপে অনুপ্রবেশ লাভ করে। লিওনার্ডো আরো তিনখানি বই লেখেন। একটির নাম '*Practical Geometry*'। অন্য দুটি বীজগণিত সংক্রান্ত। $x^2-y^2=z^2$ জাতীয় সমীকরণ সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখান। শ্রেণী (*Series*) সম্বন্ধেও তাঁর প্রচুর গবেষণা আছে।

$0, 1, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{8}, \frac{5}{16}, \frac{8}{32}, \frac{13}{64}, \frac{21}{128}$ ইত্যাদি শ্রেণীটি তিনি আবিষ্কার করেন এবং বংশগতি সূত্রে বর্তমানে ইহা প্রযুক্ত হয়। সমীকরণ সমাধানে তিনি প্রতীকের ব্যবহার করেন।

পরবর্তী ৩০০ বছর গণিতের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ। ইহার পরই নাম করা যায় **কোপার্নিকাস** (*Copernicus*) (১৪৭৩—১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ) ও **গ্যালিলিওর** (*Galileo*) (১৫৬৪—১৬৪২ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু অন্ধকার যুগের তখনও অবসান ঘটে নি এবং আবিষ্কৃত যাবতীয় তথ্য ভুল বলে অন্ধত্বের কাছে তাঁদের স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই গণিতের অসামান্য দ্রুত প্রসার ও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। গণিতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সমভাবে উন্নতি ঘটে। এর যথেষ্ট কারণও ছিল। প্রথমত, এই সময়ে ছাপাখানার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় দ্রুত জ্ঞানের বিস্তার ঘটা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, ধর্মান্ধতা কিছুটা কমে। তৃতীয়ত, নব নব আবিষ্কার ও যন্ত্রযুগের শুরু হওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার লাভ ঘটে। চতুর্থত, বৈজ্ঞানিকরাও নব নব আবিষ্কারের জন্য উদ্বুদ্ধ হন।

সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে আজ পর্যন্ত গণিতের যেরূপ দ্রুত ও বহুমুখী প্রসার ঘটেছে তার আলোচনা স্বল্প পরিসরে করা সম্ভব নয়। অসংখ্য প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের অসংখ্য গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে সভ্যতার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়ে বর্তমান সভ্য জগতের সৃষ্টি হয়েছে। গরুর গাড়ীর যুগ থেকে এই স্বল্প সময়ে আমরা স্পুটনিকের যুগে পা দিয়েছি। আজ মানুষের কাছে গ্রহান্তর-যাত্রা আর স্বপ্ন নয়—সন্নিকটবর্তী।

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আধুনিক যুগের গণিতে কেবল মাত্র যাঁরা

অসামান্য সংযোজনা করেছেন, তাঁদের ও তাঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেব।

Galileo — ১৫৬৪-১৬৪২ খৃষ্টাব্দ। পেণ্ডুলাম-দোলন তত্ত্ব, *hydrostatic balance*, থার্মোমিটার, টেলিস্কোপ, শক্তি ও গতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী, বলবিদ্যা, *hydrostatics*, জ্যোতির্বিদ্যা।

Kepler — ১৫৭১-১৬৩০ খৃষ্টাব্দ। গ্রহের গতি ও আয়তন নির্ণয়।

John Napier — জন্ম ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ। লগারিদম্ আবিষ্কার ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে।

Briggs — ১৫৫৬—১৬৩১ খৃষ্টাব্দ। *John Napier*-এর লগারিদম আবিষ্কারের পর ১০-মূল বিশিষ্ট লগারিদম সারণী ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত করেন।

Descartes — ১৫৯৬—১৬৫০ খৃষ্টাব্দ। স্থানাঙ্ক জ্যামিতি (*Analytical Geometry*), সমীকরণে চিহ্নের নিয়ম (*Rule of Signs*)।

Fermat — ১৬০১—১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ। *Theory of Numbers, Geometry, Problems of Probability.*

Pascal — ১৬২৩—১৬৬২ খৃষ্টাব্দ। *Geometry of Conics, Pascal's triangle connected with Binomial Theorem, Calculating Machine.*

Wallis — ১৬১৬—১৭০৩ খৃষ্টাব্দ। *Infinite series.*

Newton — ১৬৪২—১৭২৭ খৃষ্টাব্দ। মাধ্যাকর্ষণ, পরিবর্তনশীল বিন্দুর পরিবর্তনের হার (*Fluxional Calculus*), *Differential and Integral Calculus, Binomial Theorem*, বলবিদ্যা, *Hadrodynamics*, জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতি-সংক্রান্ত বহু সূত্র প্রভৃতি।

Leibnitz — ১৬৪৬—১৭১৬ খৃষ্টাব্দ। *Differential and Integral Calculus, Calculating Machine.*

আমাদের ঐতিহাসিক আলোচনায় স্কুল পাঠ্য গণিতের সীমা ছাড়িয়ে আরো কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। উন্নত দেশের সর্বত্র এগুলি সম্পূর্ণরূপে স্কুল-পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে ভবিষ্যতে দ্বাদশ ক্লাস বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অতিরিক্ত বিষয়গুলির সংযোজন হওয়া সম্ভব। ১৮শ—২০শ শতাব্দীতে গণিতের অবিশ্রান্ত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সেগুলি উচ্চতর গণিতের পর্যায়ে পড়ে। সেইজন্য আমরা ঐগুলির আলোচনা থেকে বিরত হলাম। ১৮শ শতাব্দী থেকেই বিশুদ্ধ ও ফলিত—এই দুটি স্পষ্ট ভিন্ন ধারায় গণিতের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। ফলিত গণিতই নব বিজ্ঞানের জন্মদাতা এবং ধারক ও বাহক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক চাহিদা
ও
গণিতের অগ্রগতি

অনেকে মনে করেন যে, গণিত একটি বিমূর্ত বিষয়। মনীষীগণের বিমূর্ত চিন্তা ও সাধনার ফলেই গণিতের অগ্রগতি ঘটে এবং তাঁদের আবিষ্কৃত গণিতের শাশ্বত ফলগুলি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীগণ সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধন করেন। কখন কখন হয়ত সমাজের চাহিদা মেটাতে গণিতজ্ঞগণ সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু গণিতের বিকাশ তার নিজস্ব পথেই সম্ভব হয়েছে। মানব-সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে যদিও সামাজিক চাহিদা মেটাতে গণিতের অগ্রগতি ঘটে কিন্তু পরবর্তী স্তরে গণিতের অগ্রগতি সমাজের চাহিদা-নির্ভর ছিল না। একথা সত্য যে, বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই জ্যামিতির জন্ম; কিন্তু গ্রীক সভ্যতার যুগে জ্যামিতির যে অগ্রগতি ঘটে তার সঙ্গে তখনকার সামাজিক প্রয়োজনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। নিত্য নতুন জ্যামিতিক সত্য আবিষ্কার করাই ছিল তদানীন্তন গ্রীক-মনীষীগণের একটা নেশা—এ যেন তাঁদের কাছে ছিল একটি মানসিক ব্যায়াম,—সময় কাটানোর একটি উপায়।

গণিতের ইতিহাস আলোচনা করলে এ ধারণা টিকে না। অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেখা যায় যে, যে কোন দেশের যে কোন যুগের সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সেই দেশের গণিতের অগ্রগতি নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ গণিতের অগ্রগতি সামাজিক চাহিদাকে অবলম্বন করেই সংঘটিত হয়েছে।

আদিম মানুষ বন্য জীবন যাপন করত। তার জীবনে গণনা করার প্রয়োজন ছিল না। ক্রমে সে গোষ্ঠীজীবনে বা সমাজজীবনে অভ্যস্ত হল। পৃথিবীর বিভিন্ন নদী উপত্যকায় বসতি স্থাপন করল। সে পশু-পালন ও চাষ-আবাদ করতে শিখল। এখন তার গণনা করে গোষ্ঠী সম্পদের হিসাব রাখা দরকার। সে গণনা করতে শিখল। প্রথমে হাতের আঙুলের সাহায্যে, পরে হাত ও পায়ের কুড়ি আঙুলকে অবলম্বন করে। ক্রমশঃ ২, ৫, ১০ ও কুড়ির দলে। ইতিমধ্যে সংখ্যার জন্ম হল। বৃহৎ সংখ্যাকে লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল, কাদার ফলকে স্টাইলাসের সাহায্যে দাগ কেটে।

আমরা প্রথম সভ্য মানুষের দর্শন পাই আজ থেকে প্রায় ৭০০০ বছর পূর্বে মেসোপটেমিয়ায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, মন্দিরই ছিল সমাজ জীবনের কেন্দ্রস্থল। মন্দিরে শুধু ধর্মচর্চাই হত না। শিক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্য এখান থেকেই চলত। কিন্তু মন্দির নির্মাণ করতে কিছুটা গণিতের জ্ঞান থাকা দরকার। মন্দিরের নক্সা করতে হবে, পরিমাপ করতে হবে; মন্দির নির্মাণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী নির্মাণ স্থলে আনতে হবে এবং বহুসংখ্যক লোক নিয়োগ করতে হবে মন্দির নির্মাণ করার জন্য। এ সমস্ত কাজেই গণিতের সাহায্য দরকার।

সে যুগে রঙীন দড়ির সাহায্যে নির্দিষ্ট মাপনীতে (scale) মন্দিরের নক্সা তৈরী করা হত। বস্তুত সুমেরিয়ার একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এই জাতীয় একটি নক্সা আবিষ্কৃত হয়েছে। আরো বহুসংখ্যক পাওয়া গেছে কাদার ফলকে অঙ্কিত। মন্দির নির্মাণের পূর্বে মন্দিরের ভিত্তি চিহ্নিত করাও হত রঙীন দড়ির সাহায্যে। এইসব কাজের জন্য নিশ্চয়ই পরিমাপের একটি স্বীকৃত মানদণ্ড ছিল এবং গণনারও পদ্ধতি ছিল।

মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে পুরোহিতগণ সেখানে হিসাব পত্র রাখতেন। এই হিসাব শুধুমাত্র মন্দির নির্মাণ এবং মন্দিরের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মন্দির ব্যবসায় বাণিজ্যেরও কেন্দ্রস্থল ছিল। তাই সেখানে ব্যবসায়-বাণিজ্যের হিসাবও সংরক্ষিত হত। সরকারের কর আদায়ও এখানে হত। করের হিসাব, বাণিজ্যিক দ্রব্য-সামগ্রীর হিসাব এবং অর্থের লেন-দেনের হিসাব সমস্তই এখানে হত। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের কাল নির্ণয় করাও এখান থেকেই হত। এই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করার উপযোগী অঙ্কের জ্ঞান তাঁদের লাভ করতে হয়েছিল।

আমরা আরও দেখতে পাই যে, একটি মন্দিরের দেবতার অধিকারে ২৭ বর্গ মাইল জমি ছিল। ইহার তিন-চতুর্থাংশ খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এই পরিবারগুলির মধ্যে ছিল ২১ জন রুটী প্রস্তুতকারী ও তাদের ক্রীতদাসী সকল, ২৫ জন মদ্য প্রস্তুতকারী ও তাদের দাস সকল। তাছাড়া ছিল সূতা প্রস্তুতকারী, তাঁতী, কেরাণী ও পুরোহিত সম্প্রদায় এবং তাঁদের পরিবার। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁরা পাটীগণিতে বেশ অগ্রসর হয়েছিলেন।

উল্লিখিত ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ ও ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করতে তাঁদের বহু সমস্যায় পড়তে হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সে সব সমস্যার তাঁরা সমাধানও করেছেন। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে করতে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, কতকগুলি সংখ্যা ও পরিমাণ বার বার আবর্তিত হয়। সুতরাং তাঁরা সেই সমস্ত সাধারণ সমস্যাগুলি ও তাদের সমাধানকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন পরবর্তী কালে ব্যবহারের জন্য এবং এই ভাবেই গণিতের বিভিন্ন তালিকার সৃষ্টি হয়।

মিশরেও মেসোপটেমিয়ার অনুরূপ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এখানে জাতির প্রধান স্বয়ং ভগবানরূপে পূজিত হতেন। তাঁকে দেশবাসী ফারাও বলত। ফারাও জনগণের নিকট হতে কর গ্রহণ করতেন। এই করের পরিমাণ সুমেরীয় যুগে আদায়ী কর অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। ফলে প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থ জমা হত। এই উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে ফারাও আরো বড় বড় কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করাতেন। খাল তৈরী করাতেন। বড় বড় জাহাজ সমেত নৌবাহিনী গঠন করতেন। এমন কি নানাবিধ কাজ কর্ম পরিচালন, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা প্রভৃতি কাজের জন্য তিনি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করতেন।

এই সমস্ত বিরাট কাজ সম্পন্ন করতে হলে পাটীগণিত ও জ্যামিতিতে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই যে ঐ দুই বিষয়ে মিশরীয়দের বিশেষ

আগ্রহ ছিল। একটা খাল খনন করতে বা একটা বড় পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করতে পরিমিতি, লেভেল করা ও জরীপ করার ভালো জ্ঞান থাকা চাই। যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে মিশরীয়গণ এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁরা ঐ সমস্ত বিষয়ের মূলনীতি আয়ত্ত করেছিলেন। প্রতি বছর নীলনদের বন্যায় প্লাবিত জমিকে পুনর্বণ্টন করার সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই তাঁরা ঐ সমস্ত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

একটি নির্দিষ্ট আকারের জমি বপন করতে কি পরিমাণ শস্যবীজ দরকার তার হিসাব কিভাবে করতে হবে তাও তাঁরা শিখেছিলেন। একটি নির্দিষ্ট আকারের শস্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করতে কি পরিমাণ শস্যের দরকার তার হিসাব করতেও তাঁরা জানতেন। নির্দিষ্ট আকারের দেওয়াল বা অট্টালিকা নির্মাণ করতে কত ইটের দরকার তার হিসাব করতে তাঁরা সক্ষম ছিলেন। নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা নানা আকারের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করতে শিখেছিলেন।

গ্রহ-তারকা সম্বন্ধেও প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে বেশ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এই আগ্রহের মূলে কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত অনুসন্ধিৎসা কাজ করেনি। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে তাঁদের ফারাওয়ের ও দেশের ভাগ্য গ্রহ-তারকাদের সঞ্চারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিষয়ে চর্চা করার ফলেই তাঁরা বহু জ্যামিতিক তথ্য অবগত হন এবং বিশেষ করে উন্নয়ন কোণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন।

কোন একজন ফারাও তাঁর রাজত্বকালে স্থির করেন যে, নিজের স্মৃতি স্থায়ী করার জন্য একটি বিরাট সমাধি নির্মাণ করবেন। ফারাওয়ের পরিকল্পনা থেকেই মিশরের পিরামিডের জন্ম। এই পিরামিডগুলি আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। প্রত্যেক পিরামিড একই পরিকল্পনায় এবং নির্দিষ্ট পরিমাপে গঠিত। পিরামিডের চারটি পার্শ্বতল অবশ্যই কম্পাস নির্দিষ্ট চারটি দিক নির্দেশ করে। অনুভূমিক তলের চারটি কোণই সমকোণ (গ্রেট পিরামিডে সমকোণ থেকে পার্থক্য মাত্র ১ ডিগ্রির ১ ভাগের ৩০০ ভাগ)। ভূমির পরিসীমা ও উচ্চতার অনুপাত নির্দিষ্ট (2π)। দক্ষিণ পার্শ্বতলের সঙ্গে সমকোণ উৎপন্ন করে এমন একটি দণ্ডাকৃতি রন্ধ্রপথ আছে যার মধ্য দিয়ে লুব্ধক নক্ষত্রের (*Dog Star, Sirius*) আলো মৃত ফারাওয়ের মস্তকে পড়ে। প্রত্যেক পিরামিডের ক্ষেত্রেই উল্লিখিত পরিমাপগুলি এমন সঠিকভাবে পালিত হয়েছে যে, মিশরীয়দের জ্যামিতির বাস্তব জ্ঞান যে খুব উচ্চমানের ছিল—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হই।

গ্রীকযুগে এসে আমরা দেখতে পাই যে, গ্রীক সভ্যতা বেশ উন্নত হয়েছিল। কিন্তু পাটীগণিতের ক্ষেত্রে গ্রীকদের বিশেষ অবদান চোখে পড়ে না। এর জন্য দায়ী তাঁদের সংখ্যাগণনা ও লিখন প্রণালী। তাঁদের বর্ণমালার প্রত্যেকটি অক্ষর একটি করে সংখ্যার প্রতিভূ ছিল। বর্ণগুলির সাহায্যে সংখ্যাকে প্রকাশের রীতি বেশ ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ছিল এবং বৃহৎ সংখ্যাকে প্রকাশ করতে তাঁরা খুব অসুবিধায় পড়তেন। এই কারণে তাঁরা জ্যামিতি শিক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করেন ও সচেষ্ট হন এবং গণিতের ঐ শাখায় চরম অগ্রগতি

সাধন করেন। আপাতদৃষ্টে মনে হয় যে, গ্রীকগণ কর্তৃক জ্যামিতির এই উন্নতি সাধনের সঙ্গে তাদের সামাজিক চাহিদার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। কারণ যে সমস্ত জ্যামিতিক সত্য তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলির অধিক সংখ্যকের বাস্তব ব্যবহার শুধু সে যুগে কেন পরবর্তী কয়েক শত বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। বস্তুত জ্যামিতির অগ্রগতি সামাজিক চাহিদার অনেক পুরোবর্তী ছিল। কিন্তু এই অগ্রগতির মূলে সামাজিক চাহিদা না থাকলেও গ্রীকদের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ইহাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং এই কারণেই গ্রীকগণ এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেন। গ্রীসের ধনী সম্প্রদায় প্রায় বেকার ছিলেন। তাঁরা বহু ক্রীতদাসের অধিকারী ছিলেন এবং এই ক্রীতদাসরাই তাঁদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করত। সুতরাং তাঁরা বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অফুরন্ত সময় পেতেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, গ্রীকগণ সুমেরীয় ও মিশরীয়দের কাছ থেকে বহু কিছু জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এই পূর্বসূরীরা আমাদের স্বজ্ঞা (*intuition*) ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বহু জ্যামিতিক তথ্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁরা ঐগুলির প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামাননি অথবা প্রমাণ করতে অক্ষম ছিলেন। গ্রীকগণ ঐ সমস্ত তথ্যগুলির পিছনে যে সমস্ত কারণ উপস্থিত ছিল সেগুলি আবিষ্কার করেন। এই কৃতিত্বের পিছনে ছিল তাঁদের সামাজিক অবস্থা—কারণগুলি খুঁজে বার করবার মত যথেষ্ট সময়।

পঞ্জিকার কাল-গণনা করার জন্য গ্রীকগণ জ্যোতির্বিদ্যায় আকৃষ্ট হন এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ লক্ষ্য করতে করতে আবিষ্কার করেন যে, বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের সাহায্যে বিভিন্ন পরিচিত আকৃতির সাদৃশ্য আছে (মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি)। এই রাশিগুলি এবং তাঁদের আবিষ্কৃত জ্যামিতিক তথ্যগুলির সাহায্যে তাঁরা বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এর ফলে তাঁদের জাহাজগুলি পরিচালনা করার বিশেষ যোগ্যতা বাড়ে।

আলেকজাণ্ডারের সময় গ্রীক সভ্যতা চরম উন্নতি করে। বড় বড় নৌবহর, বন্দর, সহর নির্মিত হয়; ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার ঘটে। ফলে শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করা সম্ভব হয়। এই সময়ই আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে বহু বেতনভুক্ বিজ্ঞানী ও শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এখানেই ইউক্লিড, ইরাটস্থিনস, আর্কিমিডিস প্রভৃতি গণিতজ্ঞ আজীবন গবেষণা কাজে লিপ্ত থেকে তাঁদের অমূল্য অবদানগুলির দ্বারা বিশ্বজ্ঞানের ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করেন। এই সমস্ত অবদানগুলির মূলে ছিল তৎকালীন সামাজিক চাহিদা। রোমান আক্রমণ প্রতিহত করার উপযোগী করে রাজ্যের সমরাস্ত্র ও সমরায়োজনকে গড়ে তোলার জন্য যে সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবের প্রয়োজন দেখা দেয়—সেগুলির সমাধানের মধ্যে দিয়েই আর্কিমিডিসের আবিষ্কারগুলি রূপ পরিগ্রহ করে। ইরাটস্থিনস যে পৃথিবীর মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছিলেন এবং ইহার মানচিত্রও যে প্রস্তুত করেছিলেন তাও ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। নৌবহরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য গ্রাকগণ বড় বড় সমুদ্র অভিযানে তৎপর হন। তার ফলেই পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের বিস্তার লাভ ঘটে।

ভারতের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে, সামাজিক চাহিদা তার গণিতের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। বৈদিক যুগে যজ্ঞের জন্য বেদী নির্মাণ করা হত। এই বেদী নানা জ্যামিতিক আকারের হত। বেদী নির্মাণের জন্য জ্যামিতির জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় পণ্যের বাজার দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা বাণিজ্যে খুবই অগ্রগামী হয়েছিলেন। তাই প্রাচীন ভারতীয় গণিতে আমরা সুদ, লাভ-ক্ষতি, ঋণ, কর, মূল্যের ভেদ (variation of prices) প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান দেখতে পাই। ভাস্করের গ্রন্থগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে, টাকা. সুদ শতকরা ৩$\frac{১}{২}$ থেকে ৫ হারে ছিল। আবার খাদ্য ও শ্রমের মূল্যও আলোচ্য বিষয় ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসের মূল্যও কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহাও আলোচিত হয়েছে। ১৬ বছর বয়সের ক্রীতদাসীর মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী হত এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য কমে যেত।

বাণিজ্যের প্রয়োজনে হিন্দুদের খুব বড় বড় সংখ্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সেগুলি নিয়ে হিসাব করতে নানা সমস্যা দেখা দিত। তাঁরা এমন একটা সংখ্যা পদ্ধতির প্রয়োজন অনুভব করেন যার সাহায্যে এই সব সমস্যার সমাধান করা যায়। গ্রীকদের মত হিন্দুদের কোন কৃষ্টিগত উত্তরাধিকার ছিল না। তাঁরা তাদের গণিতের গোড়াপত্তন নিজেরাই করেন। এইজন্য তাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে তারা সংখ্যা গণনার দশমিক পদ্ধতি, সংখ্যার স্থানীয় মানতত্ত্ব ও শূন্যের আবিষ্কার করেছিলেন। আরও দ্রুত ও সহজ উপায়ে গণনার জন্য নানা সূত্রের প্রয়োজন তারা অনুভব করেন। তার ফলেই আধুনিক বীজগণিতের জন্ম হয়। অবশ্য তাঁদের আগে গ্রীকদের মধ্যে অনুরূপ ধারণার বীজ দেখা যায়—কিন্তু তাঁদের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল।

পরবর্তীকালে মধ্যযুগে আমরা দেখতে পাই যে, ইউরোপের ব্যবসায়-বণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল ইতালী। তাই এখানেও গণিতের অগ্রগতি কিছুটা পরিদৃষ্ট হয়। ফিবানাকসি ইতালীতে ও ইউরোপে হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন করেন। ইতালীয় বণিক সম্প্রদায় এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

ইতালীয় বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক ভারতীয় সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি গ্রহণের ফলে আধুনিক বাণিজ্য গণিতের উদ্ভব হয়। কারণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য তাঁরা আরো প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতিতে বুক-কীপিং-এর অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হন এবং পাটীগণিতের সমস্যাগুলি বিভিন্ন শীর্ষে ভাগ করা সহজ হয়; যেমন, অনুপাত, সমানুপাত, সুদ, লাভ, ক্ষতি প্রভৃতি। তাছাড়া প্রচলিত পদ্ধতিরও তাঁরা সরলীকরণ করেন। তাঁরা পাটীগণিতকে সাতটি মৌলিক ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। এইগুলি হচ্ছে,—সংখ্যা গণনা, যোগক্রিয়া, বিয়োগ ক্রিয়া, গুণ ক্রিয়া, ভাগ ক্রিয়া, শক্তিতে উন্নয়ন ও বীজাকর্ষণ (*extraction of roots*)।

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতেও সামাজিক চাহিদার প্রভাব গণিতের উপর যথেষ্ট

পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের কামান প্রস্তুত করা ও তাহা বেশী নির্ভুলতার সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতিকে কাজে লাগান হয়। বাণিজ্যের প্রসারকল্পে দূর দূর অজানা দেশের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য জ্যোতির্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি করা হয়। ঐ একই উদ্দেশ্যে নতুন-নতুন জটিল যন্ত্রেরও উদ্ভাবন করা হয়। এগুলি প্রস্তুত করার জন্য গণিতকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকে অগ্রসর হয়ে নানাবিধ বাস্তব সমস্যার সমাধানে পথ দেখাতে হয়।

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। কোন দেশই আজ আর বিচ্ছিন্ন নয়। কোন দেশেরই জ্ঞান আজ আর দেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গণিতের অগ্রগতিও তাই দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীকে সাহায্য করছে। ফলে আজ গণিত বিজ্ঞানের সেবায় নিবেদিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গণিতের ইতিহাসের মূল্য

[The Value of History of Mathematics]

Hogben বলেছেন, 'গণিত সভ্যতার দর্পণ'। গণিতের ইতিহাস পাঠের দ্বারা আমরা জানতে পারি—আদিম মানুষ কিভাবে ধাপে ধাপে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে বর্তমানের সুসভ্য মানুষে পরিণত হয়। গণিতের ইতিহাস পাঠের যে একটা শিক্ষাগত মূল্য আছে, সেটা আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ এ পর্যন্ত অবহেলা করেছেন। যে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হ'লে বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। গণিতের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা সমধিক। সাধারণ ছাত্রের গণিত সম্বন্ধে আগ্রহ দূরে থাক—একটা ভীতি আছে। অনেক মেধাবী ছাত্রকেও গণিতকে এড়িয়ে চলতে দেখা যায়। বহু কৃতী ব্যক্তিকেই বলতে শুনা গেছে, 'অঙ্ক আমার মাথায় ঢুকে না'; 'অঙ্কে আমি খুব কাঁচা ছিলাম' ইত্যাদি। অনেকেরই ধারণা গণিত শিক্ষায় জন্মগত স্বতন্ত্র বুদ্ধির দরকার। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে যে কোন সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুই গণিতে সাফল্য দেখাতে পারে। বিষয়টি শিক্ষার্থীর কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারলেই তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। গণিতের ইতিহাস যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই সরস। গণিত-শিক্ষায় গণিতের ইতিহাসের সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হলে শিক্ষার্থী বিষয়টিতে অধিকতর আগ্রহী ও মনোযোগী হবে। গণিতের ইতিহাস-শিক্ষার শিক্ষাগত মূল্য সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করব।

যে কোন বিষয়-শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক মূল্য বিষয়টির প্রতি আগ্রহী করে তুলে। দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষার প্রয়োগ না থাকলে শিক্ষকেরও শিক্ষাদানে উৎসাহ স্তিমিত হয়। শিক্ষার্থীরও বিশেষ আগ্রহ জন্মায় না। বিষয়টির জ্ঞান বাস্তব জীবনে অপরিহার্য এই ধারণা শিক্ষায় প্রেরণা দান করে ও শিক্ষার কাজে সহায়তা করে। গণিতের ইতিহাস-শিক্ষার মধ্য দিয়াই আমরা জানতে পারি যে, সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই গণিতের জন্ম ও অগ্রগতি। গতি কখনও শ্লথ আবার কখনও বেগবান। কিন্তু এই গতি কখনও স্তব্ধ নয়। চাষ-আবাদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পূর্ত, বিজ্ঞান, দর্শন, পদার্থবিদ্যা, জোতির্বিদ্যা প্রভৃতি সব কিছুর প্রয়োজনে গণিতকে এগিয়ে আসতে হয়েছে সভ্যতার সকল স্তরে।

গণিত প্রতীকমূলক ভাষায় লেখা হয়। প্রতীকমূলক ভাষা যথার্থ হৃদয়সঙ্গম করতে না পারলে গণিতের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। প্রতীকগুলির সহিত ইতিহাস ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত; গণিতের ইতিহাস পাঠ করলে প্রতীকগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সম্যক ধারণা হওয়া সম্ভব।

গণিতের অনেক কঠিন অংশ ইতিহাসের মাধ্যমে উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থীর

অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব। বিষয়টির মধ্যে রসের সঞ্চার করতে পারলে বিষয়টি সহজবোধ্য হয়।

গণিতের কোন নতুন অধ্যায় পাঠদানের পূর্বে তার ইতিহাস আলোচনা করলে শিক্ষার্থীর বিষয়টি শেখার জন্য আগ্রহ জন্মায়।

ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে গণিত-শিক্ষা দিলে শিক্ষা মনোগ্রাহী হয়। ইহাতে প্রচলিত শিক্ষণ-পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়। শিক্ষার্থীর ধারণা দৃঢ়মূল হয়।

ইতিহাসের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে গণিতের বিভিন্ন শাখা ও অংশের আপাত-বিচ্ছিন্নতা সুসম্বদ্ধ রূপ ধারন করে। জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। ইহার ফলে একটি বিশেষ শাখায় বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা থেকে শিক্ষার্থী বিরত হয়।

গণিত যে একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়—অন্যান্য বহু বিষয়ের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধযুক্ত—ইতিহাস পাঠ করলেই তাহা বুঝা যায়।

ইতিহাস পাঠের দ্বারা গণিতের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইতিহাস-পাঠ শিক্ষার্থীকে তার ভুল-ত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করে।

ইতিহাসপাঠের দ্বারা শিক্ষার্থী বুঝতে পারে যে, গণিত একটি জীবন্ত প্রগতিশীল বিষয়।

গণিতের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, গণিতে সুসম্বদ্ধ চিন্তা অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। ইহাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থান নেই। শিক্ষার্থীও সেইজন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

গণিতের ইতিহাস পাঠের দ্বারা গণিতের যে সমস্ত ক্ষেত্র অনাবিষ্কৃত আছে—শিক্ষার্থী সেগুলি আবিষ্কার করার প্রেরণা পায়।

যে সমস্ত সমস্যার পূর্বেই সমাধান হয়েছে গণিতের ইতিহাস জানা থাকলে সেগুলির সমাধান প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর সময় ও শক্তির অপব্যয় হয় না।

ইতিহাস পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থী বুঝতে পারে যে, গণিতের মত নির্ভুল বিজ্ঞান আর নেই। গণিতের যে কোন সমস্যার উত্তর একটিই হয়। সর্বদেশে, সর্বকালে গণিতবিদ্গণ গণিতের যে কোন সমস্যার উত্তর সম্বন্ধে একমত।

প্রাপ্তযৌবনে শিক্ষার্থীর বীরপূজা করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এই সময় সে তার পূর্বপুরুষদের অতীত কীর্তি জানতে চায়। গণিতের ইতিহাস মানব জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে এবং তা পাঠ করলে শিক্ষার্থী উহার সঙ্গে পরিচিত হয়।

মানব জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য হাজার হাজার বছর সময় অতিবাহিত হয়েছিল। এই বিকাশ বিভিন্ন ক্রমোন্নত স্তরে সংঘটিত হয়েছিল। মানুষের স্বল্পস্থায়ী শিশুজীবনেও তার প্রত্যেকটি স্তর প্রতিফলিত হয়। গণিতের ইতিহাসের মধ্যেও ঐ স্তরগুলি রূপায়িত হয়েছে। গণিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ঐ স্তরগুলি সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই স্তরবিন্যাস অনুযায়ী শিশুর গণিত শিক্ষা হওয়া দরকার। তা না হ'লে শিশুর স্বাভাবিক জীবনবিকাশ ব্যাহত হবে।

শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা অর্জন না করতে পারলে শিক্ষকের শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হয় না। সুষ্ঠুভাবে গণিতের ইতিহাস শিক্ষা দিতে পারলে শিক্ষকের জ্ঞানের প্রসারতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর আস্থা জন্মায় ও সে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শেখে।

গণিতের ইতিহাস শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গণিতের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার কোন স্তরেই গণিতের ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা নেই। এইজন্য গণিতের এই দিকটি বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অবহেলিত। কিন্তু শিক্ষক যদি মনে করেন যে, পাঠ্য-সূচী বহির্ভূত বিষয়ের আলোচনা করলে শ্রেণীর কাজের ক্ষতি হবে, তাহলে তিনি ভুল করবেন। তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, ধারাবাহিকভাবে গণিতের ইতিহাস শেখানোর সুযোগ তাঁর না থাকলেও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠদান করতে করতে প্রসঙ্গক্রমেই ইতিহাসের অবতারণা করা যায় এবং সেই দিকেই তাঁকে দৃষ্টি দিতে হবে। গণিতের ইতিহাস শেখানো তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—গণিত বিষয়টি শেখানো ও এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাগত লক্ষ্যে পৌছানোই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

গণিত একটি নীরস বিষয়—তাকে প্রাণবন্ত করে ছাত্রদের বিষয়টির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি না করতে পারলে শিক্ষকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। এইখানে গণিতের ইতিহাস তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। যে কোন অধ্যায় আলোচনা করার আগে শিক্ষক যদি সেই বিষয়টি কিভাবে আবিষ্কৃত হল; ধীরে ধীরে কিভাবে উহার অগ্রগতি ঘটল; কোন সামাজিক অবস্থায়—কিরূপ সমস্যার সমাধান করতে উহার উদ্ভব হল—এগুলি আলোচনা করেন তাহলে বিষয়টির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ বাড়বে, তারা বুঝবে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে গণিতের মূল্য কতখানি। তাদের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনেই যে গণিত শেখা দরকার এটা তারা হৃদয়ঙ্গম করবে। আবার গণিতের বহু বিষয় আছে যাদের মূলনীতিগুলি ছাত্রেরা ভালোভাবে বুঝতে পারে না। ইতিহাস আলোচনা করলে তাদের ধারণা পরিষ্কার হবে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে অধিকাংশ ছাত্রই π যে একটি মূলদ সংখ্যা নয় তা জানে না। হায়ার সেকেণ্ডারীতে গণিতে ভালভাবে পাশ করেছে এমন বহু ছাত্রই π বলতে $\frac{22}{7}$ অথবা 3·1416 বোঝে। এই মানগুলি যে π-এর আসন্ন মান এবং এমন কোন মূলদ সংখ্যা নেই যার দ্বারা π-এর মান প্রকাশ করা যায়—এই তথ্যটি তারা জানে না বা বোঝে না। π-এর ইতিহাস আলোচনা করলে এ ব্যাপারটি তাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। তারা দেখবে যে π-এর মান বার করার চেষ্টা কিভাবে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। মিশরীয় যুগ থেকে π-এর বিভিন্ন মান ধরা হয়েছে। আর্কিমিডিস π-এর মান $\frac{22}{7}$ ধরলেও দেখিয়েছেন π-এর মান $3\frac{10}{71}$ ও $\frac{22}{7}$এর অন্তর্বর্তী। আর্যভট্ট ধরেছেন 3·1416। ১১শ থেকে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত π এর অসংখ্য আসন্ন মান বার করা হয়েছে; এমন কি পাঁচশত দশমিক স্থান পর্যন্ত। এইরূপ আলোচনা থেকে ছাত্রেরা π-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে পারবে। এতে তারা মূলদ ও অমূলদ সংখ্যার পার্থক্যও উপলব্ধি করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গণিত কাকে বলে

[What is Mathematics]

ইংরেজী *Mathematics* শব্দটি '*mathemata*'—এই গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত। ইহার অর্থ 'যে সমস্ত জিনিস শিক্ষা করা যায়'। গণিত একটি বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্র। গণিত সম্বন্ধে উল্লিখিত ব্যাপক অর্থ টি প্রয়োগ করা কেমন একটু অদ্ভুত লাগে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, প্রচীন গ্রীসে কেবলমাত্র সংখ্যা ও বিভিন্ন মাত্রিক আকারই (*figures in space*) গণিতের বিষয়বস্তু ছিল না—জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীতও গণিত শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে অবশ্য জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীত গণিতের অঙ্গীভূত নয়। উহারা দুটি ভিন্ন বিষয় বলে আখ্যাত। এ সত্ত্বেও গণিতের এলাকা আজ ব্যাপকতর হয়েছে।

গণিত একটি বিরাট বিষয়। ইহার পরিধি দিনের পর দিন বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়ে এসেছে এবং এখনও হচ্ছে,—ভবিষ্যতে আরো হবে। এরূপ ক্রমবর্ধমান একটি বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ—যেমন সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত 'শিক্ষা', গভর্নমেণ্ট প্রভৃতি শব্দের। *Benjamin Peirce* বলেছেন, '**প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যে বিজ্ঞান সাহায্য করে তার নাম গণিত**। তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। সুতরাং এরূপ অনিশ্চিত একটি সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ অনুরূপ আরো সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন—

১। **বিমূর্ত চিন্তনে যে বিজ্ঞান সাহায্য করে ;**
২। **নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যে বিজ্ঞান সাহায্য করে ;**
৩। **প্রতীকমূলক ভাষা ;**
৪। **সংখ্যাশাস্ত্র।**

এই সংজ্ঞাগুলিও হয় অস্পষ্ট অথবা সঙ্কীর্ণ। এগুলির কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়।

অধ্যাপক *J. W. Young*-এর মতে 'যাবতীয় বিমূর্ত গাণিতিক যৌগিক (*abstract mathematical system*) ও তাদের যাবতীয় বাস্তব প্রয়োগকেই গণিত বলে'। এখানে বিমূর্ত গাণিতিক যৌগিক বলতে বুঝতে হবে 'আধেয়-শূন্য প্রতীক যৌগিক (*system of symbols devoid of content*)'। অবশ্য প্রতীকগুলি সম্পর্কে যে সমস্ত বিষয় স্বীকার করে লওয়া হয়েছে, সেগুলি নিহিত থাকবে।

গণিত-শাস্ত্র যে যুগ যুগ ধরে বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও যে প্রচুর—অধ্যাপক *Young*-এর সংজ্ঞা তার ইঙ্গিত বহন করে।

আমরা আগেই বলেছি যে, গণিতের মত একটি ক্রমবর্ধমান বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া

সহজও নয় সম্ভবও নয়। তবে বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের দিকে নজর রেখে বলা যায় যে, গণিত সংখ্যা, প্রতীক, বিভিন্ন মাত্রিক আকার, গতি ও কালের বিজ্ঞান। ঐগুলি সম্বন্ধে গণিত কিছু মৌলিক ধারণা প্রদান করে। ঐ ধারণাগুলি অবলম্বন করে যে সমস্ত যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হয় সেগুলি এবং দৈনন্দিন গণনায় ও পরিমাপে তাদের বাস্তব প্রয়োগ গণিতের বিষয়বস্তু। সুতরাং গণিত-বিজ্ঞান বিমূর্ত ও মূর্ত উভয়ই (*abstract and concrete*)। বিমূর্ত এই অর্থে যে কতকগুলি প্রকল্পের ভিত্তির উপর গণিত নানারূপ যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত সংগঠন করে। ইহাকে মূর্তও বলা যায়, কারণ সংখ্যা ও আয়তন-সংক্রান্ত স্বজ্ঞালব্ধ (*intuitive*) বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে ইহার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং যে ভৌত-জগতে আমরা বাস করি তার একটি বাস্তব ব্যাখ্যা দেওয়া গণিতের দ্বারাই সম্ভব।

গণিতের পরিধি (Scope of Mathematics) :

গণিত সমস্ত বিজ্ঞানেরই প্রবেশদ্বার। যে কোন আধুনিক বিজ্ঞান, এমন কি অনেক কলাও গণিতের উপর নির্ভরশীল। গণিত বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করে না। কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে সাহায্য করে। **Helmholpz বলেছেন,** 'সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য গণিতের সঙ্গে মিলিয়া যাওয়া'। **James Jeans**-এর মতে, "প্রকৃতি থেকে বিজ্ঞান যা কিছু আহরণ করে সেগুলি মূলত গাণিতিক ; মনে হয় একজন বিশুদ্ধ গণিতজ্ঞ এই বিশ্বের পরিকল্পনা করেছেন"। **Richard বলেন,** 'বিশ্ব-প্রকৃতির যাবতীয় সত্য গাণিতিক সমীকরণে রূপ পরিগ্রহ করে'।

আধুনিক গণিতের শিক্ষাক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইহার অনেকগুলি শাখা আছে। তাদের মধ্যে **পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও বিশ্লেষণ বা অপেক্ষক তত্ত্ব** (*Analysis or Theory of Functions*) প্রধান। এই শাখাগুলির শ্রেণীকরণের ভিত্তি বর্তমানে শিথিল। **বস্তুত শাখাগুলির পৃথকীকরণ অপেক্ষা একীকরণের দিকেই এখন ঝোঁক দেখা গিয়াছে।** মূল চারিটি শাখা যেন ক্রমশ পরস্পর জড়িয়ে বা মিশে যাচ্ছে অথবা পরস্পর সন্নিকটবর্তী হচ্ছে। তাদের মধ্যেকার সীমারেখা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

বিদ্যালয়ে পাঠ্য গণিত কয়েকটি অংশে বিভক্ত। সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

॥ ১ ॥ *পাটীগণিত* :

ইহা সংখ্যা বা পরিমাণ গণিত। এই শাখাটি সংখ্যাকে অবলম্বন করে গঠিত। যেমন, ৩, ১০½, ১২·৫। এরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল ইত্যাদি যখন আমরা করি, তখন আমরা পাটীগণিতের ক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

॥ ২ ॥ বীজগণিত :

যখন নির্দিষ্ট সংখ্যা না নিয়ে, সংখ্যাসংক্রান্ত এমন সম্বন্ধ স্থাপন করি যা সমগ্র সংখ্যাদলেই প্রযোজ্য হবে, তখন আমরা বীজগণিতের বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করি। বীজগণিতও সংখ্যা বা পরিমাপের বিজ্ঞান। এখানে 'a' বা 'b' বর্ণ সমগ্র সংখ্যার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ

$$(a+2)^2 = a^2 + 4a + 4$$

সূত্রটিতে 'a' বর্ণটি যে কোন সংখ্যার প্রতিভূ হতে পারে। 'a' বর্ণটির মান, 1, 5 অথবা 10, যাহাই ধরি না কেন সূত্রটিতে প্রকাশিত সম্বন্ধ অপরিবর্তিত থাকবে।

॥ ৩ ॥ জ্যামিতি :

বিন্দু, তল বা ত্রিমাত্রিক আকার অবলম্বন করে যে বিজ্ঞান গঠিত, তাকে জ্যামিতি বলে। ইহা বিভিন্ন মাত্রিক আকার, তাদের ধর্ম ও পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তাদের পরিমাপ করতেও শেখায়। সামতলিক জ্যামিতির বিষয়বস্তু হচ্ছে—বিন্দু, রেখা এবং দ্বিমাত্রিক তলে অবস্থিত বিভিন্ন আকার। ত্রিমাত্রিক আকার বিশিষ্ট যা কিছু তা ঘন জ্যামিতির অন্তর্গত।

॥ ৪ ॥ ত্রিকোণমিতি :

কোন ত্রিভুজের কয়েকটি অংশ জানা থাকলে, অপর অংশগুলি বাহির করা এবং ত্রিভুজসংক্রান্ত নানারকম সমস্যা সমাধান করা এই বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব। ইহা জ্যামিতির একটি প্রশাখা।

॥ ৫ ॥ স্থানাঙ্ক জ্যামিতি :

ইহা বীজগণিত ও জ্যামিতির সমন্বয়ে গঠিত। ইহার সাহায্যে বিভিন্ন মাত্রিক আকারের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সরলরেখা, বৃত্ত, অধিবৃত্ত, উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত প্রভৃতি আকারকে বীজগণিতের সূত্রের দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করে।

॥ ৬ ॥ পরিসংখ্যান :

ইহাও গণিতের একটি শাখা। **নম্বর দ্বারা প্রকাশিত কাঁচা তথ্য সংগ্রহ ও তাদের শ্রেণী-বিন্যাস করে সাধারণ সূত্র নির্ণয় করা হয় এই বিজ্ঞানের সাহায্যে।** পরিসংখ্যানে সম্ভাবনাতত্ত্বের প্রচুর অবদান আছে। যখন কোন ঘটনা ঘটার এবং না-ঘটার সম্ভাবনা সমান অথবা সমান নয়—উভয় ক্ষেত্রেই কি ঘটতে পারে তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে এই বিজ্ঞান সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—অক্ষক্রীড়ার ক্ষেত্রে ইহাকে প্রয়োগ করা যায় অথবা কোন বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতগুলি বালক এবং কতগুলি বালিকা জন্মগ্রহণ করবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করা এই বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব।

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে গণিতের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, তার ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল এবং বর্তমানে বিভিন্ন শাখাগুলির পরস্পরের সহিত মিলিত হবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এখন পাটীগণিতে সরল সমীকরণের ব্যবহার বা পরিমিতির প্রবর্তন হয়েছে। পরিমিতি-সংক্রান্ত আহৃত তথ্যের প্রয়োগ করা হচ্ছে বীজগণিতে। জ্যামিতিতেও বীজগণিত আত্মপ্রকাশ করছে। ত্রিকোণমিতি ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে বীজগণিত ও জ্যামিতির বহুল প্রয়োগ বর্তমানে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, প্রাথমিক গণিতে বিভিন্ন শাখার মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশ আরো কমে যাবে এবং বীজগণিত ও জ্যামিতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হবে।

যুক্তিগ্রাহ্য সরল গতিপথ (*logical approach*) গণিতের বৈশিষ্ট্য। গণিতে প্রথমে আলোচ্য বিষয়গুলির সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং ঐ সংজ্ঞাগুলি থেকে যে সমস্ত প্রকল্প করা সম্ভব সেগুলি পরিষ্কারভাবে বলা হয়। তারপর ঐ সংজ্ঞা ও প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে যুক্তিগ্রাহ্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে আমরা প্রয়োজনীয় নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই। অন্তর্বর্তী ধাপগুলি যেন একটি কঠিন শৃঙ্খলের দ্বারা পরস্পরে আবদ্ধ হয়। এইজন্য Peirce গণিতকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের বিজ্ঞান বলেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে গণিতের স্থান

[Use of Mathematics in the various fields of knowledge]

বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও অন্যান্য ভৌতবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উপর আধুনিক চিন্তাধারা ও জীবন নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের এই জয়গানে আমরা সকলেই মুখর ; কিন্তু একথা আমরা ভেবে দেখি না যে বিজ্ঞানের এই অবদানের মূলে আছে গণিত। গণিতের সাহায্য ব্যতীত কি বৈজ্ঞানিক, কি প্রযুক্তিবিদ্ সকলেরই অসহায় অবস্থা। **গণিতই সমস্ত বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড সরিয়ে নিলে বর্তমান সভ্যতা একদিনও টিকতে পারে না।** এইজন্য Bacon বলেছেন, 'গণিত সমস্ত বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার ও চাবিকাঠি'। বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে কিছুটা গণিতের সাহায্যের দরকার না হয়। গণিত সমস্ত বিজ্ঞানকেই পূর্ণতা দান করে। ভৌত-বিজ্ঞানের নির্ভুলতা নির্ভর করে সঠিক পরিমাপের উপর। ইহার জন্য গণিত অপরিহার্য। বিজ্ঞান-লব্ধ ফলকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে গেলেও গাণিতিক প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানে গণিতের প্রভাব সম্পর্কে এখন আমরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করব।

গণিত ও পদার্থবিদ্যা :

পদার্থবিদ্যার কোন সূত্রকেই গাণিতিক নিয়মে আবদ্ধ করতে না পারলে মানুষের কোন কাজে আসে না। বাষ্পের সাহায্যে শক্তি উৎপন্ন করা যায়—ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু বাষ্প কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করে এবং ঐ আধারের চাপ সহ্য করার কতটা ক্ষমতা আছে তা' না জানতে পারলে বাষ্পকে কোন কাজেই লাগানো যায় না। এই পরিমাণ ও পরিমাপগত ব্যাপারটি গণিতের এলাকার মধ্যে। অনুরূপভাবে এক মাধ্যম থেকে স্বতন্ত্র মাধ্যমে গমনকালে আলোকরশ্মির কি পরিমাণ বিচ্যুতি ঘটে তা জানতে হলে গণিতের শরণাপন্ন হতে হয়। বিজ্ঞানের পরিমাণগত দিকটি গণিত নিয়ন্ত্রণ করে। পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত যে কোন বিষয়েরই একটা পরিমাণগত দিক আছে। অতএব পদার্থবিদ্যা ও গণিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। **অধ্যাপক বলের মতে, পদার্থবিদ্যার অগ্রগতিও গণিতের উপর নির্ভরশীল। "প্রতি বৎসরই দেখা যায় যে, ভালো গণিতজ্ঞ না হলে পদার্থবিদের গবেষণায় অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে যায়।"**

গণিত ও রসায়নবিদ্যা ঃ

সমস্ত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থই গাণিতিক সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ। যেমন. ২টি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সহিত ১টি অক্সিজেন-পরমাণুর সংশ্লেষণে জলের একটি অণু গঠিত।

গণিত ও জীববিদ্যা ঃ

জীববিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গণিতের ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। **বিশেষত, পরিসংখ্যানের প্রয়োগ জীববিজ্ঞানে অপরিহার্য।** শারীরবিদ্যা, সুপ্রজননবিদ্যা, বংশগতি, পুষ্টি, জন্ম, ক্রমবৃদ্ধি, মৃত্যু, জীবদেহের রাসায়নিক রূপান্তর প্রভৃতি জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়সমূহের বর্তমান অগ্রগতি গণিতের সাহায্য ব্যতীত হ'ত না। *Malthus, Mendel, Darwin* প্রমুখ জীববিজ্ঞানী গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন। *Bio-Physics* এবং *Bio-Chemistry* নামক জীববিজ্ঞানের দুটি শাখা গণিতের সাহায্যে বর্তমানে এতদূর উন্নত হয়েছে যে, তাদের দুটি স্বতন্ত্র বিষয় বলে আজ চিহ্নিত করা হয়েছে। জীবনের সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে জীববিজ্ঞানীরা বর্তমানে যে গবেষণা করছেন সেখানেও গণিত তাঁদের প্রতিপদে সাহায্য করছে।

গণিত ও পূর্তবিদ্যা ঃ

প্রকৃতিই সমস্ত শক্তির উৎস। এই শক্তিকে মানুষের সেবা ও সভ্যতা-বিকাশের কাজে নিয়োগ করেন পূর্তবিদ। জরীপ, পরিকল্পনা, নক্শা তৈয়ারী এবং নির্মাণ প্রভৃতি কাজ পূর্তবিদ্যার সাহায্যে হয়ে থাকে। এ সমস্ত কাজেই গণিতের সাহায্য অপরিহার্য। **গণিতকে অবলম্বন করে পূর্তবিদ্যা আজ বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হয়েছে।** রেলপথ, সেতু-নির্মাণ প্রভৃতি কাজ গণিত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সমস্ত কাজের প্রয়োজনীয় পরিমাপের কাজটুকুই কেবলমাত্র গণিতের বিষয়ীভূত নয়—পরন্তু, কি এবং কতটা পরিমাপ করতে হবে তাও স্থিরীকৃত হয় গণিতের সাহায্যে। মনে করা যাক, একটা নদীর উপর সেতু তৈরী করতে হবে। পূর্তবিদের প্রথম কাজ হবে নদী কতটা প্রশস্ত তা দেখা, কতগুলি স্তম্ভ নির্মাণ করতে হবে তা স্থির করা। যে সমস্ত মাল-মশলা ব্যবহৃত হবে তাদের কার্যকারিতা দেখা, তারা কতটা ভারবহ এবং মজবুত হবে তাও হিসাব করা। এই সমস্ত কাজে পদে পদে গণিতের সাহায্য দরকার। অন্যান্য প্রাকৃতিক বিদ্যার মত পূর্তবিদ্যারও ভিত্তিমূল গণিত।

আগেই উল্লেখ করেছি এবং আলোচনা দ্বারা দেখিয়েছি যে, সমস্ত প্রাকৃতিক ও ভৌত-বিজ্ঞানের মূলে এবং অগ্রগতিতে গণিত আছে। কলাশাস্ত্রগুলির সহিতও গণিতের সম্পর্ক নিবিড়; বিশেষ ক'রে যে সমস্ত কলাশাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন দর্শন, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলাগুলির উপরও গণিতের যথেষ্ট প্রভাব আছে। গণিতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু কিছু আলোচনা করব।

গণিত ও দর্শন :

দর্শন চরম বাস্তব বা সত্য নির্ণয় করে। গণিত নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। সুতরাং দর্শনকে চরম বাস্তবের লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করতে গণিতের মত আর কিছুই নেই। গণিত ও দর্শনের মধ্যে সেইজন্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সমস্ত বড় বড় দার্শনিকই গণিতজ্ঞ। যেমন, *Descartes, Bert and Russel, Whitehead, Pascal* প্রভৃতি। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দার্শনিক চিন্তাধারা ও গণিতের অগ্রগতি সমান্তরালভাবে চলেছে এবং একটির অগ্রগতি অন্যটিকে প্রভাবিত করেছে।

গণিত ও অর্থনীতি :

বর্তমানে অর্থনীতিতে গণিতের পরিভাষা ও পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত। বস্তুত গণিতজ্ঞ না হলে অর্থনীতির বিভিন্ন সূত্র আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের দ্রুত ও বহুল ব্যবহার হচ্ছে। অর্থনীতি-সংক্রান্ত পূর্বাভাষ দেওয়ার কাজে পরিসংখ্যান পদ্ধতি অপরিহার্য। অর্থনীতির প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান সূত্রগুলি আজকাল গণিতের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে ডঃ মার্শাল অগ্রগণ্য। এ ছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের আবর্তন (*Trade cycles*), আমদানি-রপ্তানির প্রবণতা, জাতীয় আয়-ব্যয়, জনসংখ্যার প্রবণতা প্রভৃতি নিরূপণে পরিসংখ্যান-পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। জীবন-বীমা, ব্যাংক ও বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনীতিকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। এইসব প্রতিষ্ঠানের কার্য ও কার্যপদ্ধতি, পরিসংখ্যান-পদ্ধতি এবং লেখচিত্র গণিতের উপর নির্ভরশীল।

গণিত ও চিকিৎসাবিজ্ঞান :

চিকিৎসাবিজ্ঞানেও গণিতের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এ বিজ্ঞানে পরিসংখ্যানের ব্যবহারই বেশী হয়।

গণিত ও মনোবিজ্ঞান :

পূর্বে মানসিক সমস্যার সমাধান করা হ'ত অন্তর্দর্শনের (*Introspection*) সাহায্যে। অন্তর্দর্শন ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যখন থেকে মনোবিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহার সুরু হয়, তখন থেকেই ইহা সমাজ-বিজ্ঞানের রূপ লাভ করে এবং ইহার দ্রুত অগ্রগতি হয়। মনোবিজ্ঞান ও গণিতের মধ্যে সম্বন্ধ এখন খুব ঘনিষ্ঠ। মনোবিজ্ঞানে

গণিতের অনুপ্রবেশের ফলেই ইহা আজ এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আধুনিক শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। মনোবিজ্ঞানে গণিতের অবদানের জন্যই ইহা সম্ভব হয়েছে। ইহা এখন একটি সার্থক বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। আজকাল মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের দ্বারা করা হয়। এই পদ্ধতিতে বুদ্ধ্যঙ্ক, বুদ্ধির বণ্টন, সহ-সম্বন্ধ, মনোযোগের বিস্তার, অভ্যাসগঠন প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়। মনোবিজ্ঞানে অবলম্বিত সহ-সম্বন্ধ-পদ্ধতি আজ অর্থনীতিতেও প্রযুক্ত হচ্ছে।

গণিত ও তর্কশাস্ত্র ঃ

তর্কশাস্ত্র নির্ভুল চিন্তা করা ও কার্যকরী সিদ্ধান্তে আসার বিজ্ঞান-সম্মত পর্যালোচনা করে। *Dr. Alembert*-এর মতে জ্যামিতিকে ব্যবহারিক তর্কশাস্ত্র বলা যায়। কারণ, ইহার বিষয়গুলি সরল, সংক্ষিপ্ত, কার্যকরী ও যুক্তিসম্মত। অবরোহী (*Deductive*) পদ্ধতির তিনটি অংশ—আশ্রয়বাক্য (*Premises*), যুক্তিপ্রণালী ও সিদ্ধান্ত। সঠিক আশ্রয়বাক্য থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গণিতের প্রণালী সর্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং সঠিক চিন্তা করতে শেখানোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রে দখললাভ করতে গণিতের শিক্ষা খুব মূল্যবান।

গণিত ও চারুকলা ঃ

সঙ্গীত ও চারুকলা শিক্ষায় গণিতের দরকার আছে। গণিতের নিজস্ব একটি সৌন্দর্য আছে। গণিত-চর্চার ফলে সৌন্দর্যের রসাস্বাদনের ক্ষমতা জন্মায়। দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ, স্থপতি প্রভৃতি এইরূপ রসাস্বাদনের অধিকারী। প্রাচীন গ্রীকেরাই জ্যামিতির জনক ছিলেন। জ্যামিতির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চারুকলা ও ভাস্কর্যে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেন। জ্যামিতিক আকার ও প্রাতিসাম্যের জ্ঞান তাঁদের চারুকলায় প্রতিফলিত হয়ে উহাকে অনুপম সৌন্দর্যে বিভূষিত করে। প্রাচীন গ্রীসে সঙ্গীত ও চারুকলা গণিতের অঙ্গীভূত ছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গণিত শিক্ষণের মূল্য
[Values of teaching Mathematics]

গণিত শেখানোর প্রয়োজনীয়তা কি ? ইহার শিক্ষণের পিছনে কি কি উদ্দেশ্য আছে ? এই জাতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া কঠিন। গণিত একটি বিরাট বিষয়। ইহার বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ দিন দিন এরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, এই বিজ্ঞানটির সঠিক সংজ্ঞা দেওয়াই দুরূহ—অসম্ভব বললেই চলে। সুতরাং গণিত শিক্ষণের পিছনে কি কি বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে তা'ও বলা সম্ভব নয়। শিক্ষার বিশেষ বিশেষ ধাপে (phase) গণিত-শিক্ষার কার্যকারিতা কি—কেবলমাত্র সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা সম্ভব।

বিভিন্ন ধাপে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি কি তা' আমরা সঠিকভাবে নিরূপণ করি না। শিক্ষাবিদ্‌দের মতে, ইহা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান গলদ। একজন শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকতে পারে। কিন্তু যদি তিনি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি না জেনে শিক্ষা দেন, তা' হলে তাঁর শিক্ষাদান ভুলপথে চালিত হ'তে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হবে না।

প্রত্যেক শিক্ষকেরই জানা উচিত কেন তিনি নির্দিষ্ট বিষয়টি শিক্ষা দিচ্ছেন। পাঠক্রমে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের স্থান কোথায়—গুরুত্বই বা কতখানি ?—বিষয়টি শেখানোর উদ্দেশ্য কি ?—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকলে এবং ঐ জ্ঞানকে সর্বদা স্মরণে রেখে যদি কোন শিক্ষক শিক্ষা দেন, তা'হলে তাঁর শিক্ষা দেওয়া সার্থক হ'তে বাধ্য। **'কি' এবং 'কেমন করে' শিক্ষা দিতে হবে—এটুকু জানাই শিক্ষকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাঁকে আরো জানতে হবে 'কেন' তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। বস্তুত এই 'কেন' প্রশ্নটির উত্তর 'কি' এবং 'কেমন করে'—এই দুটি প্রশ্নের উত্তরকে পরিচালিত করছে।** গণিতের শিক্ষকের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত উক্তিগুলি প্রযোজ্য। শিক্ষার্থীরও জানা দরকার—পাঠক্রমে গণিত কেন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কোন বিষয় শিক্ষাদানের মূল্য নির্ভর করে সেই বিষয়টি শিক্ষাদানে কি কি লক্ষ্য অনুসরণ করা হয় তার উপর। একটি বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যটি মনে সদাজাগ্রত রাখতে হয় তাই বিষয়টি শেখানোর মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য অনুসরণের ফলাফলই বিষয়টি শেখানোর মূল্য।

বিদ্যালয়ে গণিত শেখানোর মূল উদ্দেশ্য :

বিদ্যালয়ে গণিত শেখানোর মূল উদ্দেশ্য ত্রিবিধ। যথা—

১। ব্যবহারিক উদ্দেশ্য। ২। কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্য। ৩। শৃঙ্খলা-মূলক উদ্দেশ্য।

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য :

মাতৃভাষা ছাড়া এমন কোন বিষয় নেই যা গণিতের মত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দৈনন্দিন বৈষয়িক কাজে গণিত একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রাত্যহিক জীবনে গণিতের ব্যবহার অসীম। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে রাতে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা গণিতের ব্যবহার করছি। জীবন-ধারণ ও জীবিকা দুই-ই ইহার উপর নির্ভরশীল। আমাদের প্রত্যেককেই হিসাব করতে হয়, সাংসারিক বাজেট তৈয়ারী করতে হয় এবং টাকা-পয়সা গণনা করতে হয়। অশিক্ষিত কুলী-মজুরকেও তার দিন-মজুরি গুণে নিতে হয় এবং অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হয়। লিখতে বা পড়তে না জানলেও তার জীবন অতিবাহিত হবে। কিন্তু গণনা করা না শিখলে তার একদিনও চলতে পারে না। বহু বৃত্তি আছে যেখানে গণিতের ব্যবহার অপরিহার্য। যেমন দরজির কাজ, ছুতোরের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ প্রভৃতি। গণিত-নির্ভর বৃত্তি বর্তমান জটিল দ্রুত-উন্নতিশীল সমাজে ক্রমবর্ধমান। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, উৎপাদন প্রভৃতি একান্তভাবে গণিতের উপর নির্ভরশীল। ফেরীওয়ালা থেকে টাটা, বিড়লা প্রভৃতির মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সকলকেই গণিত ব্যবহার করতে হয়। দিনমজুর থেকে অর্থমন্ত্রী, রাজমিস্ত্রী থেকে ইঞ্জিনীয়ার সকলেরই কাজে গণিতের অনুপ্রবেশ আছে। আজকের জগৎ পরিমাপের জগৎ। পরিমাপ, ওজন, দাম ঠিক করা—এই সমস্ত গণিত-নির্ভর ব্যাপার নিয়ে ব্যবসায়-জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। এককথায় বলতে গেলে, যে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল থেকে আমরা জীবন-রস সংগ্রহ করি, তা গণিত-রসে নিষিক্ত।

একথা অবশ্য সত্য যে, গণিতের সকল শাখাই অর্থাৎ বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি প্রত্যেক নাগরিকের জীবনেই প্রয়োগ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। এইজন্য অনেকের মতে পাটীগণিত ছাড়া গণিতের অন্যান্য শাখা অবশ্য-পাঠ্যের মধ্যে থাকা উচিত নয়। কিন্তু শিশু ভবিষ্যতে কি বৃত্তি গ্রহণ করবে তা আগে থেকে অনুধাবন করে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল উন্নত সমাজে আজকের অর্জিত জ্ঞান ভবিষ্যৎ নাগরিকের কাজে নাও লাগতে পারে। সেইজন্য বহু বৃত্তির উপযোগী মৌলিক জ্ঞান যেটুকু প্রয়োজন তা শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেই হবে। তাছাড়া জ্ঞানার্জন অপেক্ষা অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা অর্জন করতে সাহায্য করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। গণিত-শিক্ষা এই ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করে। এই কারণে গণিতের বিভিন্ন শাখা শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ অপরিহার্য মনে করেন।

কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্য :

আধুনিক সভ্যতার সবকিছুই পরোক্ষভাবে গণিতের কাছে ঋণী। আধুনিক চিন্তাধারা ও জীবন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলস্বরূপ। **আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূল গণিত**। এমন কি সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতেও আজকাল গণিত বহুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অধ্যাপক *Ball* বলেন যে, পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি মূলে আছে গণিতের প্রয়োগ। প্রতিবৎসর কোন-না-কোন গবেষক গণিতে পারদর্শিতার অভাবে তাঁর গবেষণার কাজে কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন না।

পূর্ত, কৃষি, রেলপথ ও গৃহনির্মাণ, নৌচালনা, জরীপের কাজ প্রভৃতি বৃত্তিতে গণিত অপরিহার্য। আবহাওয়াবিদ্ বৃষ্টিপাত বা আবহাওয়া-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী গণিতের সাহায্যে করেন। প্রাকৃতিক ব্যাপার অনুধাবন করতে গণিতের জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। অধ্যাপক *J. W. A, Young*-এর ভাষায় বলতে হয়, "*Wherever we turn in these days of iron, steam and electricity, we find that mathematics has been the pioneer. Were its backbone removed, our material civilization would inevitably collapse*"। **গণিত সমস্ত বিজ্ঞানকে সঠিক এবং নির্ভুল পথে চালিত না করলে আধুনিক চিন্তাধারা ও বিশ্বাস ভিন্নরূপ ধারণ করত।** বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্র ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মূলে আছে নির্ভুল গাণিতিক ধারণা। জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সবচেয়ে বেশী নির্ভুল বিজ্ঞান এবং তাদের এই নির্ভুলতার মূলে আছে গণিত।

শৃঙ্খলামূলক উদ্দেশ্য :

অতীতকালে গণিত শেখানোর প্রাথমিক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চিত্তবৃত্তিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া ; সঠিকভাবে চিন্তা করার অভ্যাস গঠন করা। গণিতের ব্যবহারিক মূল্য বা কৃষ্টিমূলক মূল্য স্বীকৃত হ'ত না। শিশু যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা ও প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেগুলিকে উন্নত, সঠিক এবং সমাজ-অনুমোদিত পথে পরিচালিত করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। গণিত-শিক্ষণের দ্বারা এই উদ্দেশ্য ভালভাবে সিদ্ধ হয়। গণিত-শিক্ষার ফলে মন নিয়মানুবর্তী হয় এবং স্মৃতির উপর কোন চাপ সৃষ্টি না করে যুক্তিশক্তি বৃদ্ধি পায়। সমস্ত ব্যাপারই যুক্তি দিয়ে বুঝে নেবার একটা প্রবণতা দেখা যায় গণিত-শিক্ষার ফলে। গণিতের ছাত্র মনে করেন শিক্ষার ক্ষেত্রে স্মৃতি অপেক্ষা যুক্তি করার ক্ষমতা বিশেষ কার্যকর। যদিও জ্ঞান-আহরণে স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট মূল্য আছে। গণিতের ছাত্রের কিন্তু লক্ষ্য যুক্তিক্ষমতা বৃদ্ধি করা। জ্ঞানলাভ ইহার মধ্য দিয়ে আপনা-আপনি ঘটে।

গণিত-শিক্ষার ফলে এমন কতকগুলি বিশেষ ধরনের চিন্তাধারায় আমরা অভ্যস্ত হই, যেগুলি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। যেমন, বিশেষ পরিস্থিতিতে

সম্যক উপলব্ধি করার ক্ষমতা ; নানাবিধ ঘটনার মধ্য থেকে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে এরূপ ক্ষমতা লাভ করা অবশ্যই দরকার। যে কোন বৃত্তিতে সফল হতে হলে এ ক্ষমতা থাকা চাই। যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে প্রকৃত তথ্যটি সাবধানতা ও যত্নের সঙ্গে বেছে নিতে হয়। এরূপ ক্ষমতা লাভের জন্য প্রচুর অধ্যবসায় ও অভ্যাস দরকার। বিদ্যালয়-জীবনই এরূপ অভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। এরূপ অভ্যাস-গঠনের সূত্রপাত করতে গণিতই সবচেয়ে উপযোগী। কারণ গণিতের তথ্যগুলি সংখ্যায় কম এবং জটিলতাপূর্ণ নয়।

গণিত-শিক্ষণের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের বিষয় আলোচিত হল। এগুলি ছাড়া আরো কতকগুলি উদ্দেশ্যের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলিরও যথেষ্ট মূল্য আছে।

তথ্যমূলক উদ্দেশ্য ঃ

ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের যেমন একটা তথ্যমূলক দিক আছে, গণিত-শিক্ষারও সেরূপ মূল্য আছে। গণিত মানব-মনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। গণিত সকল যুগে, সকল দেশে একই ফল উৎপাদন করে। স্থান কাল ভেদে ব্যাপকতার দিক দিয়ে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে কোন প্রভেদ নেই। সকল দেশে, সকল যুগে $5 \times 6 = 30$ হয়েছে। কোথাও $5 \times 6 = 31$ হয়নি। মূল সূত্রটি এক হলে সর্বত্রই সর্বকালে উদ্ভূত ফলটি একই হয়েছে। প্রাচীনকালে গণিতের সমস্যার সমাধান করে হিন্দুরা যে সমস্ত সূত্র আবিষ্কার করেন, কয়েক শত বৎসর পরে ইউরোপীয়গণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সেগুলি সমাধান করেন এবং একই ফললাভ করেন। গণিত এমন একটি চিন্তাধারা প্রতিফলিত করে যা পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং যার ফল শাশ্বত। সুতরাং কোন আধুনিক মানুষের পক্ষে গণিত-শিক্ষায় অবহেলা দেখান উচিত নয়।

প্রতীকমূলক ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্য ঃ

গণিতের ভাষা প্রতীকমূলক। এই ভাষায় শিশু ধীরে ধীরে দক্ষতা লাভ করে। গণিতের এই প্রতীকমূলক ভাষা অন্যান্য বিজ্ঞানেও গৃহীত হয়েছে। সুতরাং এই ভাষা-শেখা বিজ্ঞান শেখার প্রস্তুতি স্বরূপ। আধুনিক জগতের অনেক কাজই প্রতীকের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। প্রতীকমূলক ভাষা-শিক্ষণে গণিত অগ্রদূত।

বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত অগ্রগতিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্য ঃ

গণিতে সমস্ত বিষয়ই একটি নিখুঁত, সুষ্ঠু, বিজ্ঞানসম্মত পরিণতি লাভ করে। অন্য কোন বিষয়েই এরূপ সম্ভব হয় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য সমস্ত শাখার লক্ষ্য গণিতের মত সার্থক পরিণতি লাভ করা। এই দিক দিয়ে গণিত সমস্ত জ্ঞানের আদর্শ স্বরূপ।

শিশুকালে আবিষ্কারের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য ঃ

শিশুরা গণিতের মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করার সহজ এবং প্রাথমিক সুযোগ লাভ করে। গণিত-শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বিমূর্ত চিন্তা করার শক্তি ধীরে ধীরে বাড়ে। এই শক্তির সাহায্যে সে প্রকৃত আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করে।

সামান্যীকরণ ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্য ঃ

গণিত-শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামান্যীকরণের অভ্যাস গঠিত হয়। বিভিন্ন তথ্যের ভিতর থেকে সাধারণ সূত্র বাহির করা, পরিকল্পনামত বিন্যাস ও শ্রেণী-বিন্যাস করার শিক্ষা গণিত প্রদান করে। গণিতের অগ্রগতি সামান্যীকরণের মধ্য দিয়ে। প্রতীক ব্যবহার করা মানেই সামান্যীকরণ করা। পাটীগণিতের পদ্ধতির সামান্যীকরণে বীজগণিতের উদ্ভব। জ্যামিতিতেও সামান্যীকরণের প্রচুর দৃষ্টান্ত মেলে।

সত্যনিষ্ঠা ও আত্ম-সমীক্ষায় ঃ

গণিত-শিক্ষায় সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা জন্মায় এবং আত্ম-সমীক্ষার অভ্যাস গঠিত হয়।

সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টিতে ঃ

গণিতের একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। ইহার ফলগুলি বাহুল্যবর্জিত। গণিতের প্রাতিসাম্য, সমানুপাত এবং সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সঠিক এবং নির্ভুলভাবে অগ্রগতি—এগুলি স্বাভাবিকতার নিদর্শন। শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের মধ্যেই এরূপ স্বাভাবিকতা দেখা যায়।

কল্পনাশক্তির বিকাশে ঃ

গণিতে সকল সময় কল্পনাশক্তির ব্যবহার করতে হয়। যে কোন গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কল্পনাশক্তির সাহায্য অপরিহার্য। জীবনের বিভিন্ন সমস্যায়ও সকল দিক বিবেচনা করে সঠিক পথটি অনুসরণ করার ক্ষমতা চাই। এই শক্তি অর্জনে গণিত-শিক্ষা যথেষ্ট সাহায্য করে।

সর্বশেষে বলা যায় যে, **মনোযোগ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নির্ভুলতার শিক্ষায়** গণিত-শিক্ষা প্রভূত সাহায্য করে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গণিত শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষককে গণিত-শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যগুলি মনে সদা জাগরিত রেখে শিক্ষণ কাজে অগ্রসর হতে হবে। গণিতের সমস্যাগুলি যেন শিশুর জীবনকেন্দ্রিক হয়—তাহলে সে গণিতের ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে

সচেতন হবে। প্রসঙ্গক্রমে গণিতের ইতিহাস আলোচনার মধ্যে গণিতের অগ্রগতির সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিকাশ কিভাবে হয় বোঝাতে হবে এবং অনুবন্ধ প্রণালীতে গণিতকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এতে শিশুরা গণিতের কৃষ্টিমূলক মূল্য সম্বন্ধে ধারণা পাবে এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধের ফলে বুঝতে অন্যান্য বিষয়ও ভালো ভাবে শিখতে হলে গণিত ভালোভাবে শেখা দরকার। গণিতের শৃঙ্খলামূলক মূল্যই প্রধান। শিক্ষক এমনভাবে গণিত শেখাবেন যাতে ছাত্রেরা চিন্তা করতে, বিচার করতে, যুক্তি করতে বিশ্লেষণ করতে শেখে। তারা যেন গণিতের পাঠ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করে—মুখস্থ না করে। ঠিক মত বুঝলে আপনিই মনে থাকে আর ভুলে গেলেও তাকে পুনরাবিষ্কার করতে পারবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে গণিত

[Mathematics in School Curriculum]

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে গণিত কেন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কারণগুলি সম্বন্ধে আগের অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। পাঠক্রমে গণিতের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ তিনটি—১। **ব্যবহারিক** ২। **কৃষ্টিমূলক** ৩। **শৃঙ্খলামূলক**।

দৈনন্দিন জীবনে গণিতের ব্যবহারিক মূল্য খুব বেশী। কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্যের মূল-কথা—সভ্যতার বিকাশে গণিতের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। গণিতের কৃষ্টিমূলক মূল্য ব্যবহারিক মূল্যেরই একটি উন্নত রূপ। প্রথমটি জীবন ও জীবিকার পরিবাহক। দ্বিতীয়টি উন্নততর জীবন ও জীবিকার ভিত্তিমূল। দুটি ক্ষেত্রেই গণিতকে বাস্তব জগতের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। দুটিকে বলা যেতে পারে গণিতের জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের দুটি শাখা। এই কারণেই বলা হয় গণিত-শিক্ষণের প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য—১। **শৃঙ্খলামূলক,** ২। **তথ্যের জ্ঞান আহরণমূলক (বাস্তব প্রয়োগের উদ্দেশ্যে)**। "*Mathematics is primarily taught on account of the mental training it affords and the knowledge of facts it inparts*".

মূলতঃ গণিতের শৃঙ্খলামূলক মূল্যের জন্যই অতীতে গণিত শিক্ষা দেওয়া হ'ত। গণিতের বাস্তব উপযোগিতা বিশেষ স্বীকৃত ছিল না। সভ্যতার উন্নতি এবং বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গণিতের তথ্যমূলক ব্যবহারিক মূল্যও সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। দৈনন্দিন জীবনে, জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, শিল্পে এবং বহুসংখ্যক বৃত্তিতে আজ গণিত অপরিহার্য। জীবনের সকল স্তরে প্রত্যেক মানুষকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী গণিত সাহায্য দান করছে। এইজন্য গণিতের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্রটি পাঠক্রমে পরিস্ফুট হওয়া দরকার।

অনেকে মনে করেন যে, সাধারণ লোকের জীবনে পাটীগণিতের প্রাথমিক জ্ঞানই যথেষ্ট। বীজগণিত, জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতির তো স্থানই নেই। যন্ত্রবিদ্ বা নাবিকের কাজেও এগুলির ব্যবহার যান্ত্রিকভাবে। আবিষ্কার বা সৃষ্টিধর্মী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরই এই সকল জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

জ্ঞান অপরিবর্তনীয় নয়। একজন ছাত্র বিদ্যালয়ে যে জ্ঞান আহরণ করেছে, পরবর্তী জীবনে তার কোন গুরুত্ব নাও থাকতে পারে। সুতরাং তথ্যমূলক জ্ঞান আহরণ করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। গণিতের শিক্ষাই এই ক্ষমতা দান করতে পারে। কারণ গণিত-শিক্ষণের প্রকৃত লক্ষ্য ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও যুক্তিশক্তি উন্নত করা।

ভবিষ্যতে কোন্ ছাত্র কোন্ বৃত্তিতে নিযুক্ত হবে—তা' নিরূপণ করে প্রত্যেক ছাত্রকে

তার উপযোগী করে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অপর পক্ষে জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা অর্জিত হলে তাকে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা সম্ভব হয়। গণিতচর্চার ফলে ছাত্রের চিন্তা, যুক্তি ও বিচার করার শক্তি বিকশিত হয় এবং মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং গণিতের শিক্ষক ছাত্রদের এমনভাবে শিক্ষা দেবেন যাতে তারা নিজেরাই কোন বিষয়সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের জ্ঞান আহরণ করতে পারে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে, বুদ্ধিকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন করতে পারে এবং চিন্তা ও ভাব প্রকাশ সঠিকভাবে করতে পারে। খুব কম লোকই স্বাধীনভাবে সঠিক চিন্তা করতে পারে। শুধু তথ্যের জ্ঞান আহরণ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করা, জীবনের সমস্যাগুলি সম্যক উপলব্ধি করা প্রভৃতির ক্ষমতা অর্জন করাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। **এছাড়া জ্ঞানের মূল্য তখনই থাকে যখন তাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়।** জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা নির্ভর করে সঠিক চিন্তা করার ক্ষমতার উপর। কাজেই তথ্যের জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রসূ চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করাও দরকার।

সুচিন্তিত কাজই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। শুধুমাত্র জ্ঞানের পরিসর বিস্তৃত হলেই মানুষের যোগ্যতা বাড়ে না। তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার এমন ক্ষমতা অর্জন যার সাহায্যে ছাত্রেরা অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশটুকু গ্রহণ করতে পারে, যুক্তিযুক্ত অনুমান করতে পারে, বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে এবং জ্ঞানকে ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারে।

সুতরাং গণিতের শিক্ষকের পক্ষে গণিতের তথ্যগুলি মুখস্থ করার জন্য ছাত্রদের উপর জোর করা উচিত নয়। আবিষ্কারকের মনোভাব নিয়ে সমস্যাগুলি উপযুক্ত যুক্তি সহকারে সমাধান করার ক্ষমতা অর্জনে ছাত্রদের সাহায্য করা উচিত তাঁর। জ্যামিতির কোন উপপাদ্য না বুঝে কণ্ঠস্থ করা আর একটা স্ট্রীট ডাইরেক্টরীর একটি পাতা মুখস্থ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আমাদের দেশের শিক্ষকগণ মুখস্থ করার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ফলে গণিত বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রদের কোন আগ্রহ জন্মায় না, বরং একটা ভীতির সঞ্চার হয়। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি এর জন্য দায়ী। গণিতের সূত্র, নিয়ম ও মূলনীতি-গুলি মুখস্থ করার দরকার নেই। ঐগুলি ঠিক মত বুঝতে পারলে মনে রাখা সহজ হবে। আর ভুলে গেলেও পুনরায় আবিষ্কার করে নিতে পারবে। যুক্তির সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয় তাই সার্থক জ্ঞান। সেই জ্ঞানই শক্তি যা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। দুঃখের বিষয়, আমাদের ছাত্রদের উপর পাঠ্যসূচীর ভার এত বেশী যে তারা স্বাধীনভাবে ভাববার, চিন্তা করবার অবকাশ পায় না। তথ্যমূলক জ্ঞান আহরণের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে গণিত-শেখার শক্তি অর্জনকে অবহেলা করা হয়েছে। এর পরিণতি হয়েছে বেদনাদায়ক। অধ্যাপক ইয়ং-এর মতে গণিত শিক্ষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য গণিতের তথ্যগুলিতে ছাত্রদের পণ্ডিত করা নয়—তাদের প্রণালীবদ্ধভাবে চিন্তা করতে শেখানো। গণিত শিক্ষণের মূলনীতি হওয়া উচিত প্রথমত মানসিক শিক্ষা এবং দ্বিতীয়ত তথ্যমূলক জ্ঞান।

অনেকে মনে করেন যে, প্রয়োজনীয় তথ্যের জ্ঞান ও মানসিক শিক্ষা এই দুটিকেই গণিতের পাঠক্রমে সমান মূল্য দেওয়া উচিত। কোঠারী কমিশন তো গণিতের তথ্যমূলক জ্ঞানের উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। কমিশন বলেন, বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আর বিজ্ঞান গণিত-নির্ভর। কাজেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে গণিতের তথ্যের জ্ঞান ব্যাপক করতেই হবে। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার এখন সর্ব ক্ষেত্রেই হচ্ছে। তার জন্যও গণিতের জ্ঞান প্রয়োজন। আজ বিজ্ঞান যে বিপ্লব সাধন করেছে তাকে দেশের ও জাতির উন্নতিতে কাজে লাগাতে হলে গণিতের জ্ঞান লাভ করতেই হবে এবং তার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপন করতে হবে বিদ্যালয়েই।

আমাদের মনে হয় যে, পাঠক্রমে গণিতের সমস্যাগুলি বাস্তবানুগ ও জীবনধর্মী করে পরিবেশন করতে হবে। সমস্যাগুলি বাস্তব জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই মানসিক শিক্ষার অনুকূল হয়। অবাস্তব ও জীবনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে ছাত্রদের বিষয়টির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। অবশ্য আহৃত তথ্যগুলি সকলের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। কিন্তু গণিত মানুষের সেবায় কিভাবে সাহায্য করেছে তা প্রত্যেকেরই জানা দরকার এবং এটি জানতে হলে গণিতের তথ্যগুলির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকের কাজ হবে,—মানসিক শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় তথ্যের জ্ঞান—এই উভয়বিধ শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষিত করা। কিন্তু মানসিক শিক্ষার জন্য একটি পাঠক্রম এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের জ্ঞানের জন্য আর একটি পাঠক্রম মোটেই কার্যকরী হবে না। অনুবন্ধ-প্রণালীতে একই পাঠক্রমের মাধ্যমে দুটিকে সংযুক্ত করে শিক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। সুপ্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী *Thorndike* বলেন, "*Teach nothing because of its disciplinary value, but everything so as to get what disciplinary value it does have.*"

সৃজনমূলক তৎপরতায় গণিত :

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গণিত-শিক্ষণের প্রধান ও অপ্রধান মূল্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা বেশ প্রকট হয়েছে যে, মানব-জীবন ও সভ্যতার সকল স্তরে গণিতের ব্যবহার আছে। আমাদের ব্যক্তিগত, কৃষ্টিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে গণিত কোন না কোন ভাবে যুক্ত। শুধু যুক্ত বললেই ঠিক হয় না; আমাদের যাবতীয় অগ্রগতির মূলে আছে গণিতের চিন্তাধারা ও তার প্রয়োগ—কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আবার কোথাও অপ্রত্যক্ষভাবে।

ব্যক্তিজীবনের সক্রিয়তার মূলে আছে তার শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের তাগিদ। এই চাহিদাগুলি পূরণ করতে মানুষ যখন সক্রিয় হয়—তখন সে নানা বাধা, নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে সে ঐসব বাধা দূর করে, সমস্যার সমাধান করে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার ক্ষমতাকেই আমরা বলি সৃজনীশক্তি। মানুষের সৃজনী শক্তিই তার যাবতীয় অগ্রগতির মূল। সৃষ্টিশীল সক্রিয়তার

দ্বারাই শিশু ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গীন বিকশিত হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে সে যখন বড় হয় তখন ঐ মানসিকতাই তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে।

গণিতের শিক্ষা আমাদের সৃজনমূলক সক্রিয়তা প্রদান করে। তাই আমরা দেখতে পাই যে আমাদের প্রতিটি সৃজনশীল কর্মতৎপরতার মধ্যে গণিতের অবদান আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'সামাজিক চাহিদা ও গণিতের অগ্রগতি' শীর্ষক আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, প্রতি যুগে প্রতি দেশে সামাজিক অগ্রগতির মূলে আছে গণিতের সৃজনমূলক অবদান। ব্যক্তি-জীবনের অগ্রগতি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। বস্তুত, গণিতই মানুষের জীবন ও সভ্যতার গতিকে অব্যাহত রেখেছে। আমাদের ব্যক্তিগত, কৃষ্টিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরেই গণিতের শিক্ষা আমাদের সহায়তা করে।

প্রথমত গণিত আমাদের বুদ্ধিযুক্ত, সুসমঞ্জস ও কৃষ্টিসম্পন্ন জীবন যাপনে সহায়তা করে। বর্তমান জটিল সমাজ-জীবনে আমরা প্রতি পদেই নানা বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। গণিতের শিক্ষা পরিস্থিতিকে সম্যক্‌ভাবে বুঝতে সাহায্য করে। গণিতের সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে আমাদের যুক্তিশক্তি বিকশিত হয়। এই শক্তি বাস্তব-জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা জীবনে কৃতকার্য হই। গণিতে মুখস্থ বিদ্যার স্থান নেই। ইহার চর্চায় বুদ্ধি শাণিত হয়; মৌলিকতা বিকশিত হয়; কল্পনা-শক্তিও বাড়ে; কারণ গণিতে বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হয়।

ব্যক্তির বৌদ্ধিক ক্ষমতাগুলিও গণিত-চর্চায় বিকশিত হয়। সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বুদ্ধির কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে সক্ষম হয়। সে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে শেখে ও চলিত প্রথা ও বাস্তব সত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে শেখে এবং জানা ও অজানার মধ্যে সীমারেখা টানতে পারে; বিমূর্ত চিন্তা করতে শেখে এবং প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে; খোলা মনে যাচাই করতে শেখে; যুক্তির দ্বারা চালিত হয়; সকল বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হয় এবং বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তার প্রকাশ-ভঙ্গী সংক্ষিপ্ত ও বক্তব্য পরিষ্কার হয়; অভ্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও মন শৃঙ্খলাযুক্ত। এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী তার বাস্তব জীবনে প্রতিভাত হয়। তার ফলে সে জীবনের সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে পারে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেগুলির সমাধানে তৎপর হয়। গণিতে মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা বাড়ে ও নির্ভুলতার শিক্ষা হয়। এই সমস্ত মানসিক শিক্ষার ফলে ব্যক্তির আত্ম-নির্ভরতা ও চরিত্র গড়ে ওঠে। তার আত্ম-সম্ভ্রমবোধ বাড়ে; ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ-গুলি বিকশিত হয় যার ফলে তার ব্যক্তিত্ব ভালোভাবে গড়ে ওঠে। আবার ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফলে সে সমাজে নিজের সঠিক স্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

সমাজে পুরুষানুক্রমে নানা নিয়ম ও প্রথা চলে আসছে। এইগুলিকেই আমরা বলি ঐতিহ্য। কিন্তু বহু প্রথাকেই আমরা অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার বলে মানতে চাই না। এইরূপে যে সব প্রথা বেশীর ভাগ লোকে মানে না সেগুলি ক্রমশ সেকেলে বলে পরিত্যক্ত হয়। এই ক্রিয়া পদ্ধতির মূল গণিতে সুস্পষ্ট। কারণ এখানেও আমরা সুরু করি কতকগুলি প্রকল্প নিয়ে। সেগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষ করি; তাদের মধ্যে

॥ ১ ॥ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ঃ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত শিশুর মানসিক ক্ষমতাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করা এবং দ্বিতীয়ত সামাজিক পরিবেশে তার চরিত্র গঠন করা।

গণিত এমন একটি বিষয়, যার চর্চা করতে গেলেই কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিয়োগ করতে হয়। এগুলি হচ্ছে মনঃসংযোগ, পর্যবেক্ষণ, নিভুর্লতা ও ধৈর্য। সুতরাং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে গণিত-শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। গণিত-শিক্ষায় শ্রমের অনুশীলন হয় এবং ইহা মানসিক শৃঙ্খলা ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করে। এছাড়া গণিত-শিক্ষার মধ্য দিয়ে কতকগুলি বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অনুশীলন হয়— যেমন, বিমূর্ত চিন্তা করা, চিন্তা ও ভাবপ্রকাশে যথাযথ শব্দের ব্যবহার করা, বিশ্লেষণী ও আবিষ্কারের মনোভাব গঠন করা, যুক্তিযুক্ত চিন্তা করা, বিচার করা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা, এককথায় বলতে গেলে – **যে সকল নৈতিক ও মানসিক শক্তি ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক, গণিত-শিক্ষার মাধ্যমে সেগুলির অনুশীলন ও বিকাশসাধন হয়।**

॥ ২ ॥ সাধারণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ঃ

স্পষ্টতঃ গণিত সাধারণ শিক্ষার একটি অঙ্গ। সুতরাং সমগ্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার যা যা উদ্দেশ্য গণিত-শিক্ষার উদ্দেশ্যও অংশতঃ সেগুলি। মাধ্যমিক পাঠক্রমে গণিত একটি প্রধান বিষয়। কারণ নানাবিধ কৃষ্টির অগ্রগতির ইহা একটি উৎস। ইহা অন্যান্য বিষয় বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের সামাজিক তৎপরতায় (উৎপাদন, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি) পরিমাপের দিকটি ইহা নিয়ন্ত্রণ করে। গণিতের সাহায্যেই সঠিক বিজ্ঞানসমূহের মূল্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ভৌত জগৎ যে সমস্ত সূত্রের দ্বারা পরিচালিত সেগুলির আবিষ্কার গণিতের মহৎ অবদান। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং গণিতের শিক্ষার দ্বারা ইহার অভ্যাস গঠিত হয়। গণিতের প্রতীকমূলক ভাষার সাহায্যে আমরা বহু সাধারণ ধারণা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারি।

॥ ৩ ॥ ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ঃ

প্রাত্যহিক জীবন ধারণের সমস্যা সমাধানে প্রত্যেক আধুনিক মানুষের কিছুটা গণিতের জ্ঞান থাকা দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষার ভিতর দিয়েই এই সর্বনিম্ন জ্ঞান আমাদের আহরণ করতে হবে। এছাড়া গণিতের উপর নির্ভরশীল বৃত্তিসমূহের তালিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরবর্তী কর্ম-জীবনে শিশু কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে তার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই যে সমস্ত বৃত্তি গণিত-নির্ভরশীল সে সমস্ত বৃত্তির উপযোগী প্রাথমিক গণিতের জ্ঞান এই মাধ্যমিক স্তরেই ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া

উচিত। গণনায় দক্ষতা, চিত্রলেখ ও পরিসংখ্যানগত তথ্যের ব্যাখ্যা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা বুঝতে পারা প্রভৃতি ব্যাপার আজকাল আর বিশেষজ্ঞের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ; বহু বৃত্তিতেই সাধারণ কর্মীকেই আজকাল এইসব কাজ করতে হয়।

॥ ৪ ॥ *উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতির উদ্দেশ্য :*

উচ্চস্তরে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্ভরশীল ভিত্তি রচনা করা গণিত-শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। উচ্চস্তরে অর্জিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা-শিক্ষা বর্তমান যুগে ক্রমবর্ধমান বৃত্তিসমূহে প্রযুক্ত হচ্ছে।

ভারতে মাধ্যমিক স্তরে গণিতের লক্ষ্য :

ভারতসরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের মতে মাধ্যমিক স্তরে গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ :

১। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মসম্পাদনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পাটীগণিতের নানাবিধ সমস্যা বুঝতে পারা, দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করা এবং নির্ভুলভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উহাদের সমাধান করার ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করা।

২। শিশুর বুদ্ধিকে বিকশিত করা, এবং তাকে বিমূর্ত চিন্তা করা, বিচার করা ও যুক্তি করার শিক্ষা দেওয়া।

৩। উচ্চস্তরে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা করতে যে নিম্নতম গণিতের জ্ঞান থাকা দরকার তার শিক্ষা দেওয়া।

নবম পরিচ্ছেদ

গণিতের যুক্তির বৈশিষ্ট্য

[Characteristics of Mathematical Reasoning]

যে কোন গাণিতিক সমস্যার মধ্যে মূলতঃ দুটি উপাদান নিহিত থাকে। প্রথমটি হ'ল 'কি দেওয়া আছে' এবং দ্বিতীয়টি—'কি বাহির করতে হবে'। এই দুটি বিষয় সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারলেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

যে কোন গাণিতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই দুইটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা ও বুঝার অভ্যাস করিয়ে দেওয়া। এই দুইটি মৌলিক উপাদান যেভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা যাবে তার উপর অঙ্কটির অন্তর্বর্তী ধাপগুলি নির্ভর করবে। যে কোন সমস্যা সমাধান করতে হলে, সুরু করতে হবে, হয় যা দেওয়া আছে সেখানে থেকে নতুবা যা বাহির করতে হবে সেখান থেকে। এই মূল কথাটি শিক্ষার্থীকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। সমস্যা-সমাধানের এই নিয়মটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হবার পরই অনুশীলনের প্রশ্ন আসে। ধাপগুলি না বুঝে যান্ত্রিকভাবে অনুশীলন করার কোন মূল্য নেই। আন্দাজে বা এলোমেলোভাবে অথবা কিছু না বুঝে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্র যাতে অঙ্ক না কষে সে বিষয়ে শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। গণিতে অনুশীলনের প্রয়োজন আছে; কিন্তু অনুশীলন করার আগে সমস্যার মৌলিক উপাদান দুটির মধ্যকার সম্পর্ক সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

মৌলিক উপাদান দুটির মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ঠিকমত জ্ঞান হলে, কি করে ধাপে ধাপে সঠিক অনুসিদ্ধান্ত করে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

যুক্তিপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত ও চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাই পরবর্তী জীবনের প্রতি কাজে প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন তথ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা সবচেয়ে প্রয়োজন। আমাদের জীবনের যা কিছু চিন্তা ও কর্ম এই বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীকে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতে শেখানো। এ কাজ যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই দুরূহ। যে সমস্ত বিষয় এরূপ যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতে শিক্ষা দেয়, তাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। যথা,—

১। **ইহার সিদ্ধান্তগুলি অপরিবর্তনীয়।**

২। **বিষয়টি এমন হবে যে, তাহার সাহায্যে সরল এবং সহজ সিদ্ধান্ত থেকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে জটিল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। এই শিক্ষণ-পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত।**

৩। উপরি-উক্ত উপায়ে যে দক্ষতা লাভ হবে তাকে জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে বলা হয়—

১। নিশ্চয়তা ২। সরলতা ৩। প্রযোজ্যতা।

গণিতের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি যতটা প্রকট অন্য কোন বিষয়ে সেরূপ দেখা যায় না। গণিতের এই বৈশিষ্ট্য তিনটি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা যাক।

নিশ্চয়তা (Certainty) :

গণিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে উত্তরের অমিল দেখা যায় না। অন্য যে কোন বিষয়ে ইহার একান্ত অভাব। গণিতের যে কোন সিদ্ধান্ত অপর সিদ্ধান্তের সম্পূরক—কখনও বিপরীত হয় না।

গণিতের উত্তর নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তি বৈষম্যের ফলে গণিতের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় না। গণিতজ্ঞ নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করতে পারেন কিংবা অপরের দ্বারা ভুলগুলি সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হতে পারেন। **গণিতে বিশেষজ্ঞের স্থান নেই। 'ঐ ব্যক্তি একজন বিশেষজ্ঞ, অতএব তিনি যা বলেছেন তাই ঠিক'—এরূপ ভাবে গণিতজ্ঞ কোন কিছুই মেনে নেন না। যুক্তির দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় হতে চান গণিতজ্ঞ। অন্য যে কোন বিষয়েই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা যায়।** কিন্তু যদি গণিতের সাহায্যে কোন কিছু প্রমাণ করে দেখানো যায়, তা হ'লে এই মত-পার্থক্যও দূর হ'য়ে যায়। গণিতের জগতে সবকিছুই স্থির, নিশ্চয়, স্বচ্ছ—এবং প্রতি প্রশ্নেরই নিশ্চিত উত্তর আছে। গণিতের ছাত্র নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত ঠিক অথবা ভুল। সঠিক সিদ্ধান্তে আসার এই নিশ্চিতবোধের মানসিকতাটি গণিত-শিক্ষক শিক্ষারম্ভ থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত করতে সচেষ্ট থাকবেন।

সরলতা (Simplicity) :

গণিতের যুক্তি খুব সরল। অল্প সংখ্যক সরল সংজ্ঞা ও প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ধীরে ধীরে যথাযথ ধাপে কঠিন হতে কঠিনতর সিদ্ধান্তে গণিত আমাদের নিয়ে যায়। শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও প্রয়োজনের উপযোগী করে প্রতি ধাপে তার বোধগম্য করে গণিত-শিক্ষক অগ্রসর হতে পারেন। অপর কোন বিষয়েই এরূপ সম্ভব হয় না। গণিত-শিক্ষার্থীকে স্মৃতির উপর কোন চাপ সহ্য করতে হয় না; অল্প সংখ্যক তথ্য মনে রাখলেই যথেষ্ট হয়। গণিতের অনুশীলনের ফলে প্রভূত শক্তি অর্জিত হয়।

প্রযোজ্যতা (Applicability) :

গণিতে আমরা যেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, অন্যান্য বিষয়ে এবং বাস্তব জীবনে সেরূপ সুযোগ মেলে না। এইজন্য অনেকে মনে করেন যে, গণিত আমাদের যেভাবে সিদ্ধান্ত নিতে শেখায় তা' আমাদের বাস্তব জীবনে কোন কাজে লাগে না। Peirce-এর মতে, গণিত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। প্রারম্ভিক সূত্র

যদি সত্য হয়, গণিতের সিদ্ধান্ত নিভুল হতে বাধ্য। কারণ প্রারম্ভিক সূত্র থেকে গণিতের সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি সেগুলি সকল ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী নয়। এখানে কল্পনাশক্তি যথেষ্ট কাজ করে। এই কারণে অনেকের ধারণা যে, গণিতের সিদ্ধান্তে আসার যে দক্ষতা জন্মায়, গণিতের সীমারেখার বাহিরে বাস্তব জীবনে তাকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। মনে করা যাক, আমাদের প্রারম্ভিক সূত্র 'সূর্য এ পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে উঠেছে। কোনদিন ইহার ব্যতিক্রম হয় নি।' সাধারণ বুদ্ধিতে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, কাল সকালে সূর্য উঠবে। কিন্তু প্রদত্ত প্রারম্ভিক সূত্র থেকে এরূপ অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত গণিতে করা যায় না। গণিতের দিক থেকে প্রারম্ভিক সূত্র ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক আছে। সিদ্ধান্তটি গণিতশাস্ত্রসম্মত হতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি সিদ্ধ হওয়া চাই—

১। সূর্য আগামীকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকবে।

২। পৃথিবী আগামীকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকবে।

৩। পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে ঘুরতে থাকবে।

জানা তথ্যের সঙ্গে উল্লিখিত শর্ত তিনটিকে স্বীকার করে নিলেই গাণিতিক সিদ্ধান্তটিতে উপনীত হওয়া সম্ভব।

আবার মূল সূত্র ধরা যাক, 'মানুষ মাত্র মরণশীল'। সিদ্ধান্ত—রাম মরণশীল। এখানে জানা তথ্য মানুষ মরণশীল, রাম একজন মানুষ। সিদ্ধান্ত রাম মরণশীল। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ গণিতশাস্ত্রসম্মত।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, মূল সূত্র থেকে সিদ্ধান্তটি যদি অবশ্যম্ভাবী না হয়, তা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণিত কি আমাদের বেশী সাহায্য করে? উত্তরে বলা যেতে পারে 'হ্যাঁ'। কিন্তু কেমন করে? প্রণালীটির মধ্যে দুটি ধাপ আছে। (১) মূলসূত্র থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দুরতিক্রম্য বাস্তব অবস্থা যেখানে রয়েছে, ঐ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তে 'প্রকল্পিত স্বীকার' (*hypothetical conditions*) সেখানে গ্রহণ করতে হবে; এবং (২) গাণিতিক সিদ্ধান্ত।

উল্লিখিত প্রথম উদাহরণে বাস্তব অবস্থা এই যে, সূর্য বা পৃথিবী আগামী কাল বর্তমান নাও থাকতে পারে বা পৃথিবী তার কক্ষের চারদিকে ঘুরতে নাও পারে। এই বাস্তব অবস্থাকে অপনীত করে সেস্থলে আমরা যদি এই কার্যকরী সূত্রটি স্বীকার করে নিতে পারি যে, সূর্য ও পৃথিবীর পূর্বের মত আপেক্ষিক অবস্থান বর্তমান থাকবে এবং পৃথিবী আগের মত তার অক্ষের চারদিকে ঘুরতে থাকবে, তাহলে প্রদত্ত তথ্য ও এই স্বীকৃত তথ্যের সংযোগে আমরা নির্ণেয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

এখানে প্রকল্পিত সূত্র ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে মিল আছে। সুতরাং সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত করা যেতে পারে। যেখানে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে প্রকল্পিত সূত্র খাপ খাবে সেখানে গণিতের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ফলপ্রদ এবং নির্ভুল। সুতরাং, গণিতের পদ্ধতি বাস্তব জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের ভালভাবেই সাহায্য করতে পারবে।

দশম পরিচ্ছেদ

উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে গণিতের স্থান

[Place of Mathematics in the High School Level]

আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গণিতের স্থানটি খুব পরিষ্কার নয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গণিত আবশ্যিক। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে গণিত ঐচ্ছিক বিষয়। আবার দশম শ্রেণী পর্যন্ত কোর গণিত রাখা হয়েছে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোর গণিত পরীক্ষা দিতে হয় না বলে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বিষয়টির শিক্ষণ অবহেলিত। দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ে গণিত আবশ্যিক।

আমাদের আলোচ্য বিষয়—উচ্চ বিদ্যালয়ে গণিত আবশ্যিক হবে, না, ঐচ্ছিক হবে। পাঠক্রমেই বা গণিতের স্থান কি হবে?

অনেকের মতে উচ্চবিদ্যালয় স্তরে গণিতকে ঐচ্ছিক বিষয় করা উচিত। তাঁরা বলেন যে, গণিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা সকল ছাত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। গণিতে পারদর্শিতার মূলে আছে জন্মগত বিশেষ ক্ষমতা যা সকলের থাকে না। এইজন্য উচ্চ বিদ্যালয়স্তরে গণিত পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ হয় না।

অধ্যাপক *Spearman* তাঁর দ্বি-উপাদান তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধি দুটি উপাদানের সমষ্টি—একটি *g*-উপাদান ও অন্যটি *s*-উপাদান। যে সমস্ত বিষয় শিক্ষার উপর *g*-উপাদানের তুলনায় *s*-উপাদানের প্রভাব বেশী, সেগুলি জন্মগত বিশেষ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। সেগুলিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অভীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, গণিত-শিক্ষায় *g*-উপাদানের প্রভাবই বেশী। গণিতে দক্ষতা জন্মগত কোন বিশেষ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। **উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করলে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত ছাত্রই গণিতে কৃতিত্ব দেখাতে পারে।** উচ্চ-স্তরে গণিত পরীক্ষার ফল ভালো হয় না। তার জন্য দায়ী আমাদের ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পদ্ধতি—গণিত-বিষয়টির মধ্যে নিহিত কোন অজ্ঞাত রহস্য নয়। সরল, সহজ ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে, ছাত্রেরা বিষয়টি শিখতে আগ্রহী ও সক্ষম হবে। বর্তমানে গণিত-পাঠে অধিকাংশ ছাত্রদের যে বিরক্তি বা বিতৃষ্ণা দেখা যায়, তা বিদূরিত হবে।

শিক্ষা একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া। ইহার অনেকগুলি লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। ঐ নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলির দিকে নজর রেখেই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। **শিক্ষার লক্ষ্যগুলিতে উপনীত হতে প্রত্যেকটি বিষয়েরই কিছু-না-কিছু অবদান আছে। যে কোন বিষয়-শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করলেই বিষয়টি শিক্ষার কোন কোন লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে তা' বুঝা যায়।**

গণিত-শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এইগুলির ভিত্তিতেই আমরা স্থির করতে পারি গণিত বিষয়টি উচ্চ-বিদ্যালয়ে আবশ্যিক হবে অথবা ঐচ্ছিক হবে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে গণিত-শিক্ষণের তিনটি মূল উদ্দেশ্য—১। ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ২। কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্য। ৩। শৃঙ্খলামূলক উদ্দেশ্য।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গণিত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রত্যহিক জীবনে কিছু-না-কিছু গণিতের সাহায্য দরকার হয়। অতএব প্রত্যেককেই দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার উপযোগী গণিত শিক্ষা করতে হবে। এর জন্য অবশ্য উচ্চ গণিত শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। তবে পাটীগণিতের শিক্ষা ভালোভাবে থাকা চাই। বহু বৃত্তিতেই আবার গণিতের জ্ঞান প্রয়োগ করতে হয়। এইরূপ বৃত্তির সংখ্যা সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। আজকের শিশু ভবিষ্যতে কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে তা আগে থেকে স্থির করা সম্ভব নয়। সুতরং উচ্চ-বিদ্যালয়ে গণিতকে ঐচ্ছিক করলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের বৃত্তি-গ্রহণের পথ সঙ্কুচিত হবে। ভারতে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অল্প বয়সে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করে। বৃত্তি-নির্ণয়ে তাদের অল্প বয়স একটা বাধা। এ ছাড়া অভিভাবকদের অনেকেই অশিক্ষিত। তাদের সকলের পক্ষেও কোন বিষয়ের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এই দিক থেকে বিচার করলে উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে গণিতকে একটি আবশ্যিক বিষয় করাই সমুচিত বলে মনে হয়।

সভ্যতার প্রগতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূল গণিত। সভ্যতার অগ্রগতিতে উচ্চতর কলেজ-শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। কলেজের শিক্ষায় বহু বিষয় আছে, সেগুলি আয়ত্ত করতে হলে গণিতের জ্ঞান থাকা চাই। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গণিতকে ঐচ্ছিক বিষয় করলে উচ্চতর শিক্ষার্থীদের অসুবিধায় পড়তে হবে। এর উত্তরে অনেকে বলেন, **ছাত্রদের প্রবণতা দেখে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গণিত শিক্ষণের ব্যবস্থা করলে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।** কিন্তু কোন বিষয়ে প্রবণতা পরিমাপ করা সহজ নয়—বিশেষ করে শিক্ষার্থীর অল্প বয়সে। শিক্ষার্থীর প্রবণতা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন, মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-পদ্ধতি, উত্তম পাঠ্য-পুস্তক, উপযুক্ত বয়স প্রভৃতি। গণিতকে আবশ্যিক করলেই এ সমস্যার সমাধান হয়।

সমালোচকেরা বলবেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেই বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা ছেড়ে দেয় এবং খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রই কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করে। অল্প সংখ্যক উচ্চতর শিক্ষার্থী ছাত্রের জন্য সমগ্র ছাত্রসমাজের উপর গণিতের বোঝা চাপান উচিত নয়। **উত্তরে বলা যায়, নানা কারণে প্রথম জীবনে শিক্ষা থেকে অবসর নিলেও অনেকেই অধিক বয়সে আবার পড়াশুনা আরম্ভ করে। গণিত না জানার ফলে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্র এদের কাছে বেশ সঙ্কুচিত হয়।** তা

ছাড়া শিক্ষার প্রয়োজনে গণিতের ব্যবহার না থাকলেও জীবনের প্রয়োজন থেকে গণিতকে বাদ দেওয়া যায় না।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনেরও জটিলতা বেড়েছে। আধুনিক সভ্যতার সবকিছুই পরোক্ষভাবে গণিতের উপর নির্ভরশীল। এই সভ্যতার বিকাশে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করতে হয়। ব্যক্তি-জীবন থেকে গণিতকে বাদ দিলে সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন, পূর্ত, কৃষি, রেলপথ ও গৃহনির্মাণ, নৌচালনা, জরিপের কাজ প্রভৃতির কোন-না কোন কাজে ব্যক্তি মাত্রকেই অংশ গ্রহণ করতে হয়। এই সমস্ত কাজেই গণিতের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু পাটীগণিতের জ্ঞানের সীমার মধ্যে এগুলি আর আবদ্ধ নয়। উন্নত দেশ মাত্রই এই সব কাজে উচ্চ গণিতের জ্ঞানকে প্রয়োগ করছে। আবার গণিতের জ্ঞান অধিকতর প্রয়োগ করার ফলেই ঐ সমস্ত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। **সুতরাং সভ্যতার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হলে খুব বেশী সংখ্যক ব্যক্তিকে গণিতে ব্যুৎপন্ন করা দরকার। এই দিক থেকে চিন্তা করলে গণিতকে উচ্চ বিদ্যালয়ে আবশ্যিক বিষয় করা উচিত।**

গণিতে বিশেষভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করাই গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। গণিতের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সমধিক। গণিত শিক্ষার ফলে শিশুর জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতাগুলি সমাজ-অনুমোদিত উন্নত স্তরে পরিচালিত হয়। পর্যবেক্ষণ করা, সঠিক চিন্তা ও বিচার করা প্রভৃতি ক্ষমতার বিকাশ ঘটে গণিত শিক্ষার মাধ্যমে। **এক কথায় বলা যেতে পারে যে, শিশুর মানসিক শক্তি পূর্ণভাবে বিকশিত করতে হলে গণিত শিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে আমাদের মনে হয় উচ্চ বিদ্যালয়স্তরেও গণিত আবশ্যিক বিষয় হওয়া উচিত।**

তত্ত্বগত আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, উচ্চ স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে গণিতকে আবশ্যিক বিষয় করা দরকার। কিন্তু বাস্তবে এই পথে অনেক বাধা আছে। গণিতকে আবশ্যিক বিষয় করতে হলে গণিত-শিক্ষণ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্তন না করলে শিক্ষার্থীকে গণিত-শিক্ষায় আগ্রহী করা যাবে না। পাঠক্রমেরও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা দরকার। শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতিতে দ্রুত শিক্ষিত করতে হবে এবং বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষকতা কাজে একাগ্রতা সৃষ্টি করার জন্য তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া দরকার। এগুলি করা সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। উচ্চ বিদ্যালয়ে এখনই গণিতকে আবশ্যিক বিষয় করলে, শিক্ষার্থীদের বর্তমানে গণিতপাঠে যে বিতৃষ্ণা বা ভীতি দেখা যায়, এবং যার ফলে গণিত-বিষয়ে অসাফল্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তা রোধ করা তো সম্ভব হবে না বরং বৃদ্ধি পাবে। **সেইজন্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা সমস্যাটির** সমাধানে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলির পক্ষে মত দিচ্ছি।

১। **অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গণিত আবশ্যিক বিষয় থাকবে।**

২। উচ্চতর শ্রেণীতে গণিত ঐচ্ছিক বিষয় হবে। কিন্তু যারা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য ঐচ্ছিক গণিত অবশ্যই পাঠ্য থাকবে।

৩। দশম শ্রেণী পর্যন্ত কোর গণিত থাকবে। কিন্তু কোর গণিতে পাটীগণিতের প্রাধান্য থাকবে এবং বীজগণিত ও জ্যামিতির পাঠ্যসূচা থেকে বাস্তব জীবনে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে ছাত্রদের বোঝা কমাতে হবে।

৪। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোর গণিতেরও পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠক্রমে মাতৃভাষার স্থান সর্বপ্রধান। ইহার মাধ্যমেই আমরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করি এবং সমাজের গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারি। সমস্ত বিষয় শিক্ষা করার ইহাই প্রকৃষ্ট বাহন। আদিম অসভ্য যুগ থেকে বর্তমান সভ্য যুগে উত্তীর্ণ হতে মাতৃভাষাই আমাদের সাহায্য করেছে।

মাতৃভাষার পরে পাঠক্রমে গণিতের স্থান হওয়া উচিত। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান না থাকলেও ব্যবহারিক জীবনের কাজ-কর্ম চলতে পারে। কিন্তু গণিতকে বাদ দিয়ে আমাদের একদিনও চলে না। বিজ্ঞান. ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির অগ্রগতিতে গণিতের অবদান অপরিমিত। ব্যবহারিক ও কৃষ্টিমূলক মূল্য ছাড়াও গণিতের শিক্ষামূল্য অপরিসীম।

সুতরাং পাঠক্রমে গণিতের স্থান দ্বিতীয় হওয়া উচিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গণিতের পাঠক্রম

[Curriculum in Mathematics]

পাঠক্রম পরিবর্তনের কারণ ঃ

গণিত কেন পড়ানো হবে সে বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখন আমরা আলোচনা করব 'গণিতের কোন্ কোন্ অংশ পড়ানো হবে অর্থাৎ গণিতের পাঠক্রম কি হবে'। এটা নির্ভর করছে 'গণিত কেন পড়ানো হয়'—তার উত্তরের উপর।

শিক্ষার লক্ষ্য চিরদিন স্থির থাকে না। ইহা পরিবর্তনশীল। শত বৎসর আগে জীবন ও সমাজ সরল ছিল। আজ আর সেরূপ নেই। জীবনে ও সমাজে যথেষ্ট জটিলতা এসেছে। আগামী যুগে আরও পরিবর্তন আসবে ও জটিলতা বাড়বে। সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এবং মানুষের জীবনে নব নব চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে। এই সব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে হয় এবং লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠক্রম সংগঠন করা হয়। যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্যও যেমন পরিবর্তিত হয় পাঠক্রমেরও তেমন পরিবর্তন করা দরকার হয়। আগেকার দিনে শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহা মানসিক শিক্ষারই নামান্তর ছিল। এই শিক্ষার বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিশেষ যোগ ছিল না। বর্তমানে শিক্ষা জীবনকেন্দ্রিক। ইহা আপামর জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার ও উন্নতির ফলে শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণারও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এই সব কারণে শিক্ষার মূল্য ও লক্ষ্যেরও পরিবর্তন হয়েছে। পাঠক্রমও তাই যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া চাই।

গণিতের পাঠক্রম গণিত-শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গণিত-শিক্ষণের উদ্দেশ্য মূলত দুটি—

১। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ।

২। মানসিক শিক্ষা।

শুধুমাত্র জ্ঞান আহরণের জন্যই শিক্ষার কোন মূল্য নেই। বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। আবার জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হলে মানসিক শিক্ষার দরকার। কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব ও অভ্যাস গঠনের প্রয়োজন। বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে যেমন মানসিক শিক্ষার উৎকর্ষতা ঘটে তেমনই মানসিক শিক্ষার বৃদ্ধির ফলে জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা বাড়ে। সুতরাং পাঠক্রম রচনাকালে গণিত-শিক্ষণের মূল লক্ষ্য দুটির ওপর সমান গুরুত্ব দিতে

হবে। গণিতের পাঠক্রমে এমন বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট করতে হবে যাতে পাঠকালে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে যে গণিত তার জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ; দেখতে হবে যেন শিক্ষার্থী বিষয়টি শিখতে আগ্রহ বোধ করে। আবার একই সঙ্গে দেখতে হবে যেন পাঠক্রমের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ ঘটায়; তার বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ, সঠিক চিন্তা করা, বিচার করা, বিশ্লেষণ করা প্রভৃতি ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

গণিতে পাঠক্রম নির্ধারণের নীতি ঃ

গণিতের পাঠক্রমে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা সম্বন্ধে J. W. A. Young নিম্নলিখিত পাঁচটি নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

॥ ১ ॥ সবচেয়ে স্পষ্ট ও সুবিধাজনকভাবে গাণিতিক চিন্তাধারা বিকশিত করা। (*To exhibit most clearly and to best advantage the mathematical type to thought*)

॥ ২ ॥ প্রকৃতির নিয়মাবলী ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করা। (*To help to a better understanding of the laws of nature*).

॥ ৩ ॥ সমাজজীবন ও আধুনিক জীবনের কাজ-কর্মের সঙ্গে গণিতের সম্বন্ধ নির্ণেয়ে সাহায্য করা এবং উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে গণিত কি ভাবে সাহায্য করতে পারে তা দেখান। (*To bring out distinctly the mathematical relationships that exist in the social organism and in the activities of modern life, and to show how mathematics aids in solving their problems*).

॥ ৪ ॥ শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনের প্রয়োজনে গণিতকে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করার শিক্ষা দেওয়া (*To give sufficient skill in the actual performance of mathematical processes to meet the future needs of the pupils*).

॥ ৫ ॥ বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাতত্ত্বের চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র বিষয়টির সুষম সংগঠন। (*To permit the organisation of the material into a homogeneous whole meeting the demands of scientific pedagogy.*)

গণিতের পাঠক্রমে বিষয়বস্তু সংগঠনের নীতি ঃ

পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সংগঠনের মূল নীতি হবে **শিশু-কেন্দ্রিক**। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে, শিশুই শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ। শিশুর রুচি, ক্ষমতা, প্রবণতা প্রভৃতি জানতে হবে এবং সেই মত তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাকে বয়স্ক লোকের ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করে অনুরূপ পাঠক্রম করলে চলবে না। শিশু—শিশুই। তার জগৎ বয়স্ক লোকের জগৎ থেকে আলাদা। বয়স্ক লোকের রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতি থেকে তার রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতি পৃথক। শিশু ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রতি

স্তরেই তার চাহিদা আছে। সেগুলির দিকে নজর রেখেই পাঠক্রম সংগঠন করতে হবে। রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনোপ্রকৃতি এবং মানসিক বয়সও জানতে হবে। এইভাবে শিশু-কেন্দ্রিক পাঠক্রম সংগঠন করলেই শিশুর শিক্ষায় আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দেবে।

পাঠক্রমে বিষয়বস্তু সাজাবার পদ্ধতি ঃ

পাঠক্রম সংগঠনের কাজে বিষয়বস্তুকে পাঠক্রম সংগঠনের মূল নীতি অনুসরণ করে সাজানোর দরকার। এ সম্বন্ধে নানারূপ পদ্ধতি আছে। উহাদের কোনটিকেই সম্পূর্ণরূপে এককভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। শিশুর প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে তার মানসিক বয়স অনুযায়ী যে পদ্ধতি শ্রেয় হবে, তাই অনুসরণ করা উচিত। এখন আমরা বিভিন্ন বিষয়বস্তু সাজানোর বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Psychological Method) ঃ

এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু শিশুর মানসিক বিকাশকে অনুসরণ করে চলে। ইহা শিশু-কেন্দ্রিক। কাজেই বিষয়বস্তুকে শিশু অনুসরণ করে না। বিষয়বস্তু শিশুর রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, ক্ষমতা প্রভৃতি অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিশু শিক্ষায় আকৃষ্ট হয় এবং বিষয়বস্তুতে তার আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি হয়। শিশু গণিতকে তখন একটা অর্থপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে। এরূপ পাঠক্রমে বিষয়বস্তু সরল থেকে জটিল, জানা থেকে অজানার দিকে শিশুকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

যুক্তিসম্মত পদ্ধতি (Logical order) ঃ

যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে শিশুর উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যুক্তিসম্মত জ্ঞানের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। যুক্তি ও বিচারকরণ ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইরূপ সংগঠনে শিক্ষকের কোন স্বাধীনতা থাকে না। পাঠক্রমে বিষয়বস্তু যেভাবে সাজানো থাকে, সেই ভাবেই পড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে এবং ঐ নির্দেশ অনুসরণ করতে হয়।

মনোবিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত বিন্যাসের কোনটিই সম্পূর্ণ এককভাবে পাঠক্রমে অনুসরণ করা সম্ভব নয় ;—সমীচীনও নয়। পাঠক্রম-বিন্যাস দুটির সমন্বয়েই করতে হবে। যেখানে মনোবিজ্ঞানসম্মত বিন্যাস উপযুক্ত নয় বা সহজ নয় সেখানে যুক্তি-সম্মত বিন্যাসই গ্রহণ করা উচিত। আবার যেখানে যুক্তিসম্মত বিন্যাস অপেক্ষা মনোবিজ্ঞানসম্মত বিন্যাসই কার্যকরী সেখানে ঐরূপ বিন্যাস করাই দরকার। যুক্তি-সম্মতভাবে পূর্ণ সংখ্যাসংক্রান্ত অধ্যায়ের পর দশমিক ভগ্নাংশ অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়।

যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে গণিতের বিস্তৃত বিষয়বস্তু থেকে শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী

বিষয়বস্তুকে যুক্তিসম্মতভাবে নির্বাচন করতে হয়। এই নির্বাচন কাজটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানসম্মত হওয়া চাই। নির্বাচনের সময় বিষয়বস্তুর শিক্ষামূলক ও ব্যবহারিক —উভয় দিকের কথা চিন্তা করা দরকার। শিশুর মানসিক বয়সের কথাও স্মরণ রাখতে হয়। শিশু কি রকম যুক্তি অনুসরণ করতে পারে এবং সে যাতে পরবর্তী উন্নত যুক্তি করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার জন্য কি কি অধ্যায় সংযোজন করা দরকার তাও বিবেচনা করতে হয়। কাজেই গণিতের পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সংগঠনে একই সঙ্গে মনোবিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত উভয়বিধ বিন্যাসের সাহায্য নিতে হবে। প্রথমটিতে শিশুর আগ্রহ সঞ্জীবিত হবে এবং দ্বিতীয়টিতে বিষয়বস্তুর বিন্যাসে বিভিন্ন অংশগুলি সুসম্বন্ধযুক্ত হবে।

বিষয়বস্তুমূলক পদ্ধতি (Topical Method) :

এই পদ্ধতিতে যে কোন বিষয়বস্তু আরম্ভ করলে সেই সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন বিষয় ধরা হয় না। এই পদ্ধতির অনেক দোষ আছে। একই বিষয় নিয়ে খুব বেশীদিন ধরে পড়ালে, ছাত্রদের বিষয়টির প্রতি বিরক্তি জন্মায়, বিষয়টি একঘেয়ে মনে হয়। তাছাড়া যে কোন বিষয়ের সমস্ত অংশ একই স্তরে ছাত্রদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বিষয়বস্তুর কাঠিন্য নির্ভর করবে ছাত্রের মানসিক বয়সের উপর। শিক্ষণ সম্পূর্ণ ও নিখুঁত করার আগ্রহ শিক্ষকের থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ছাত্রের মানসিক বয়স শিক্ষণের উপযুক্ত না হলে শিক্ষণ ফলপ্রসূ হয় না। তাছাড়া একটা বিষয় শেষ করার পর পরবর্তী স্তরে যদি তার আর আলোচনা করা না হয় তা'হলে বিষয়টি ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ নয়।

এককেন্দ্রিক পদ্ধতি (Spiral or Concentric Method) :

যে কোন বিষয়ের কিছু অংশ সরল ও পরবর্তী অংশ ক্রমশঃ কঠিন হয়। যেমন, ক্ষেত্রফল শেখা ঘনফল শেখা অপেক্ষা সহজ। আবার আয়তঘনফল অপেক্ষা বৃত্তের ক্ষেত্রফল শেখা কঠিন। একই বিষয়বস্তুকে কাঠিন্য অনুসারে বিভক্ত করে বিভিন্ন পাঠদান করার যে পদ্ধতি তাকেই এককেন্দ্রিক পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং ইহা ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী। এই পদ্ধতিতে পাঠ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কম। কারণ, প্রতি স্তরেই পাঠটির অনুশীলন হয় কাঠিন্য অনুসারে। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের মানসিক বয়স অনুযায়ী পাঠ্যবস্তু স্থির করা সম্ভব হয়।

কর্মতৎপরতামূলক পদ্ধতি (Principle of Activity) :

শিক্ষাতত্ত্বে কর্মতৎপরতামূলক শিক্ষার একটি বিশেষ মূল্য ধরা হয়। অনেকের মতে কর্মতৎপরতামূলক শিক্ষা শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। শিশুরা শিক্ষণীয় বিষয়টি হাতে-কলমে করতে পারলে আনন্দ বোধ করে এবং শিক্ষায় আগ্রহী হয়।

মূর্ত বস্তু দিয়ে শিক্ষা আরম্ভ করতে হবে। বিমূর্ত ধারণা ধীরে ধীরে আপনিই হবে। এই পদ্ধতিতে শিশুর কর্মতৎপরতার দিকে বেশী জোর দেওয়া হয়।

উপযোগিতামূলক পদ্ধতি (**Principle of Utility**) :

গণিতের উপযোগিতামূলক দিকটির বিষয় এই পদ্ধতিতে জোর দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির লক্ষ্য শিশুকে সুনাগরিকরূপে তৈরী করা। এই পদ্ধতি অনুসারে পাঠক্রমে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হলে দেখতে হবে—(১) ইহা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কিনা, (২) অন্যান্য বিষয়-শিক্ষায় কাজে লাগবে কিনা, (৩) অন্তত কয়েকটি বৃত্তির উপযোগী কিনা, (৪) সভ্যতার অগ্রগতির অঙ্গস্বরূপ ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, উৎপাদন প্রভৃতির সহায়ক কিনা।

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি (**Activity-centred Method**) :

এই পদ্ধতিতে কোন কর্মকে বা কর্মসমস্যাকে অবলম্বন করে পাঠক্রমের বিন্যাস করা হয়। যেমন, বুনিয়াদী শিক্ষায় পরিবেশ অনুযায়ী কোন বৃত্তিকে বা কর্মকে কেন্দ্র করে, বৃত্তিটির শিক্ষায় প্রকৃত যোগ্যতা অর্জন করার জন্য যা কিছু শিক্ষণীয় সেগুলি বৃত্তি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে শিখতে হয়। পাঠক্রমও বিন্যস্ত হয় তার উপযোগী করে। কর্মসমস্যামূলক পদ্ধতিতে (*Project Method*) কোন কর্মসমস্যাকে কেন্দ্র করা হয়। কর্মটিকে ঠিক মত সম্পাদন করতে যা কিছু শিক্ষণীয় সেগুলি পাঠক্রমে সন্নিবিষ্ট হয়।

অনুবন্ধমূলক পদ্ধতি (**Principle of Correlation**) :

গণিতে চার রকম অনুবন্ধ আছে। (১) জীবনের সহিত অনুবন্ধ, (২) অন্যান্য বিষয়ের সহিত অনুবন্ধ, (৩) গণিতের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে অনুবন্ধ ও (৪) একই শাখার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সঙ্গে অনুবন্ধ। এই চারটি অনুবন্ধের দিকে দৃষ্টি দিয়ে পাঠক্রম সংগঠন করা হয় এই পদ্ধতিতে।

এইরূপ আরো অনেক পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটি বিষয়ের পাঠক্রম বৎসরের প্রথমে নির্ধারণ করা দরকার। তা হলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যে কোন বিষয়ের পাঠক্রম নির্বাচন করা সম্ভব হবে। পাঠক্রমকে ছাত্রদের রুচি, ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে, তাদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জীবনভিত্তিক করতে হবে। পাঠক্রম-বিন্যাসে ছাত্রদের সামাজিক চাহিদার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং পাঠক্রমটি এমন হবে যেন দরকার মত তাকে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা যায়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ের জন্য পাঠক্রমকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পাঠক্রমটি যেন নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয় এ বিষয়ে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে।

গণিতের বর্তমান পাঠক্রমের সমালোচনা :

শিক্ষাই জীবন। অতএব জীবনের লক্ষ্যই শিক্ষার লক্ষ্য। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সহ-সম্বন্ধের মান খুব উচ্চ। জীবন গতিশীল। শিক্ষার লক্ষ্যও তাই পরিবর্তনশীল। শিক্ষা জীবনের দাবিগুলি মিটায়—অবশ্যই তার মৌলিক চাহিদাগুলিও। এই চাহিদাগুলি প্রথমে থাকে প্রাকৃতিক (physical) ও শারীরবৃত্তীয় (physiological)। কিন্তু ধীরে ধীরে শিশু যখন বড় হতে থাকে, তখন তার চাহিদাগুলিরও পরিবর্তন হতে থাকে এবং সেগুলি ক্রমশ ব্যাপক হয়। তখন আত্ম-রক্ষার চাহিদাগুলি যেমন থাকে, তেমনি নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক চাহিদাগুলিও আত্মপ্রকাশ করে। এইসব চাহিদা—বিশেষ করে আত্ম-রক্ষার চাহিদা মিটাতে শিশু সক্রিয় হয় এবং মানুষের এই সক্রিয়তারই ফলে সভ্যতার ভিত্তিমূল গড়ে ওঠে। জীবনের মূল বৈশিষ্ট্যই হল সক্রিয়তা। এই সক্রিয়তাই মানুষকে নতুন নতুন আবিষ্কারে এবং নানারূপ পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছে, যার ফলে এই পৃথিবীতে মানব জীবন সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়েছে। সক্রিয়তাই জীবনের সারবস্তু। রুসো বলেছেন, 'জীবন শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য নয় ; ক্রিয়াই জীবন। সক্রিয়তার ফলেই মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সে তার নিকট বা সুদূর পূর্ব অভিজ্ঞতার সহায়তায় সেই সব সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়। অতীত অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নতুন সমস্যার সমাধান করে। মানব জাতির ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে এই আবর্তন চলছে। ইহাই প্রগতি ও সভ্যতার চাবি-কাঠি।

শিক্ষা মানে তথ্যের নিষ্ক্রিয় আয়ত্তীকরণ নয়। শিক্ষা গতিশীল। ইহা অতীতের চর্বিত-চর্বণ নয়—যা শিশু বাস্তবে দেখেনি বা অনুভব করেনি। শিক্ষার মধ্যে এমন জিনিসেরই স্থান পাওয়া উচিত যার সম্মুখীন শিশু নিজেই হয়েছে। শিক্ষকের উচিত নয় তাকে টুকরো টুকরো করে তথ্য পরিবেশন করা। তাঁর কাজ হবে শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশের উপযোগী এমন সব সমস্যার সৃষ্টি করা যেগুলি সমাধান করতে সে উৎসাহিত হবে। সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

গণিত শিক্ষণের উদ্দেশ্য শিশুর বিচার করার শক্তি, স্বচ্ছ চিন্তা করার শক্তি, যুক্তি করার শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, মৌলিকতা শক্তি প্রভৃতিকে উন্নত করা ; তার মানসিক শক্তিগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা ; তার দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে সে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঐগুলি প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করতে পারে ; প্রাকৃতিক নিয়মগুলি ও তার পরিবেশের পরিমাণগত দিকগুলি আবিষ্কার করতে পারে। এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্য শিক্ষকের বক্তৃতা পদ্ধতিতে গণিতের ধারণা, নিয়ম ও সূত্রগুলি পরিবেশন করলে চলবে না। ছাত্ররাই যাতে তাদের কর্ম-তৎপরতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সেগুলি আবিষ্কার করে নিতে পারে সেদিকে সজাগ থেকে তাদের সাহায্য করতে হবে। গণিতের বর্তমান পাঠক্রমকে প্রয়োজন মত প্রণালীবদ্ধভাবে পরিবর্তন করা উচিত। গণিতের পাঠক্রমে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত যেগুলির বাস্তব মূল্য আছে,—

জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে,—যেগুলি ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে ভিত্তিস্বরূপ হবে, তাদের আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গী দান করবে এবং ভৌত-জগতের প্রতি তাদের অনুসন্ধিৎসা জাগাবে। এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্য পাঠক্রমকে কর্ম-তৎপরতা-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে সাজাতে হবে—প্রণালী হবে আবিষ্কারমূলক। এক-কেন্দ্রিক পদ্ধতিও অনুসরণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা যেন মনোবিজ্ঞানসম্মত হয়। গণিত অথবা যে কোন বিষয় শিক্ষণে কর্ম-তৎপরতামূলক পদ্ধতি (Project Method) আদর্শ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়। কারণ, ইহার সঙ্গে জীবনের নিবিড় যোগ থাকে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে এই পদ্ধতি ঠিক উপযুক্ত হয় না। এখানে ঐ পদ্ধতির নীতি অনুসরণ করতে হবে। সপ্তাহে এমন একটি বা দুটি পিরিয়ড রাখতে হবে যেখানে ছাত্রদের গবেষণা করার মানসিকতা গড়ে ওঠে, যার ফলে তারা উচ্চতর শিক্ষা লাভে অনুপ্রাণিত হবে।

কর্ম-তৎপরতামূলক পদ্ধতি বর্তমান অবস্থায় আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং গণিতের পাঠক্রমটিকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো দরকার যাতে পাঠ্য পুস্তকে প্রদত্ত সমস্যাগুলি ও উদাহরণগুলি বাস্তব জীবনমুখী হয়। কোন কোন পাঠ্য পুস্তকে কাল্পনিক সমস্যার অবতারণা করা হয়, যেগুলির সঙ্গে ছাত্রদের বাস্তব-জীবনের কোন সম্পর্ক নেই অথবা সমস্যাগুলি এমন যার অর্থই তাদের কাছে পরিস্ফুট নয়। আমাদের দেখতে হবে যে সমস্যাগুলি যেন ছাত্রদের বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। শিক্ষাগত লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে হলে, গণিতের পাঠক্রমকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে সেগুলি জীবনের সমস্যাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হয়, যাতে ছাত্ররা নিজেদের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সেগুলির যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এইভাবেই তারা প্রকৃত গণিত শিক্ষা লাভ করবে।

গণিতের বর্তমান পাঠক্রম সম্বন্ধে বলা হয় যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই পাঠক্রমটি তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, প্রাচীন পাঠক্রমই অনুসরণ করা হয়েছে। শুধু যে অংশগুলির বিশেষ বাস্তব মূল্য নেই, সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং যে অংশগুলি শিক্ষার্থীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে সেগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর এরূপ কিছু কিছু অংশ সংযোজিত হয়েছে।

গণিতের বর্তমান পাঠক্রমটির কয়েকটি বিভাগ আছে। এগুলি **পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও পরিসংখ্যান।**

দৈনন্দিন জীবনে পাটীগণিতের প্রয়োগই সবচেয়ে বেশী। মেট্রিক-পদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত সমস্যাবলীর সংযোজনের ফলে শিক্ষার্থী প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত পরিমাপ ও গণনার সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচিত হতে সক্ষম হচ্ছে। ঐকিক নিয়ম ও তিনের নিয়মের (*Rule of Three*) সমস্যাগুলি বাস্তবানুগ করা হয়েছে। এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদার পূরণ করার চেষ্টা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে অন্যান্য যে সমস্ত অংশের প্রয়োজনীয়তা বেশী, সেগুলি হল,—ভগ্নাংশ, দশমিক ভগ্নাংশ, বর্গ ও

ঘন নির্ণয়, বর্গ ও ঘনমূল নির্ণয় প্রভৃতি। এগুলির যেমন বাস্তব মূল্য আছে, তেমনি উচ্চতর শিক্ষায় ব্যবহারও আছে।

বীজগণিতের পাঠক্রমে প্রাচীনধারাই অনুসৃত হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশীও নয়। তবে পাটীগণিতের সমস্যা-সমাধানে প্রয়োজন-মত বীজগণিত ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবন এক রকম হয় না। গ্রামের লোক ও শহরের লোকের ব্যবহারিক জীবন বিভিন্ন। শহরের লোকের পক্ষে গণিতের যত রকম ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা সম্ভব, গ্রামের লোকের সে সুযোগ নেই। শহরের উন্নত জীবনধারায় বীজগণিতের ব্যবহারিক প্রয়োগের কিছুটা সুযোগ আছে। উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর জন্যই পাঠক্রমে বীজগণিতের অন্তর্ভুক্তি।

জ্যামিতির পাঠক্রমেও প্রাচীন ধারা থেকে বিশেষ কোন তফাত পরিলক্ষিত হয় না। ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। তবে পরিমিতি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে জ্যামিতির কিছুটা ব্যবহারিক প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক জগতে সর্ব ব্যাপারেই পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিসংখ্যান পাঠক্রমে একটা প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তি।

আমাদের আলোচনায় যেটুকু দেখা গেল, তাতে বলা যেতে পারে যে, পাঠক্রম নির্ধারণের সময় গণিতের ব্যবহারিক দিকটির দিকে কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত পাঠক্রম-রচয়িতারা বলেন, "*The present course in Core Mathematics in our secondary schools is reoriented to the use of mathematics in daily life.*"

গণিতের পাঠক্রম-রচয়িতারা দৈনন্দিন জীবনে গণিতের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রেখেই পাঠক্রমটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু গণিত-পরীক্ষার ফল দেখে বলা যেতে পারে যে, তাঁদের ঐ উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।

এই ব্যর্থতার কারণগুলি অনুসরণ করা দরকার।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, পাঠক্রম নির্ধারণের যে সমস্ত নীতিগুলির কথা অধ্যাপক ইয়ং বলেছেন, গণিতের বর্তমান পাঠক্রম-রচয়িতারা সেগুলির সব অনুসরণ করেন নি। তাঁরা মাত্র একটি নীতির উপর জোর দিয়েছেন। সেটি দৈনন্দিন জীবনে গণিতের প্রয়োগের নীতি। কিন্তু এখানেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। এ ব্যাপারে পাটীগণিতের অংশে যদিও শিক্ষার্থীদের কিছুটা আগ্রহের সঞ্চার হতে পারে, বীজগণিত ও জ্যামিতির ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগে তাদের অনুপ্রাণিত করার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ফলে ঐ বিভাগ দুটির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ উদ্দীপিত হয় নি।

পাঠক্রমে গণিতকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়রূপে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নি। পাটীগণিত, বীজগণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তাদের প্রায়

স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়রূপে পাঠক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে গণিতের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে পাঠক্রম-রচয়িতারা ব্যর্থ হয়েছেন। অনুবন্ধ-পদ্ধতিতে পাঠক্রম রচনা করলে এই ত্রুটির প্রতিকার হত।

পাঠক্রমের বিষয়বস্তু অত্যন্ত বেশী। ফলে ছাত্রদের বিষয়টির প্রতি আগ্রহের বদলে ভীতির উদ্রেক করে। বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দেওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর চাহিদাকে অনুসরণ করে পাঠক্রম রচিত হয় নি। ফলে শিক্ষার্থীকে পাঠক্রম অনুসরণ করতে হয়। এইজন্য পাঠক্রমটি মনোবিজ্ঞানসম্মত হয় নি বলা যেতে পারে।

পাঠক্রম-সংগঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব প্রচুর। শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকেরই গভীর সংযোগ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঠক্রম সংগঠনে আমাদের দেশের শিক্ষকের কোন ভূমিকা নেই। যে পাঠক্রম-রচনায় শিক্ষকের কোন স্থান নেই, তা শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদাকে ভিত্তি করে হতে পারে না। তার ব্যর্থতা অনিবার্য।

কোঠারী কমিশনও (১৯৬৪-৬৬) গণিতের বর্তমান পাঠক্রমের সমালোচনা করেছেন। কমিশনের মতে গণিতের পাঠক্রমে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত করা উচিত নয়। গণিতকে একটি অখণ্ড বিষয় রূপে শিক্ষা দিতে হবে। যেমন, প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা, সংখ্যা-গণনা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বীজগণিতের চিহ্নিত সংখ্যাও যুক্ত করতে হবে। সমস্যা সমাধানের জন্য পাঠক্রমে সমীকরণ সংযুক্ত হবে। তা ছাড়া চিত্র-লেখ, অপেক্ষক সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। জ্যামিতিকে আরো যুক্তিসম্মতভাবে সাজাতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম ঢেলে সাজাতে হবে। ত্রিকোণমিতি বীজগণিতের সঙ্গে একত্রে পড়ানো যেতে পারে। অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিতে হবে। অভেদাবলী, ত্রিভুজের সমাধান, উচ্চতা ও দূরত্বসম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্ন বাদ দেওয়া যেতে পারে। জ্যামিতির *extra* করানো বন্ধ করতে হবে। জ্যামিতি পড়াতে হবে আধুনিক পদ্ধতিতে (*axiomatic and systematic*)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন স্তরে গণিতের পাঠক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(Aims and Objectives of Curriculum at Different Stages)

পূর্ব অধ্যায়ে গণিতের সংগঠনের নীতি এবং বিন্যাসের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে বিভিন্ন স্তরে গণিতের পাঠক্রম সংগঠনের লক্ষ্য (*aims*) ও বিষয়বস্তু (*obectives*) সম্বন্ধে আলোচিত হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে গণিতের পাঠক্রম তিনটি স্তরে বিভক্ত ; প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তর। ১ম—৪র্থ শ্রেণী প্রাথমিক স্তর। ৫ম—৮ম শ্রেণী নিম্নমাধ্যমিক স্তর এবং ৯ম—১০ম অথবা ৯ম—১১শ শ্রেণী উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর।

প্রাথমিক স্তর :—

লক্ষ্য :—

॥ ১ ॥ গণিতের প্রাথমিক বিষয়গুলির অর্থ, প্রক্রিয়া, মূল-নীতি ও সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে শিশুদের সাহায্য করা।

॥ ২ ॥ নির্ভুলতা ও দ্রুততার অভ্যাস ও দক্ষতা-অর্জনে ছাত্রদের সাহায্য করা।

॥ ৩॥ দৈনন্দিন জীবনে গণিতের ধারণা, দক্ষতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

॥ ৪ ॥ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সংখ্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিশুদের সাহায্য করা।

বিষয় বস্তু :—

॥ ১ ॥ সংখ্যা পড়া, লেখা ও গণনা করার দক্ষতা অর্জন করা।

॥ ২ ॥ সংখ্যার স্থানীয় মানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

॥৩ ॥ ০ শূন্য সংখ্যার অর্থ উপলব্ধি করা এবং কিছুই না-অর্থে ০ প্রতীকটির ব্যবহার করতে পারা।

॥ ৪ ॥ পূর্ণ সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগে ব্যুৎপত্তি লাভ করা।

॥ ৫ ॥ যোগ ও গুণের এবং বিয়োগ ও ভাগের মধ্যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করা।

॥ ৬ ॥ স্বাভাবিক সংখ্যা (*cardinal*—১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি) ও ক্রমপর্যায়সূচক সংখ্যার (*ordinal*—১ম, ২য়, ৩য়, প্রভৃতি) মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা।

॥ ৭ ॥ ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারা।

॥ ৮ ॥ বাস্তবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিমাপ ও তাদের একক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

॥ ৯ ॥ পর্যবেক্ষণর দ্বারা তুলনামূলক পরিমাপ করতে পারা। যেমন, আকারে—বড় অথবা ছোট, দৈর্ঘ্যে—দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব।

॥ ১০ ॥ সরল গণনা-সংক্রান্ত সমস্যা বুঝতে পারা, বিশ্লেষণ ও সমাধান করতে পারা।

॥ ১১ ॥ নির্ভুলতা ও দ্রুততার সঙ্গে মৌখিক এবং লিখিত গণনা করতে পারা।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর ঃ

লক্ষ্য ঃ

॥ ১ ॥ পরিবেশ ও সমাজের উপর গণিতের প্রভাব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

॥ ২ ॥ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মানব জাতির অগ্রগতিতে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সংগঠনে ও পরিচালনায় গণিতের অপরিসীম প্রভাব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

॥ ৩ ॥ ব্যবহারিক জাবনে, উচ্চতর গণিতে এবং গণিতনির্ভর বিষয়ে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে গণিতে দক্ষতা অর্জন ও গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সাহায্য করা।

॥ ৪ ॥ শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্বাচনে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা।

বিষয় বস্তু ঃ

॥ ১ ॥ গণনায় দক্ষতা অর্জন করা।

॥ ২ ॥ গাণিতিক ধারণা উপলব্ধি করা ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারা।

॥ ৩ ॥ গণিতের প্রতীকমূলক ভাষা উপলব্ধি ও ব্যবহার করার শক্তি অর্জন করা।

॥ ৪ ॥ প্রমাণ করার অভ্যাসের দ্বারা আত্মনির্ভর হওয়া।

॥ ৫ ॥ বিশ্লেষণ ও নির্ভুলভাবে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করা।

॥ ৬ ॥ যথাযথ এবং স্বচ্ছ চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করা।

॥ ৭ ॥ সামান্যীকরণের (*generalization*) ক্ষমতা অর্জন করা।

॥ ৮ ॥ অন্যান্য বিষয়, পরিবেশ এবং জীবনের সঙ্গে গণিতের সম্বন্ধ নির্ণয় করা।

॥ ৯ ॥ যুক্তিযুক্ত ‘সম্ভাব্য হিসাব’ (estimate) করার ক্ষমতা অর্জন করা

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ঃ

এই স্তরে কোর গণিত পাঠদান করা হয় (৯ম ও ১০ম শ্রেণী)। কোর গণিতে পাঠক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের গণিতের পাঠক্রমের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু একই। কেবল বিষয়বস্তুতে একটি সংযোজনা আছে। সেটি হচ্ছে—পরিসংখ্যানমূলক ও চিত্রলেখমূলক তথ্য সংগ্রহ করা, ব্যাখ্যা করা ও প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করা। এ ছাড়া এই স্তরে

ঐচ্ছিক গণিত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কোর গণিত অপেক্ষা ঐচ্ছিক গণিত কিছু কঠিন এবং ইহার পাঠক্রমও বেশ বিস্তৃত। উচ্চতর গণিতশিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে এবং বিজ্ঞান-শিক্ষায় প্রয়োজনীয় বলিয়া ঐচ্ছিক গণিত শিক্ষার গুরুত্ব খুব বেশী। ঐচ্ছিক গণিতের জ্ঞান বহু বৃত্তি ও শিল্পে কর্মনিপুণতা প্রদান করে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হলে গণিতের পাঠক্রমও উন্নত করতে হবে। গণিতের পাঠক্রম উচ্চতর শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ হতে হবে। আবার গণিতের ব্যবহারের দিকটির প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান যুগে গণিতের অসীম প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিবেচনা করে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেই গণিত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। আমরা এখন ঐচ্ছিক গণিতের পাঠক্রমের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করব।

লক্ষ্য :

॥ ১ ॥ সংখ্যা ও পরিমাণের যথাযথ ব্যবহার করতে সাহায্য করা।

॥ ২ ॥ ব্যক্তিগত, সমাজগত ও অর্থনৈতিক জীবনে গণিতের প্রভাব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

॥ ৩ ॥ সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ-সৃষ্টিতে গণিতের প্রভাব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

॥ ৪ ॥ সৃজনমূলক ক্ষমতা-বিকাশে গণিতের প্রভাব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

॥ ৫ ॥ বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্যে গণিতের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।

॥ ৬ ॥ বিমূর্ত চিন্তা করা, ভাবপ্রকাশে যথাযথ শব্দের ব্যবহার করা, বিচার করা, পর্যবেক্ষণ করা, বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বাছাই করা, সামান্যীকরণ করা প্রভৃতির ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করা।

॥ ৭ ॥ বিশ্লেষণ ও আবিষ্কারের মনোভাব গঠনে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সাহায্য করা।

বিষয় বস্তু :

॥ ১ ॥ গণিতের প্রতীকমূলক ভাষা উপলব্ধি করা এবং তার সার্থক প্রয়োগ করা।

॥ ২ ॥ পরিবেশে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে সাহায্য করা।

॥ ৩ ॥ গাণিতিক তত্ত্ব উপলব্ধি করা।

॥ ৪ ॥ সংজ্ঞা ও প্রকল্প অবলম্বন করে যুক্তিসম্মত নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

॥ ৫ ॥ সংখ্যার ধারণা পরিবর্ধন করা। অমূলদ সংখ্যা (*irrational number* ও কাল্পনিক সংখ্যা (*imaginary number*) সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা।

॥ ৬ ॥ সূচক (*indices*) এবং লগারিদম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা।

॥ ৭ ॥ সমস্যা-সমাধানে চল রাশির ব্যবহার করা।

॥ ৮ ॥ অসীম (*infinity*) ও শূন্য (*zero*) সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করা।

॥ ৯ ॥ সীমা (*limit*), সম্ভাবনা (*probability*) প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করা।

॥ ১০ ॥ *Slide-rule*, লগারিদম ইত্যাদির সারণী (*Table*) ও গণক যন্ত্র (*computing machine*) প্রভৃতির ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করা।

॥ ১১ ॥ জ্যামিতি ও বীজগণিতে অবরোহী ও আরোহী (*Deductive and Inductive*) পদ্ধতি ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করা।

॥ ১২ ॥ জ্যামিতি এবং বীজগণিত অনুবন্ধ-পদ্ধতিতে শিক্ষা করা। গণিতকে একটি সামগ্রিক বিষয় বলে ধারণা করা।

॥ ১৩ ॥ দ্রুততা ও নির্ভুলতার সঙ্গে হিসাব করার ক্ষমতা অর্জন করা।

॥ ১৪ ॥ ব্যবহারিক জীবনে গণিতের জ্ঞানকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গণিত-শিক্ষণে প্রেষণা
[Motivation in the Teaching of Mathematics]

গণিত-শিক্ষণের অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন বিষয় শেখানোর জন্য নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। একজন শিক্ষক যে পরিবেশে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সাফল্য লাভ করেছেন, আর একজন শিক্ষক একই পরিবেশে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যর্থ হতে পারেন। আবার একই শিক্ষক বিভিন্ন পরিবেশে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে কোন ক্ষেত্রে সফল হন এবং অন্যত্র ব্যর্থ হন। গণিতশিক্ষণে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা আগে দরকার। শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারলে শিক্ষা ফলদায়ক হয় না। গণিত-শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে কি করে অনুপ্রাণিত করা যায়? এই কাজে শিক্ষক কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন এবং সেই সব সমস্যা সমাধানের উপায়ই বা কি?—এই সমস্ত বিষয়ে বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

গণিত একটি বিমূর্ত বিষয় এবং ইহার একটি নিজস্ব ভাষা আছে। এই ভাষা প্রতীকমূলক। শিক্ষার্থীর আগ্রহ-সঞ্চালনে এই দুটি বিষয় গণিত-শিক্ষকের কাছে দুরতিক্রম্য বাধাস্বরূপ।

শিশু বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে না। প্রতীকগুলি আবার বিমূর্ত ধারণার প্রতিভূ। সেগুলির অর্থও শিশু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কাজেই শিশুর মানসিক প্রকৃতি গণিত-শিক্ষণে শিক্ষককে সহায়তা করে না।

যে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে বিষয়টির প্রতি শিশুর আগ্রহ সঞ্চার আগে করতে হয়—বিষয়টি শিখতে শিশুকে অনুপ্রাণিত করতে হয়—তার প্রেষণা জাগাতে হয়। গণিত বিষয়টিই এ পথে মস্ত বাধা। শিশুর কাছে বিষয়টি নীরস ও কঠিন মনে হয়।

অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক অপেক্ষা গণিত-শিক্ষককে শিক্ষণ-কাজে অধিকতর সাবধানতা ও মনোযোগের সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। শিশুকে বিষয়টিতে আকৃষ্ট করা ও তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁকে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে চলতে হয়।

গণিত-শিক্ষায় কি ভাবে শিশুর আগ্রহ সঞ্চার করা যাবে? কি ভাবে তার প্রেষণা জাগবে?—গণিত-শিক্ষকের কাছে এটি মস্ত সমস্যা। তাঁকে স্থির করতে হবে—কি কি উপায় তিনি অবলম্বন করবেন—উপায়গুলির মধ্যে কি কি মূল নীতি নিহিত আছে এবং এই মূল নীতিগুলিকে শ্রেণী কক্ষে তিনি কি ভাবে ব্যবহার করবেন।

শিশুর জগৎ বয়স্ক লোকের জগৎ থেকে আলাদা। শিশু—শিশুই। সে বয়স্ক

লোকের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। বয়স্ক লোকের শিক্ষা, তার সমস্যা শিশুর উপর চাপিয়ে দিলে, সে শিক্ষায় বা সে সমস্যা সমাধানে শিশুর আগ্রহ জাগে না। কিন্তু তার নিজস্ব জগতের বাস্তব সমস্যা পেলে শিশু সেটি সমাধানের জন্য বিশেষ তৎপর হয়—বিশেষ আগ্রহ অনুভব করে—এ অভিজ্ঞতা প্রত্যেক শিক্ষকেরই আছে।

শিক্ষায় প্রেষণা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শিশুর জীবনের চাহিদাগুলি শিক্ষার মাধ্যমে পূরণ করতে পারলে তার শিক্ষায় প্রেষণা উৎপন্ন হয়। এই প্রেষণা তাকে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে ও তার আগ্রহ জাগায়।

শিশুর কাজের পিছনে কতকগুলি উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যগুলি এবং তার চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গী তাকে শিক্ষা লাভ করতে অন্তর্জাত প্রেষণা দেয়। বহির্জাত প্রেষণাও তাকে কাজে অনুপ্রাণিত করে। নম্বর, প্রশংসা, পুরস্কার প্রভৃতি বহির্জাত প্রেষণা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে গণনা ও হিসাব করার দক্ষতা অর্জন করা গণিত-শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কাজে শিশুর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। কাজেই যান্ত্রিকভাবে শুধু নিয়মগুলি শেখালে ও অনুশীলন করালেই এ কাজ সিদ্ধ হবে না। **এই যান্ত্রিক কাজে শিশু বরং বিরক্ত হয়। এভাবে শিক্ষা দিলে গণিতে তার বিতৃষ্ণা জন্মাবে। শিশু চায় নিয়মগুলি কি ভাবে হল সেটাই বুঝতে। সে চায় বুঝতে বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কি। প্রতি পদক্ষেপের অর্থটি তার কাছে পরিষ্কার হওয়া চাই। সেইজন্য গণিত-শিক্ষণ শিশুর কাছে অর্থপূর্ণ হওয়া চাই।**

শিশুকে অর্থপূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে :

১। শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশের মূর্ত বস্তু অবলম্বন করে গণিতের ধারণা ও নিয়মগুলি গড়ে তুলতে হবে।

২। মূর্ত বস্তু থেকে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে বিমূর্ত ধারণা ও প্রতীকে উন্নীত হতে হবে।

৩। সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিটি শিশুর বোধগম্য হবে এবং প্রয়োজন হলে সে যেন পদ্ধতিটি নিজেই আবার তৈরী করে নিতে পারে।

৪। প্রথমে দ্রুত এবং নির্ভুল গণনার দিকে জোর দিলে চলবে না। দেখতে হবে শিশুর যেন গণিতে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্যে একটা আবিষ্কারের মনোভাব গড়ে উঠে।

৫। কোন সূত্র বা নিয়ম শেখাবার আগে দেখতে হবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ভিতর দিয়ে শিশুই যেন সামান্যীকরণের (*generalization*) দ্বারা নিয়মটি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

৬। শিশু যেন বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে সম্বন্ধগুলি বুঝতে পারে।

৭। সমস্যা সমাধানের প্রত্যেকটি স্তর শিশু ঠিক মত বুঝতে পারলেই অনুশীলন করার প্রশ্ন আসবে।

৮। গণিতের কোন বিমূর্ত ধারণা শিশুকে দিতে হলে, ঐ ধারণাসম্বলিত নানা রকম চিত্তাকর্ষক সহজ সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সমস্যাগুলি যেন শিশুর জীবনধর্মী হয়।

গণিত ধারাবাহিক বিষয়। পূর্বপাঠ ঠিক মত অধিগত না হলে পরের পাঠ শেখা যায় না। কিন্তু শ্রেণীতে বিভিন্ন বুদ্ধি ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র থাকে। কাজেই প্রত্যেক ছাত্রকে প্রশ্ন করে তার জ্ঞানের সীমা জেনে নিতে হবে শিক্ষককে। শ্রেণীর ছাত্রদের জ্ঞান অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করতে হবে এবং প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রদের তাদের অর্জিত জ্ঞানের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।

গণিত-শিক্ষণ ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে—

॥ ১ ॥ শিক্ষা যেন উদ্দেশ্যপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ হয়।

॥ ২ ॥ শিক্ষা যেন শিশুর জীবনকেন্দ্রিক ও আবিষ্কারমূলক হয়।

॥ ৩ ॥ মূর্ত বস্তুকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে যেন বিমূর্ত ধারণা গঠিত হয়।

॥ ৪ ॥ শিক্ষা যেন সামগ্রিক হয়। বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ও সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কটি শিক্ষার্থী যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

নতুন ধারণা বা মূল নীতি শিশু গ্রহণ করে ধীরে ধীরে। এ বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি করা বা খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া—কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়। এ কাজ একমাত্র শিক্ষকের চেষ্টায়ও সম্পন্ন করা যায় না। শিক্ষক ও ছাত্রের যৌথ প্রচেষ্টায়ই ইহা করা সম্ভব হয়। নতুন ধারণাটি এমনভাবে শিক্ষক উপস্থাপন করবেন যেন ছাত্রের বিষয়টি শিখতে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট প্রণালী নেই। একজন শিক্ষক যেভাবে সাফল্য অর্জন করবেন অন্য শিক্ষক সে পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যর্থ হতে পারেন। এটি ঠিক কোন নির্দিষ্ট শিক্ষণ-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল নয়। ছাত্রদের মানসিকতা সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ, কৌশল প্রভৃতির দ্বারা উপযুক্ত প্রণালীটি নির্ধারিত হয়।

শিক্ষণ ফলপ্রসূ করতে হলে প্রথমেই শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হবে বিষয়-বস্তুর উপর। শিক্ষার্থীর মানসিক বয়স ও বিকাশের উপযোগী করে বিষয়বস্তুকে সংগঠন করতে হবে শিক্ষককে। তারপর শিক্ষার্থীর বুদ্ধি অনুযায়ী চিত্তাকর্ষক করে বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকেও নজর দিতে হবে।

গণিত-শিক্ষককে নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক সমস্যার কথা সদা মনে রাখতে হবে :

১। নতুন ধারণা, মূলনীতি প্রভৃতি বোঝান এবং সেগুলি শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করান।

২। আয়ত্তীকৃত বিষয় যাতে শিক্ষার্থীর স্মরণে থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

৩। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর আয়ত্তীকৃত জ্ঞান যাতে ঠিক মত সঞ্চালিত হয় তার ব্যবস্থা করা।

প্রথমটির জন্য শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞান জেনে নিবেন।

তারপর নতুন বিষয় পরিবেশন করবেন শিক্ষার্থীর মানসিক বয়সের উপযোগী করে, তার মধ্যে আবিষ্কারের মনোভাব জাগিয়ে তুলে এবং তার পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে। যতদূর সম্ভব শিক্ষক মডেল, চার্ট, চিত্রলেখ, ব্ল্যাকবোর্ড প্রভৃতি চাক্ষুষ প্রদীপনের (*Visual aids*) সাহায্য নেবেন এবং ছাত্রকেও কর্মতৎপর করবেন। গতিসংক্রান্ত কিছু বোঝাতে শিক্ষক চলচ্চিত্রের সাহায্য নেবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে ছবি, স্লাইড প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। গণিতের শ্রেণী কক্ষটি গণিতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছবি, নানারূপ সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাজাতে হবে যাতে ছাত্রেরা একটি সুষ্ঠু ও আদর্শ পরিবেশে পাঠগ্রহণ করতে পারে। ভ্রমণ, খেলাধূলা, কো-অপারেটিভ সমিতি সংগঠন প্রভৃতি সহ-পাঠক্রমের সাহায্যও নিতে হবে।

গণিতে অর্জিত জ্ঞানকে মনে রাখার ব্যাপারে থর্নডাইকের শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মগুলি প্রযোজ্য। গণিতের অর্জিত জ্ঞান মাঝে মাঝে ব্যবহার না করলে শিক্ষার্থী ভুলে যায়। সুতরাং গণিতে পূর্বজ্ঞানের অনুশীলন বারে বারে করান দরকার। নতুন নতুন পরিবেশে পূর্বজ্ঞানকে প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থী আগ্রহের সঙ্গে অনুশীলন করে। মাঝে মাঝে দুর্বলতা নির্ণায়ক অভীক্ষা এবং Inventry অভীক্ষা করলে অনগ্রসরতার কারণ দূর করা যায়।

তৃতীয় সমস্যাটির জন্য গণিতের পঞ্চম নিয়ম (fifth rule) অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োগ করতে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গণিতের পঞ্চম নিয়মটি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। সেটি নীচে দেওয়া হল।

গণিতে পঞ্চম নিয়ম (Fifth rule in Mathematics) ঃ

যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগকে গণিতের মূল চারটি নিয়ম বলে। গণিতে পঞ্চম নিয়ম বলতে আমরা বুঝি সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োগ। গণিতে মূল নিয়ম চারটি হলেও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছাত্রদের অনেক নিয়মই শিখিয়ে থাকি। এই সমস্ত নিয়মগুলি যথাযথ ব্যবহারের উপরই ছাত্রদের গণিতে দক্ষতা প্রকাশ পায়। নিয়মগুলি শেখানোর উপরেই বেশী জোর দেওয়া বা যান্ত্রিকভাবে সেগুলি শিখতে ছাত্রদের অভ্যস্ত করানো কখনই উচিত নয়। নিয়মগুলি শেখানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে ছাত্ররা যেন সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ে সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। ঐগুলি ঠিক মত প্রয়োগ করতে হলে তাদের সাধারণ জ্ঞানকে নিয়োগ করতে হবে। এই সাধারণ জ্ঞানের ব্যবহার করতে শেখানই গণিতের অন্যতম উদ্দেশ্য। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এই সাধারণ জ্ঞানই আমাদের পথ প্রদর্শক।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন নিয়মই অপ্রয়োজনে শেখানো উচিত হবে না। শিক্ষণে নিয়মের সংখ্যা যত কম হয় ততই ভালো এবং যে সমস্ত নিয়ম শেখানো হবে সেগুলি তাদের শুধু মুখস্থ করানো বা যান্ত্রিকভাবে সেগুলিকে ব্যবহার করতে শেখানো চলবে না, নিয়মগুলি সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আরোহী পদ্ধতিতে ছাত্ররাই যাতে

আবিষ্কার করে, সেদিকে শিক্ষকের সর্বদা নজর থাকা দরকার। নিয়মগুলি ছাত্ররা নিজেরা আবিষ্কার করলে,—সেগুলি ভুলে গেলেও পুনরাবিষ্কার করতে তারা সক্ষম হবে।

সমস্যার সম্মুখীন হলেই ছাত্ররা তার সমাধান করতে সচেষ্ট হয়,—তাদের সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে। তাই ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করার শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষক সমস্যার মাধ্যমেই শেখাতে সচেষ্ট হবেন। তাঁকে দেখতে হবে ছাত্ররা যাতে সমস্যাটিকে ঠিক মত বিশ্লেষণ করতে পারে, তা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বেছে নিতে পারে এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য কোন পথে অগ্রসর হতে হবে সেটি যেন বুঝতে পারে। এই শিক্ষাই গণিতের প্রকৃত শিক্ষা। এই জন্যই সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োগ করার শিক্ষাকেই গণিতে পঞ্চম নিয়ম বলে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গণিত-শিক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রণালী

[Different Methods & Modes of Teaching Mathematics]

গণিত-শিক্ষণে দুটি শব্দের কথা প্রায়ই শোনা যায়। একটি হল পদ্ধতি (*Method*) এবং অপরটি প্রণালী (*Mode*)। অধ্যাপক *J. W. A. Young* বলেন, '*In the study of the pedagogy of mathematics, the point of view is sometimes that of the manner in which the subjects-matter is arranged and developed; at others that of the manner in which it is presented to the pupils. *** The former has sometimes been called method and the latter mode*". **পদ্ধতি** বলতে আমরা বুঝি—বিষয়বস্তুকে যেভাবে সাজানো হয় এবং সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয় তাকে **প্রণালী** বলে। 'পদ্ধতি' ও প্রণালীর' মধ্যে যে পার্থক্য এখানে দেখানো হল, বাস্তবে তাকে ঠিক অনুসরণ করা হয় না। বাস্তবে উভয়কে প্রায় একই অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

গণিত-শিক্ষণে পদ্ধতি প্রধানত চারটি :

১। **বিশ্লেষণী পদ্ধতি (Analytic Method)**
২। **সংশ্লেষণী পদ্ধতি (Synthetic Method)**
৩। **আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method)**
৪। **অবরোহী পদ্ধতি (Deductive Method)**

এ ছাড়া আরও কতকগুলি পদ্ধতির নাম করা যেতে পারে। যেমন—

১। **সক্রেটিসের পদ্ধতি (Socratic Method)**
২। **আবিষ্কারকের পদ্ধতি (Heuristic Method)**
৩। **বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)**
৪। **পরীক্ষাগার পদ্ধতি (Laboratory Method)**
৫। **ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)**
৬। **একরোখা পদ্ধতি (Dogmatic Method)**
৭। **মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Psychological Method)**
৮। **কার্যসম্পাদনমূলক পদ্ধতি (Project Method)**
৯। **নির্দেশমূলক পদ্ধতি (Assignment Method)** প্রভৃতি।

নিম্নলিখিত প্রণালীগুলির নাম করা যেতে পারে :—

১। **পরীক্ষা প্রণালী (Examination Mode)**

২। আবৃত্তি প্রণালী (Recitation Mode)
৩। বক্তৃতা প্রণালী (Lecture Mode)
৪। দলগত প্রণালী (Genetic Mode)
৫। ব্যক্তিগত প্রণালী (Individual Mode)
৬। পরীক্ষাগার প্রণালী (Laboratory Mode) প্রভৃতি।

ক। পদ্ধতি ঃ

গণিত-শিক্ষণে যে সমস্ত পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে সেগুলির কোনটিকেই কোন নির্দিষ্ট বিষয় শেখানোর জন্য একমাত্র পদ্ধতি বলে চিহ্নিত করা যায় না। একই বিষয় শেখানোর জন্য প্রয়োজন মত বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। **তবে বর্তমানে সংশ্লেষণী অপেক্ষা বিশ্লেষণী, অবরোহী অপেক্ষা আরোহী, তত্ত্বগত অপেক্ষা প্রয়োগমূলক পদ্ধতিকেই মনোবিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।**

এখন আমরা পদ্ধতিগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করব।

বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী পদ্ধতি (Analytic and Synthetic Method) ঃ

বিশ্লেষণ করার মানে হল—বন্ধনমুক্ত করা (unloose) ; যারা একত্রে আছে, তাদের পৃথক করা ; সমগ্র বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে দেখানো। সংশ্লেষণ বলতে বুঝায় খণ্ডিত অংশগুলিকে একত্র করা ; খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে মিলিয়ে সমগ্র রূপটি তুলে ধরা। **গণিতে কিন্তু আমরা বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণকে তাদের ঠিক শব্দগত অর্থে প্রয়োগ করি না। গণিতে আমরা সমস্যাকে বিশ্লেষণ করি অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড অংশে পৃথক করি বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য খণ্ড অংশগুলিকে জুড়ে সমগ্র সমস্যাটিকে কি ভাবে ফিরে পাওয়া যাবে তা আবিষ্কার করা।** সংশ্লেষণী-পদ্ধতিতে বিশ্লিষ্ট খণ্ড অংশগুলিকে একত্রিত করে সমস্যাটি পুনর্গঠিত করা হয় অভীষ্ট ফলালাভের উদ্দেশ্যে। বিশ্লেষণী-পদ্ধতিতে সমগ্র সমস্যাটিকে খণ্ড খণ্ড অংশে পৃথক করা হয় সমগ্র সমস্যাটিকে ঠিক মত উপলব্ধি করার জন্যই। এই পদ্ধতিতে শুধু সমগ্র সমস্যাটিকে বোঝা যায় তা নয়, খণ্ড অংশগুলির সঙ্গে সমগ্র সমস্যার সম্বন্ধটিও নিরূপণ করা যায়। এর ফলে বিশ্লিষ্ট অংশগুলিকে আবার একত্রিত করে সমগ্র সমস্যাটিকে আবার তৈরী করা সম্ভব হয় সংশ্লেষণী-পদ্ধতিতে। সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণের পূরক। বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ করতে সাহায্য করে এবং সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে এবং সম্পূর্ণতা প্রদান করে। শুধু বিশ্লেষণের কোন মূল্যই নেই, যদি না বিশ্লেষণের পরে আবার সংশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ একই পদ্ধতির দুটি দিক মাত্র।

বিশ্লেষণী-পদ্ধতিতে আমরা অজানা তথ্য থেকে জানা তথ্যে উপনীত হই। সংশ্লেষণী-পদ্ধতিতে জানা তথ্য থেকে অজানা তথ্যে পৌঁছাই। জ্যামিতির যে কোন উপপাদ্যে (*Theorem*) প্রদত্ত প্রকল্প (*hypothesis*) থেকে একটি

সিদ্ধান্ত (*conclusion*) প্রমাণ করতে হয়। বিশ্লেষণী-পদ্ধতিতে আমরা অজানা সিদ্ধান্তটি থেকে সুরু করি। সিদ্ধান্তটিকে বিশ্লেষণ করে দেখি, সেটি অন্য কোন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল কিনা। যদি তা হয়, তাহলে আবার দেখি পরবর্তী সিদ্ধান্তটি অন্য কোন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে কিনা। এইভাবে পর পর বিশ্লেষণ করে আমরা প্রদত্ত প্রকল্পটিতে এসে পৌছাই। কিন্তু প্রকল্পটি সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। অতএব সিদ্ধান্তটিও সত্য বলে প্রমাণিত হয়। বিশ্লেষণী-পদ্ধতিতে সুরু করতে হয় অজানা সিদ্ধান্তটি থেকে এবং শেষ করতে হয় প্রদত্ত প্রকল্পে। কিন্তু সংশ্লেষণী-পদ্ধতি ঠিক এর বিপরীত। এই পদ্ধতিতে সুরু করতে হবে প্রদত্ত প্রকল্পকে ভিত্তি করে। তারপর নানা 'চেষ্টা ও ভুলের' মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অগ্রসর হতে হতে উপনীত হতে হবে অজানা সিদ্ধান্তটিতে।

সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী পদ্ধতির একটি তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

	সংশ্লেষণী-পদ্ধতি	বিশ্লেষণী-পদ্ধতি
১।	জানা সত্যগুলিকে একত্রিত করে অজানা সত্যের সন্ধান দেয়।	সমস্যাটিকে সরল খণ্ড খণ্ড অংশে পৃথক করে ঐগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করে।
২।	সংক্ষিপ্ত।	দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ।
৩।	প্রদত্ত প্রকল্প (hypothesis) থেকে সুরু করে সিদ্ধান্তে (conclusion) উপনীত হয়। জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হয়।	সিদ্ধান্ত (conclusion) থেকে সুরু করে প্রদত্ত প্রকল্পে (hypothesis) উপনীত হয়। অজানা থেকে জানার দিকে অগ্রসর হয়।
৪।	এই পদ্ধতিতে বলা হয়—A সত্য হলে B সত্য। আবার B সত্য বলে C সত্য। ইত্যাদি	এই পদ্ধতিতে বলা হয়—C সত্য হয় যখন B সত্য। B সত্য হয় যখন A সত্য। ইত্যাদি
৫।	শিক্ষার্থীর জন্য।	আবিষ্কারকের জন্য।
৬।	স্মৃতিশক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং ইহাতে যুক্তিক্ষমতার বিশেষ উন্নতি হয় না।	সৃজনীশক্তি বিকশিত করে এবং যুক্তি করার ক্ষমতা বেশ উন্নত করে।
৭।	এই পদ্ধতিতে ধাপগুলি অন্ধের মত বা যান্ত্রিকভাবে একে অপরকে অনুসরণ করে। প্রত্যেকটি ধাপের সত্যতা সম্বন্ধে 'কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কেন ধাপগুলি নেওয়া হ'ল তা' রহস্যজনক থেকে যায় এবং শিক্ষার্থী সিদ্ধান্তটিতে যেন হঠাৎ এসে পৌছায়।	এ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ধাপের একটা কারণ ও উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেকটিরই একটা যুক্তি পাওয়া যায়।

	সংশ্লেষণী-পদ্ধতি	বিশ্লেষণী-পদ্ধতি
৮।	প্রমাণ করে কিন্তু ব্যাখ্যা করে না।	প্রমাণ করে এবং ব্যাখ্যা করে।
৯।	খড়ের গাদায় স্ঁচ খুঁজে বেড়ায় (*seeks a needle in the hay stack.—Young*)।	স্ঁচ খড়ের গাদা থেকে বেরিয়ে আসতে চায় (*the needle seeks to get out of the hay stack*)।
১০।	বুদ্ধির ব্যবহার এই পদ্ধতিতে খুব কম হয়। শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত কোন উপকার হয় না।	পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়।
১১।	বিজ্ঞানসম্মত নয়। ইহার দ্বারা বিন্দুমাত্র আবিষ্কারকের মনোভাব গড়ে উঠে না।	বিজ্ঞানসম্মত। ইহা শিক্ষার্থীকে সমস্যা-সমাধানে অনুপ্রাণিত করে এবং তাহার আবিষ্কারকের মনোভাব গড়ে তুলে।
১২।	পদ্ধতিতে একটি সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীর অল্প শিক্ষা লাভ হয়।	পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রভূত শিক্ষা লাভ হয়।
১৩।	যুক্তিসম্মত পদ্ধতি।	মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।
১৪।	শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত পদ্ধতি নয়।	শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত।
১৫।	পদ্ধতির প্রমাণটি ভুলে গেলে সহজে মনে করা যায় না।	পদ্ধতির প্রমাণ ভুলে গেলে পুনরাবিষ্কার করা সহজ।
১৬।	পদ্ধতিতে অবরোহী যুক্তি অনুসরণ করা হয়।	পদ্ধতিতে আরোহী যুক্তি প্রয়োগ করা করা হয়।
১৭।	চিন্তন-প্রক্রিয়ার ফল।	যুক্তি-প্রক্রিয়ার ফল।
১৮।	স্থায়ীভাবে কিছু লিপিবদ্ধ করার পক্ষে উপযুক্ত। পাঠ্য পুস্তক এই পদ্ধতিতে লেখা হয়।	স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করার পক্ষে অনুপযুক্ত। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত।

সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী পদ্ধতি দুটি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং গণিত-শিক্ষণে কোনটিকেই বাদ দেওয়া যায় না। বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে প্রমাণ আবিষ্কার করে সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করা হয় গণিতে। উভয়কেই বলা যায় উভয়ের পূরক (**complementary**)। সংশ্লেষণী-পদ্ধতির প্রমাণে—বিভিন্ন ধাপের ব্যাখ্যা নিহিত থাকে বিশ্লেষণী পদ্ধতির মধ্যে। বিশ্লেষণ ছাড়া সংশ্লেষণ একরোখা (**dogmatic**)। কিন্তু বিশ্লেষণের পরে সংশ্লেষণের উপযোগিতা আছে শ্রেণী কক্ষে। জ্যামিতি ও বীজগণিতে এই দুটি পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী।

উদাহরণ ১। If $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$, prove that

$$(a+b+c)(a-b+c)=a^2+b^2+c^2.$$

বিশ্লেষণী পদ্ধতি। $(a+b+c)(a-b+c)=a^2+b^2+c^2$ অভেদটি সত্য হয়, যখন

$(a+c)^2-b^2=a^2+b^2+c^2$ সত্য হয়

অর্থাৎ যখন $a^2+c^2+2ac-b^2=a^2+b^2+c^2$ সত্য হয়

অর্থাৎ যখন $2ac=2b^2$ সত্য হয়

অর্থাৎ যখন $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$ সত্য হয়

কিন্তু শেষ অভেদটি সত্য।

সুতরাং $(a+b+c)(a-b+c)=a^2+b^2+c^2$ এই অভেদটি প্রমাণিত হল।

সংশ্লেষণী পদ্ধতি। $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$

বা, $ac=b^2$

বা, $2ac=2b^2$

বা, $a^2+c^2+2ac=a^2+2b^2+c^2$

বা, $(a+c)^2-b^2=a^2+b^2+c^2$

বা, $(a+b+c)(a-b+c)=a^2+b^2+c^2$ প্রমাণিত।

এখানে সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে তৃতীয় ধাপে উভয় পক্ষকে কেন 2 দিয়ে গুণ করা হ'ল এবং চতুর্থ ধাপে উভয় পক্ষে কেন a^2+c^2 যোগ করা হ'ল তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, যদি না আমরা বিশ্লেষণী পদ্ধতিটির সাহায্য নিই।

উদাহরণ ২। If $a+b+c=0$, prove that $a^3+b^3+c^3=3abc$

বিশ্লেষণী পদ্ধতি। $a^3+b^3+c^3=3abc$ অভেদটি সত্য হয়

যখন $(a+b)^3-3ab(a+b)-3abc+c^3=0$ সত্য হয়

অর্থাৎ যখন $(a+b+c)^3-3(a+b)c(a+b+c)-3ab(a+b+c)=0$ সত্য হয়

অর্থাৎ যখন $(a+b+c)\{(a+b+c)^2-3ac-3bc-3ab\}=0$ সত্য হয়

অর্থাৎ যখন $a+b+c=0$ সত্য হয়

কিন্তু এই অভেদটি সত্য।

সুতরাং $a^3+b^3+c^3=3abc$ অভেদটি সত্য প্রমাণিত হল।

সংশ্লেষণী পদ্ধতি। $\therefore\ a+b+c=0$

$\therefore\ a+b=-c$

বা, $(a+b)^3=-c^3$

বা, $a^3+b^3+3ab(a+b)+c^3=0$

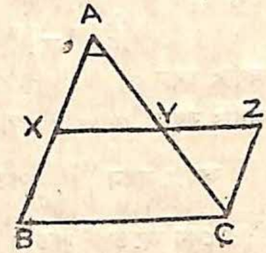
বা, $a^3+b^3+3ab(-c)+c^3=0$ [$\because a+b=-c$]

$a^3+b^3+c^3=3abc$ প্রমাণিত।

সংশ্লেষণী-পদ্ধতিটিতে দ্বিতীয় ধাপে c কেন পার্শ্ব পরিবর্তন করল এবং তৃতীয় ধাপে উভয় পক্ষ কেন ঘন করা হল তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

উদাহরণ ৩।

Prove that the straight line joining the middle points of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to one half of it.



ABC একটি ত্রিভুজ।

XY, AB ও AC বাহুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা।

প্রমাণ করতে হবে যে, XY, BC-এর সমান্তরাল ও অর্ধেক।

বিশ্লেষণী পদ্ধতি। XY, BC-এর অর্ধেক হবে যখন XY-এর দ্বিগুণ BC-এর সমান হবে। সুতরাং XYকে Z পর্যন্ত এমন ভাবে বর্ধিত করা হল যাতে $XY=YZ$ হয়।

আমাদের এখন প্রমাণ করতে হবে $XZ=BC$ এবং $XZ \parallel BC$
দুটি সরলরেখাকে অনেক উপায়ে সমান দেখানো যায় এবং দুটি সরলরেখাকে অনেক উপায়ে সমান্তরাল দেখানো যায়। কিন্তু দুটি সরলরেখাকে একই সঙ্গে সমান ও সমান্তরাল প্রমাণ করার একটি মাত্রই উপায় আছে এবং সেটি হচ্ছে তাদের একটি সামান্তরিকের দুটি বিপরীত বাহু প্রমাণ করা। সুতরাং আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, BCZX একটি সামান্তরিক। এটি প্রমাণিত হবে যদি আমরা দেখাতে পারি যে $CZ=BX$ এবং $CZ \parallel BX$.

অর্থাৎ যদি দেখানো যায় $CZ=AX$ এবং $CZ \parallel AX$ [$\therefore$ $BX=AX$ এবং BX ও AX একই সরলরেখা]

অর্থাৎ যদি দেখানো যায় $CZ=AX$ এবং $\angle ZCY=\angle XAY$.

ইহা সম্ভব হবে যদি আমরা দেখাতে পারি যে $\triangle AYX \equiv \triangle CYZ$

কিন্তু $\triangle AYX \equiv \triangle CYZ$, কারণ

$AY=CY$ প্রদত্ত

$XY=ZY$ অঙ্কন

অন্তর্ভুক্ত $\angle AYX=$ অন্তর্ভুক্ত $\angle CYZ$.

সুতরাং $XY=\frac{1}{2}BC$ এবং $XY \parallel BC$ প্রমাণিত।

সংশ্লেষণী পদ্ধতি।

অঙ্কন ঃ XY কে Z পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করা হল যেন $XY=YZ$ হয়। CZ যোগ করা হল।

প্রমাণ ঃ XAY ও ZYC ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে

$XY=YZ$ (অঙ্কন)

$AY=YC$ (প্রদত্ত)

অন্তর্বর্তী $\angle AYX =$ অন্তর্বর্তী $\angle CYZ$ (বিপ্রতীপ কোণ)

$\therefore$ ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম।

$\therefore$ $CZ = AX = BX$ এবং

$\angle XAY = \angle ZCY$। কিন্তু ইহারা একান্তর কোণ

$\therefore$ $AX \parallel CZ$

$\therefore$ $BX \parallel CZ$ এবং $BX = CZ$

$\therefore$ BCZX একটি সামান্তরিক।

$\therefore$ $XY = \frac{1}{2}XZ = \frac{1}{2}BC$ এবং

$XY \parallel BC$ প্রমাণিত।

উদাহরণ ৪। Problem : Divide a straight line into two parts so that the square on one part is equal to twice the square on the other.

বিশ্লেষণ : মনে করিলাম AB নির্দিষ্ট সরলরেখা এবং D উদ্দিষ্ট বিন্দু।

সুতরাং $AD^2 = 2BD^2$

বা, $\frac{AD^2}{BD^2} = \frac{2}{1}$

বা, $\frac{AD}{BD} = \frac{\sqrt{2}}{1}$



$\therefore$ উদ্দিষ্ট বিন্দুটি AB কে $\sqrt{2} : 1$ অনুপাতে বিভক্ত করে।

AB-কে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভক্ত করার নানা পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে AB-এর উপর একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে যার বাহু দুটির অনুপাত হবে $\sqrt{2} : 1$. এই ত্রিভুজের শীর্ষ কোণের সমদ্বিখণ্ডক রেখা AB-কে বাহুদ্বয়ের অনুপাতে বিভক্ত করে অর্থাৎ $\sqrt{2} : 1$ অনুপাতে বিভক্ত করে।

আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি (Inductive and Deductive Method) :

বিশেষ বিশেষ সাধারণ দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সূত্রে পৌঁছানোর পদ্ধতিকে বলে আরোহী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মূর্ত দৃষ্টান্ত থেকে বিমূর্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অবরোহী পদ্ধতি ইহার বিপরীত। এই পদ্ধতিতে সাধারণ সূত্রের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের সত্যতা প্রমাণ করা যায়; বিমূর্ত সিদ্ধান্ত থেকে মূর্ত তথ্যে উপনীত হওয়া যায়।

আরোহী পদ্ধতির যুক্তি এইরূপ—এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে, যে সমস্ত সংখ্যার অঙ্ক সংখ্যাগুলির যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য, তারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 3 দ্বারা বিভাজ্য হয়েছে। আরোহী পদ্ধতিতে অনুমান করা যেতে পারে যে, এইরূপ সকল সংখ্যার ক্ষেত্রেই ইহা প্রযুক্ত হবে। অবরোহী পদ্ধতির যুক্তি এইরূপ :

বিপ্রতীপ কোণদ্বয় পরস্পর সমান।

$\angle A$ ও $\angle B$ বিপ্রতীপ কোণ

সুতরাং $\angle A = \angle B$.

আরোহী পদ্ধতিতে আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি সেগুলি অবশ্যম্ভাবী নয়। এই পদ্ধতিতে দুরতিক্রম্য বাস্তব অবস্থার পরিবর্তে প্রকল্পিত স্বীকার (hypothetical conditions) করে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। **অবরোহী পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয় সেগুলি গণিতশাস্ত্রসম্মত।**

গণিতের প্রাথমিক রূপ আরোহী। শ্রেণী কক্ষে প্রথমে আরোহী পদ্ধতিতে পাঠ দিতে হবে। গণিতের পরিণত রূপ অবরোহী।

আরোহী পদ্ধতিতে উপনীত সিদ্ধান্তকে চরম বলা যায় না। এর মধ্যে কিছুটা সম্ভাবনার প্রশ্ন থেকে যায়। পরীক্ষিত তথ্য যত বেশী হবে সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাবে। সেইজন্য গাণিতিক প্রমাণ হিসাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না। এই পদ্ধতি গাণিতিক সত্য আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। অবরোহী পদ্ধতি সম্পূর্ণ গণিতশাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু ইহার সত্যগুলি নিরূপিত হয় আরোহী পদ্ধতিতে। গণিতে আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে উপনীত সম্ভাবনাগুলির মধ্য থেকে যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করা হয়, অবরোহী স্থির সিদ্ধান্তগুলি তারই ফলস্বরূপ।

আরোহী পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু অবরোহী পদ্ধতি যুক্তি-সম্মত।

আরোহী পদ্ধতি দীর্ঘ ও ক্লান্তিজনক এবং অবরোহী পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত।

আবিষ্কারকের জন্য আরোহী পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীর জন্য অবরোহী পদ্ধতি।

আরোহী পদ্ধতিতে মানসিক ক্ষমতা উন্নত হয় কিন্তু অবরোহী পদ্ধতিতে স্মৃতির কাজ বেশী।

গণিতের বহু উপপাদ্য এবং সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। গণিত-শিক্ষণে আরোহী পদ্ধতিই ভালো। বহু বিশেষ দৃষ্টান্তের ভিতর থেকে শিক্ষার্থী সাধারণ সূত্রটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি সাধারণত পাটীগণিত ও বীজগণিতে ব্যবহার করা হয়। জ্যামিতি-শিক্ষণেও প্রথমে আরোহী পদ্ধতি ও পরে অবরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

উদাহরণ ১। *To find the rule for finding simple interest on a given sum at a given rate for a given time or to evolve the general rule*

$$\text{Simple Interest} = \frac{\text{Principal} \times \text{Rate} \times \text{Time}}{100}$$

$$\text{i.e. S. I.} = \frac{p.\,r.\,n.}{100}$$

আরোহী পদ্ধতি ঃ

মনে করি, শতকরা বার্ষিক 5 টাকা সুদে 100 টাকার এক বৎসরের সুদ নির্ণয় করতে হবে। সহজেই দেখা যেতে পারে

$$\text{S. I.} = \frac{100 \times 5 \times 1}{100} = \text{Rs. } 5.$$

আবার ধরা যাক, 300 টাকার শতকরা 6 টাকা বাৎসরিক হারে 4 বৎসরের সুদ কত হবে নির্ণয় করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও ঐকিক নিয়মের সাহায্যে দেখা যেতে পারে যে,

$$\text{S. I.} = \frac{300 \times 6 \times 4}{100} = \text{Rs. } 72$$

এইভাবে আরও উদাহরণ নিয়ে দেখা যেতে পারে প্রতি ক্ষেত্রেই ফলগুলি একটি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ এবং সেই নিয়মটি হচ্ছে

$$\text{S. I.} = \frac{p.\ r.\ n}{100}$$

অবরোহী পদ্ধতিতে উক্ত নিয়মটি অবলম্বন করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুদ নির্ণয় করতে পারি।

উদাহরণ ২। *To find the sum of n natural numbers.*

আরোহী প্রমাণ ঃ n-এর মান 1, 2, 3, 4 ও 5 যথাক্রমে ধরিয়া যোগফল কত হয় দেখা যাক। এই যোগফলগুলির সঙ্গে n-এর অনুপাতগুলিও আমরা বার করব। এইরূপে নিম্নলিখিত তালিকাটি পাওয়া গেল।

n-এর মান	শ্রেণী	যোগফল	যোগফল ও n-এর অনুপাত
1	1	1	$\frac{1}{1}$ বা $\frac{2}{2}$
2	1+2	3	$\frac{3}{2}$
3	1+2+3	6	$\frac{6}{3}$ বা 2 বা $\frac{4}{2}$
4	1+2+3+4	10	$\frac{10}{4}$ বা $\frac{5}{2}$
5	1+2+3+4+5	15	$\frac{15}{5}$ বা 3 বা $\frac{6}{2}$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, $n=1$ হলে, যোগফল ও n-এর অনুপাত $\frac{2}{2}$

$n=2$ „ „ „ $\frac{3}{2}$

$n=3$ „ „ „ $\frac{4}{2}$

$n=4$ „ „ „ $\frac{5}{2}$

$n=5$ „ „ „ $\frac{6}{2}$

সুতরাং পদ-সখ্যা n হলে যোগফল ও n-এর অনুপাত $\frac{n+1}{2}$ হওয়া সম্ভব।

অতএব প্রথম n-সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল $\frac{n(n+1)}{2}$ হওয়াই সম্ভব।

অবরোহী প্রমাণ। n-এর যে কোন মানের জন্য

$n^2-(n-1)^2=2n-1$ একটি অভেদ

n-এর মান 1, 2, 3, 4··· বসাইলে, নিম্নলিখিত অভেদগুলি পাওয়া যায়—

$$1^2-0^2=2.1-1$$
$$2^2-1^2=2.2-1$$
$$3^2-2^2=2.3-1$$
$$4^2-3^2=2.4-1$$
$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots$$
$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots$$
$$(n-1)^2-(n-2)^2=2(n-1)-1$$
$$n^2-(n-1)^2=2n-1$$

অভেদগুলি যোগ করিয়া পাই—

$$n^2=2(1+2+3+\cdots\cdots+n)-n,$$

$$\therefore\ 1+2+3\cdots\cdots n=\frac{n^2+n}{2}=\frac{n(n+1)}{2}$$ প্রমাণিত।

আরোহী পদ্ধতিটির প্রতি ধাপ নির্ভুল গণিতসম্মত এবং বোঝা যায়। কিন্তু প্রথমে $n^2-(n-1)^2=2n-1$ অভেদটি কেন নেওয়া হল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই পদ্ধতিটি সেইজন্য শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ঠিক উপযুক্ত নয়। আরোহী পদ্ধতিটি শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পক্ষে উপযুক্ত। ইহার প্রতিটি ধাপ ছাত্রেরা অনুসরণ করে। কিন্তু প্রাপ্ত যোগফলটি যে সম্পূর্ণ নিভুল তা জোর করে বলা যায় না। এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, যোগফলটি $\frac{n(n+1)}{2}$ হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এই প্রমাণটিকে গণিতশাস্ত্রসম্মত বলা যায় না, এই প্রমাণে যথেষ্ট অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। অনুমানটি নির্ভুল না হবার সামান্য মাত্র সম্ভাবনাকেও গণিতে উড়িয়ে দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু আরোহী পদ্ধতিটি ছাড়া অবরোহী পদ্ধতির প্রমাণটি আবিষ্কার করা খুব দুরূহ। বর্তমান উদাহরণে অবরোহী প্রমাণের প্রথম ধাপের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। $n^2-(n-1)^2=2n-1$ অভেদটি কেন গ্রহণ করা হল তা দুর্বোধ্য থেকে যায় ছাত্রদের কাছে। আরোহী পদ্ধতিই অবরোহী প্রমাণটি আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। বর্তমান উদাহরণ থেকেই আমরা দেখাব কিভাবে আরোহী পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সূত্র থেকে অবরোহী পদ্ধতিটি আবিষ্কার করা সম্ভব। আরোহী পদ্ধতিতে আমরা দেখেছি যে, $1+2+3+4\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রাপ্ত সূত্রটি নির্ভুল মনে করলে নিম্নলিখিত ধাপগুলি সত্য হবে;

$$n^2+n=2(1+2+3+\cdots+n).$$

বা $n^2=2(1+2+3+\cdots+n)-n.$

এখন n-এর স্থানে $(n-1)$ বসালে আমরা পাই,

$$(n-1)^2=2\{1+2+3+\cdots+(n-1)\}-(n-1).$$

$\therefore\ n^2-(n-1)^2=2n-1$, কিন্তু ইহা একটি অভেদ।

ইহাই অবরোহী প্রমাণের প্রথম ধাপ। পরবর্তী ধাপগুলি এই ধাপটিকে অনুসরণ করে। সুতরাং তাদের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গণিতে আরোহী পদ্ধতিই অবরোহী প্রমাণের জনক।

গাণিতিক আরোহ (**Mathematical Induction**) :

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, আরোহী পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সূত্র গণিতে নির্ভুল বলে ধরা যায় না। ঐ সূত্র আরও প্রমাণসাপেক্ষ। আরোহী পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সূত্রকে প্রমাণ করার জন্য গণিতে আরও কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় গাণিতিক আরোহ। কয়েকটি অথবা অনেকগুলি ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত সূত্রকে গণিতে সাধারণ সূত্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় না। গণিতের সিদ্ধান্ত একেবারে নির্ভুল। এখানে সম্ভাবনার কোন স্থান নেই। n-এর মান পর পর 1 থেকে 5 অথবা আরও কিছু বেশী সংখ্যা ধরে 1 থেকে n পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের যে সম্ভাবিত সূত্রটি পাওয়া গেল তা থেকে আমরা বলতে পারি না যে, 1 থেকে n পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল$=\frac{n(n+1)}{2}$. কিন্তু n-এর যে কোন একটি নির্দিষ্ট মানের জন্য সূত্রটি সত্য ধরে নিয়ে যদি আমরা দেখাতে পারি যে, n-এর অন্য যে কোন মানের জন্যই সূত্রটি সত্য, তা হলে গণিতে সূত্রটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই পদ্ধতিকেই **গাণিতিক আরোহ** বলে। সাধারণ আরোহী পদ্ধতিতে গাণিতিক আরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। তর্কশাস্ত্রে গৃহীত একটি আরোহের উদাহরণ নেওয়া যাক। উদাহরণটিতে বলা হয়েছে—'সূর্য এ পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে পূর্বদিকে উদিত হয়েছে'। সুতরাং, 'আগামীকাল সূর্য পূর্বদিকে উদিত হবে'। কিন্তু গণিতের কোন ছাত্রই প্রদত্ত শর্ত থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না। গণিতশাস্ত্র অনুযায়ী এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় বাধা আছে। গণিতে শুধু এইমাত্র বলা যেতে পারে যে, সিদ্ধান্তটি সম্ভাবনাপূর্ণ। সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত হতে হলে কয়েকটি প্রকল্পিত স্বীকারকে (*hypothetical conditions*) মেনে নিতে হয়। এই স্বীকারগুলি হচ্ছে—(১) সূর্য ও পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থান কাল পর্যন্ত বর্তমান থাকবে। (২) পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে আগামীকাল পর্যন্ত ঘুরতে থাকবে। গণিত বিপরীত সম্ভাবনাগুলিকে উড়িয়ে দিতে বা অস্বীকার করতে পারে না। গাণিতিক আরোহে প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রেই সূত্রটি প্রযোজ্য হবে। এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। এখন গাণিতিক আরোহ প্রয়োগ করে আমরা আলোচ্য উদাহরণের সূত্রটি প্রমাণ করব।

সাধারণ আরোহী পদ্ধতিতে দেখা গেছে যে, প্রথম n-সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি $\frac{n(n+1)}{2}$ হওয়াই সম্ভব। n-এর যে কোন বিশেষ মানে সূত্রটি সত্য ধরে নিয়ে যদি আমরা দেখাতে পারি যে, n-এর যে কোন মানেই সূত্রটি প্রযোজ্য তা হলে সূত্রটি প্রমাণিত হয়।

মনে করা যাক, যখন, $n=m$ (n-এর একটি বিশেষ মান) তখন সূত্রটি সত্য অর্থাৎ

$$1+2+3+\cdots+m=\frac{m(m+1)}{2}$$

$$\therefore\quad 1+2+3+\cdots+m+(m+1)=\frac{m(m+1)}{2}+(m+1)$$

$$=(m+1)\left(\frac{m}{2}+1\right)$$

$$=\frac{(m+1)(m+2)}{2}$$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, m-সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সূত্রটি সত্য হলে, $(m+1)$-সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রেও সূত্রটি সত্য হবে। কিন্তু n-এর মান 1, 2, 3, 4 বা 5 ধরলে সূত্রটি সত্য বলে পরীক্ষিত। সুতরাং n-এর মান $5+1=6$ ধরলেও সূত্রটি সত্য হবে। অনুরূপে n-এর 6 মানের দ্বারা সূত্রটি সিদ্ধ হয় বলে n-এর 7 মানেও সূত্রটি সিদ্ধ হবে। এইভাবে দেখানো যেতে পারে যে, n-এর যে কোন মানেই সূত্রটি সত্য। সূত্র-প্রমাণের উপরি-উক্ত **পদ্ধতিকে গাণিতিক আরোহী** পদ্ধতি বলা হয়।

সক্রেটিসের পদ্ধতি (Socratic Method) :

এই পদ্ধতিতে সরল প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্রকে অভীষ্ট সিদ্ধান্তে পরিচালিত করেন। প্রশ্নগুলি এমন সহজ এবং সরল হয় যে ছাত্র সেগুলির ঠিক মত উত্তর অনায়াসেই দিতে পারে এবং প্রশ্নগুলি এমন পর পর উপস্থাপন করা হয় যে, সেগুলির উত্তর দিতে দিতেই ছাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কোন ভুল ধারণাকে নস্যাৎ করার জন্য সক্রেটিস এই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। বর্তমানে অবশ্য ঐরূপ ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয় না। এখন ছাত্রকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সৃজনাত্মক উদ্দেশ্যে শিক্ষক এই পদ্ধতির ব্যবহার করেন। পদ্ধতিটি মাঝে মাঝে বেশ ভালো ফল দেয়। তবে ভুল ধারণার মূলোৎপাটন করতে এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী। ছাত্রদের কোন ভুল ধারণা থাকলে, তাকে অপনোদন করতে এই পদ্ধতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, ছাত্রেরা তাদের ভুল ধারণা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হয়। তবুও পদ্ধতিটি সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত। ছাত্রেরা এরূপ ধ্বংসাত্মক পদ্ধতিতে সকল সময় সায় দিতে উৎসাহিত বোধ করে না। পদ্ধতিটির প্রয়োগ যত কম হয় ততই ভালো।

আবিষ্কারকের পদ্ধতি (Heuristic Method) :

Heuristic শব্দটির '*Heurisco*' (অর্থাৎ *Eureka* বা আমি আবিষ্কার করি) এই গ্রীক শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আবিষ্কারকের পদ্ধতির জনক *H. E. Armstrong*।

তিনি অবশ্য বিজ্ঞান-শিক্ষণে এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেন। পরে দেখা যায়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি খুব কার্যকরী নয়। অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনভাবে আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করার মত বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার নিতান্ত অভাব। অপরদিকে দেখা গেল যে, গণিত-শিক্ষণে এই পদ্ধতি খুব উপযুক্ত এবং ফলদায়ক।

আবিষ্কারক পদ্ধতির মূল কথাটি হল—শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী হবে আবিষ্কারকের। সে শ্রেণীকক্ষে শ্রোতা হয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে জ্ঞান গ্রহণ করবে না। শিক্ষায় সে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। গণিতে তার শিক্ষণীয় অংশটুকু তাকে পুনরাবিষ্কার করে নিতে হবে। যে সমস্ত তথ্য পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির পুনরায় আবিষ্কার করতে গেলে শিক্ষার্থীর কালক্ষেপ অবশ্যই হবে—কিন্তু এতে তার জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করবে। শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়টি শ্রেণীকক্ষে এমনভাবে অবতারণা করবেন, সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যে, সেগুলি শিখতে বা সমস্যাগুলির সমাধান করতে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত আবিষ্কারকের পথ অনুসরণ করতে হয়। শিক্ষণীয় অংশটুকু বা উপস্থাপিত সমস্যাগুলি যেন শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়সের উপযুক্ত হয় এবং তারা যাতে ধাপে ধাপে সমস্ত বিষয়টির জ্ঞান লাভ করে—এদিকে শিক্ষককে অবশ্য দৃষ্টি দিতে হবে। **এই পদ্ধতি জ্যামিতি-শিক্ষণে সার্থক হয়েছে। পাটীগণিত এবং বীজগণিতেও ইহার প্রয়োগে সমধিক ফল পাওয়া গেছে।**

আবিষ্কারকের পদ্ধতিতে শিক্ষণ দেওয়ার অর্থ অবশ্য এরূপ নয় যে, শিক্ষণীয় অংশটুকু কেবলমাত্র সমস্যার আকারে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করলেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং ছাত্রেরা আবিষ্কারকের মত স্বাধীনভাবে সমস্যাটির সমাধান করবে। শিক্ষক শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত উপস্থিত থাকবেন এবং ছাত্রের কোথাও কোন অসুবিধা হলে ও তাঁর সাহায্য চাইলে তিনি বলবেন 'নিজে চিন্তা কর, মাথা খাটাও'—এমন নয়। শিক্ষার্থীকে প্রকৃত আবিষ্কারকের ভূমিকা নিতে হবে—এ কথা ঠিক। কিন্তু এটাও ভেবে দেখতে হবে যে, বয়স্ক গবেষকের মত মানসিক শিক্ষা ও জ্ঞান তার নেই। তার অভিজ্ঞতা সীমিত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অসংগঠিত অথবা ত্রুটিপূর্ণভাবে সংগঠিত। শিক্ষার্থী তার সহজ, সরল গবেষণার কাজে যাতে প্রকৃতপক্ষে অগ্রসর হয় এবং উৎসাহিত বোধ করে সেদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হবে। তার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্যও দেবেন তিনি। সামান্যমাত্র ইঙ্গিত, অল্পমাত্র সাহায্য পেলে শিক্ষার্থী অনেক কিছুই নিজে আবিষ্কার করতে পারবে। তাকে এই আবিষ্কারের আনন্দ থেকে শিক্ষক নিশ্চয়ই বঞ্চিত করবেন না।

আবিষ্কারকের পদ্ধতিতে শেখান মানে 'কিছুই না শেখান' নয়। শিক্ষার্থী কোন সমস্যার সমাধান করতে অপারগ হলে বা সমাধানের পক্ষে কোন বিশেষ স্থানে এসে আর অগ্রসর হতে না পারলে, শিক্ষক নিশ্চয়ই তাকে সমগ্র সমাধানটি বলে দেবেন না। কিন্তু অবস্থা অনুযায়ী প্রশ্ন করে, আভাস দিয়ে বা একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া করে দিয়ে শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন। **তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হবে পথ-নির্দেশকের; যদিও তিনি সম্পূর্ণভাবে পথনির্দেশ করবেন না, শুধুমাত্র**

সঠিক পথে অগ্রসর হবার ইঙ্গিত দেবেন, কখনও দু' একটি কথা বলে, কখনও বা মৃদু হাস্য দিয়ে। বিপথে চালিত হলে, তিনি তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করবেন এবং সামান্যতম যোগ্যতা দেখালে প্রশংসা করবেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী ত্রিভুজ কাকে বলে জানে। জানে দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হওয়ার শর্তগুলি। তাকে বলা হল স্বাধীনভাবে প্রমাণ করতে—একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের বিপরীত কোণদ্বয় সমান হবে। এই উপপাদ্যটি সে নিজে থেকে কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না, যদি না উপযুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যান, যেখান থেকে সে দেখতে পাবে বা আবিষ্কার করবে কি ভাবে দুটি সর্বসম ত্রিভুজ অঙ্কন করা যায় যাদের দুটি অনুরূপ কোণ হবে প্রদত্ত ত্রিভুজের সমানসম্বন্ধ প্রমাণিতব্য কোণ দুটি। (শিক্ষকের কাজ হবে প্রকৃত আবিষ্কারের পথে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা)

শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গী যদি গঠন করিয়ে দেওয়া যায়, তা হলেই গণিত-শিক্ষার মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে। তাকে যদি যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতে শেখাতে হয় তা হলে তাকে চিন্তা করতে দিতে হবে—অপরের চিন্তার ফল তার কাছে পরিবেশন করলে চলবে না। আবিষ্কারকের পদ্ধতি বক্তৃতা পদ্ধতির বিপরীত।) এটি তথ্যমূলক পদ্ধতি নয়। ইহা গঠনমূলক পদ্ধতি। প্রথমে এই পদ্ধতিতে প্রচুর সময়ক্ষেপ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে ফল ভালোই হয়।

শিক্ষার্থী যাতে সঠিক শিক্ষালাভ করে, তার পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বাড়ে, সে চিন্তাশীল ও দক্ষ হয়, অপরের সাহায্য ব্যতীত নিজেকে শিক্ষিত করতে পারে এবং অনুসন্ধান করা ও গবেষণা করার অভ্যাস গঠন করতে পারে—এগুলি আবিষ্কারক পদ্ধতির লক্ষ্য। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীন মনোভাবাপন্ন হয় এবং যুক্তি করার ক্ষমতা অর্জন করে।

আবিষ্কারকের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে।

১। শিক্ষক নিজের ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আবিষ্কারের মনোভাব জাগ্রত রাখবেন।

২। আবিষ্কারকের পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কিছুই বলে দেবেন না। কিন্তু তাকে সঠিক সমাধান আবিষ্কার করতে সাহায্য করবেন প্রশ্নের মাধ্যমে। প্রশ্নগুলি খুব সাবধানতার সঙ্গে করবেন। যেন প্রশ্নের উত্তরটি প্রশ্নের মধ্যেই নির্দিষ্ট না হয়। প্রশ্ন থেকে শিক্ষার্থীকে উত্তরটি আবিষ্কার করে নিতে হবে। প্রথম দিকে শিক্ষককে বেশী সাহায্য করতে হতে পারে। কারণ তা না করলে শিক্ষার্থী নিরুৎসাহ হয়ে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে পারে। আবার খুব বেশী সাহায্য করলে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকশিত হবে না এবং সে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

৩। শিশুর বোধগম্য করে সমগ্র পাঠক্রমটি ছোট ছোট সরল ভাগে বিভক্ত করতে হবে। শিশু—শিশুই। বয়স্ক লোকের ধ্যানধারণা তার নেই।

৪। শিক্ষার্থীকে বই নকল করা বা বইয়ের সাহায্য নেওয়া থেকে বিরত করতে হবে।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে শিক্ষকেরও যথেষ্ট প্রস্তুতি দরকার।

আবিষ্কারকের ভুল পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। ভুল পদ্ধতির আকার (form) ঠিকই থাকে, কিন্তু আবিষ্কারক-পদ্ধতির মূল নীতি এতে বিসর্জিত হয়।

আবিষ্কারকের ভুল পদ্ধতির উদাহরণ ঃ

সমস্যা ঃ *A man purchases 10 bags of rice at the rate of Rs. 25 each. Each bag contains 40 Kg. of rice. His transportation and other costs amount to Rs. 200. If he sells the rice at Re. 1.50 per Kg., what is his gain per cent. ?*

ভুল পদ্ধতি ঃ

শিক্ষক। এক বস্তা চালের মূল্য কত ?
ছাত্র। 25 টাকা।
শি। মোট কত বস্তা চাল কেনা হয়েছে ?
ছা। 10 বস্তা।
শি। 10 বস্তার মূল্য কত ?
ছা। 10×25 বা 250 টাকা।
শি। অন্যান্য খরচ কত ?
ছা। 200 টাকা।
শি। তা'হলে মোট খরচ কত ?
ছা। $250+200=450$ টাকা।
শি। এক বস্তাতে কত চাল বিক্রয় করা হয়েছে ?
ছা। 40 কিলোগ্রাম।
শি। কত বস্তা চাল বিক্রয় করা হয়েছে ?
ছা। 10 বস্তা।
শি। 10 বস্তায় কত চাল আছে ?
ছা। 10×40 বা 400 কিলোগ্রাম।
শি। 1 কিলোগ্রাম চালের বিক্রয় মূল্য কত ?
ছা। 1 টা. 50 প.।
শি। 400 কিলোগ্রাম চালের বিক্রয় মূল্য কত ?
ছা। $1{\cdot}50 \times 400=600$ টাকা।
শি। মোট খরচ কত ছিল ?
ছা। 450 টাকা।
শি। তা'হলে মোট লাভ কত হল ?

ছা। 600 – 450 = 150 টাকা।

শি। 450 টাকাতে যদি 150 টাকা লাভ হয়, তবে 100 টাকাতে লাভ কত হয় ?

ছা। $\frac{150}{450} \times 100$ বা $33\frac{1}{3}$ টাকা।

শি। তা'হলে শতকরা লাভ কত হল ?

ছা। $33\frac{1}{3}\%$।

এখানে শিক্ষক প্রশ্নগুলি এমনভাবে করেছেন যে উত্তরের জন্য ছাত্রকে বিন্দুমাত্র ভাবতে হয়নি, কিছুই নিজে থেকে আবিষ্কার করতে হয়নি। প্রশ্নগুলিই তাকে নির্দিষ্ট উত্তরটি জুগিয়ে দিয়েছে। এ জাতীয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা আর ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কটি কষে দেওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আবিষ্কারক-পদ্ধতিতে প্রশ্নের সংখ্যা খুব বেশী হবে না। সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান ছাত্রকেই আবিষ্কার করতে হবে। শিক্ষকের সাহায্য হবে সেইটুকুই, যেটুকু না করলে ছাত্র বিপথে চালিত হতে পারে। এই সাহায্য শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে করতে পারেন—কিন্তু প্রশ্ন এমন হবে যেন তা থেকেই ছাত্র কোন রকম চিন্তাশক্তির প্রয়োগ না করে উত্তরটি পেয়ে না যায়। প্রশ্নটি শুধুমাত্র সমস্যা সমাধানের একটা নিশানা বা ইঙ্গিত বহন করবে—ছাত্রকে শুধুমাত্র পথনির্দেশ করবে। যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করে সমস্যার সমাধান ছাত্রকেই আবিষ্কার করতে হবে।

উল্লিখিত সমস্যাটির সমাধান আবিষ্কার করতে ছাত্রকে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করা যেতে পারে।

শি। এই প্রশ্নটিতে কি চাওয়া হয়েছে ?

ছা। লাভের শতকরা হার বের করতে হবে।

শি। লাভের শতকরা হার কিভাবে নির্ণয় করতে হয় ?

ছা। লাভটিকে সমগ্র খরচের শতকরা হারে প্রকাশ করতে হয়।

শি। প্রদত্ত তথ্যগুলি পরীক্ষা করে দেখ সমগ্র খরচ ও লাভ বের করতে পার কিনা।

পদ্ধতিটির সুবিধা ও অসুবিধাগুলির বিষয় এখন আলোচিত হবে।

সুবিধা ঃ—

১। গণিত-শিক্ষায় ছাত্র নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকে না। এখানে তার ভূমিকা সক্রিয় আবিষ্কারকের। এই পদ্ধতি গণিত-শিক্ষায় ছাত্রের আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

২। এখানে ছাত্র শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চয় করে না। সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে। এই পদ্ধতি ছাত্রের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করতে সাহায্য করে।

৩। ছাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ ও স্থায়ী হয়। কারণ সে যা কিছু শিখে তার অর্থ উপলব্ধি করে।

৪। অন্য যে কোন পদ্ধতি অপেক্ষা এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ বেশী কার্যকর ও ফলপ্রদ

হয়। কারণ ছাত্রের শিক্ষায় আগ্রহ ও ইচ্ছা এই পদ্ধতিতেই সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়।

৫। 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষার' সমস্ত সুবিধাগুলিই এই পদ্ধতি প্রদান করে।

৬। এই পদ্ধতিতে তত্ত্ব ও তথ্য সহজেই মনে থাকে। কারণ ছাত্র নিজেই এগুলি আবিষ্কার করে।

৭। ছাত্র এই পদ্ধতিতে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে।

৮। শিক্ষক পাঠ ও শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন।

৯। গৃহকাজের বিশেষ দরকার হয় না।

অসুবিধা ঃ—

১। প্রথমদিকে এই পদ্ধতিতে অগ্রগতি খুব মন্থর হয়।

২। অনেক তথ্য আছে যেগুলি ছাত্র নিজে আবিষ্কার করতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকর নয়।

৩। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় হয়।

৪। শিক্ষকের পক্ষেও এই পদ্ধতিটি অসুবিধাজনক। কারণ তাঁকে সকল সময় আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে হয় এবং চিন্তা করতে হয় আবিষ্কারের পথে।

৫। ছাত্র বা শিক্ষক কারো পক্ষেই এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক অনুসরণ করা চলে না।

৬। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া বেশ কষ্টকর। শ্রেণীতে সকল ছাত্রের বুদ্ধি সমান নয়। পূর্বজ্ঞানও সমান নয়। শ্রেণীতে চল্লিশের অধিক ছাত্র থাকলে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টি না দিলে এই পদ্ধতির কোন সার্থকতা নেই। যে ছাত্রের বেশী সাহায্যের প্রয়োজন, তাকে কম সাহায্য দিলে সে নিরুৎসাহ হবে। আর যার সাহায্যের কম প্রয়োজন, তাকে বেশী সাহায্য দিলে তার কোন উপকার হয় না।

৭। পদ্ধতিটি সকল শিক্ষক ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না। অনেকে ছাত্রদের কাছে খুব বেশী সক্রিয়তা প্রত্যাশা করেন। ফলে তাঁরা স্বল্প নির্দেশ দিয়ে সফল হন না। আবার অনেকে তাদের কাছে মোটেই কিছু আশা করেন না। তাঁরা এমন সহজ প্রশ্ন করেন, যার উত্তরের জন্য ছাত্রদের কোনরূপ চিন্তা করার দরকার হয় না। গণিত-শিক্ষকের পক্ষে সঠিক আবিষ্কারমূলক প্রশ্ন করার সার্থক ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আবিষ্কারক-পদ্ধতির উদাহরণ :

1. Find the fraction which is such that when 3 is added to the numerator, the result is equal to unity and when 5 is deducted from the denominator, the result is 2.

শি। একটি অজানা ভগ্নাংশ কিভাবে লেখা যেতে পারে ?

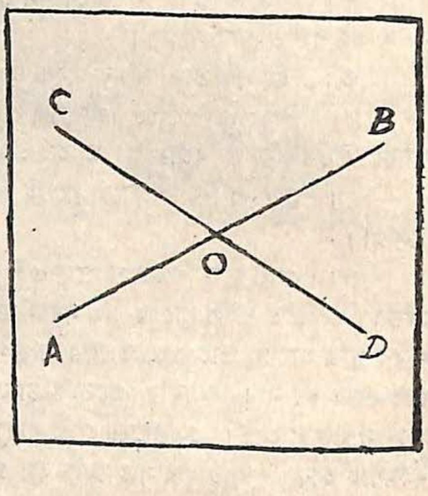
ছা। লবকে x এবং হরকে y ধরলে ভগ্নাংশটি $\frac{x}{y}$ হবে।

শি। x ও y—দুটি অজানা রাশির মান কিভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে?

ছা। x ও y সম্বলিত দুটি সহ-সমীকরণ পাওয়া গেলে, তাদের সমাধান করে x ও y-এর মান নির্ণয় করা যায়।

শি। প্রদত্ত তথ্য থেকে x ও y সম্বলিত দুটি সহ-সমীকরণ তৈরী করা যায় কিনা দেখ।

2. Two straight lines AB and CD intersect each other at O. Find the relation between the vertically opposite angles AOC and BOD.



শি। ছবিটি আঁক এবং AOC ও BOD কোণ দুটি মেপে দেখ উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় কিনা।

ছা। (মাপ করিয়া) কোণ দুটি সমান।

শি। আরও কয়েকটি ছবি আঁক এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই AOC ও BOD কোণ দুটি সমান হয় কিনা দেখ।

ছা। সব কটি ক্ষেত্রেই সমান।

শি। এবার যুক্তিসম্মত প্রমাণ দাও। AOC, BOD কোণ দুটি সমান বলে প্রমাণিত হবে যদি এমন কোন সাধারণ কোণ পাওয়া যায় যেটি কোণ দুটির সঙ্গে পৃথক পৃথক করে যোগ করলে যোগফল সমান হয়। এরূপ কোন কোণ পাওয়া যায় কিনা দেখ।

ছা। AOD অথবা COB কোণকে AOC এবং BOD কোণের সঙ্গে পৃথক পৃথক করে যোগ করলে উভয় ক্ষেত্রেই যোগফল দু সমকোণ হয়।

শি। এবার প্রমাণটি লিখে দাও।

বাস্তবক্ষেত্রে আবিষ্কারক-পদ্ধতি কোন পৃথক পদ্ধতি নয়। শিক্ষার্থীকে চিন্তাশীল আবিষ্কারকের ভূমিকা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য যে কোন পদ্ধতিই আবিষ্কারক-পদ্ধতিরূপে গ্রহণযোগ্য।

বক্তৃতা-পদ্ধতি :

বক্তৃতা-পদ্ধতি আবিষ্কারক-পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তু পরিবেশন করেন। এই পদ্ধতিতে পাঠক্রম অল্প

সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়। শিক্ষকই এখানে প্রধান ভূমিকা এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ; ছাত্রেরা নীরব, নিষ্ক্রিয় শ্রোতা মাত্র। শিক্ষক ছাত্রদের কোন প্রশ্ন করেন না। তিনি কেবলমাত্র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বলে যান। ছাত্রেরা ঠিক পাঠ-গ্রহণ করছে কিনা তা জানার জন্য তাঁর বিশেষ কোন আগ্রহ থাকে না। বক্তৃতা-পদ্ধতি গণিত-শিক্ষণের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। তা ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষা দেওয়া কাম্যও নয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কোন নতুন বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে সেটি আয়ত্ত করতে পারে না।

পদ্ধতিটির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি এখন আলোচনা করা যাক।

সুবিধা :—

১। পদ্ধতিটি সংক্ষিপ্ত, সহজ ও চিত্তাকর্ষক।

২। কম সময়ে যথেষ্ট বিষয়বস্তু পরিবেশন করা যায়। বয়স্ক ছাত্ররা এই পদ্ধতিতে কম পরিশ্রমে যথেষ্ট উপকৃত হয়।

৩। শ্রেণীতে ছাত্রের সংখ্যা বেশী হলে, ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রয়োজনমত ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করলে এই পদ্ধতিতে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

৪। পদ্ধতিটি শিক্ষকের পক্ষে বেশ সহজ। তাঁর বিশেষ রকমের কোন পাঠ-টীকা প্রস্তুত করার বা অন্য কোন প্রস্তুতির দরকার হয় না। তিনি শুধু পাঠ্য-পুস্তক অনুসরণ করেন।

৫। এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের প্রশ্ন করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং শিক্ষকের যুক্তিসম্মত ধারাবাহিক বক্তৃতায় ছেদ পড়ে না।

৬। এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের বিচার বা যুক্তি-শক্তির কোন ব্যবহার করতে হয় না। শিক্ষক নিজে থেকেই সব কিছু ব্যাখ্যা করেন এবং বুঝিয়ে দেন। ছাত্রেরা তাঁর কাছ থেকে একেবারে তৈরী জিনিসটি পায়। তাদের উপর কোন চাপ পড়ে না।

৭। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের মধ্যেই একটা আত্মতুষ্টির ভাব থাকে। শিক্ষক মনে করেন যে, তিনি ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছেন এবং ছাত্রেরা ভাবে যে তারা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে।

অসুবিধা :—

১। গণিত-শিক্ষণে পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। গণিত-শিক্ষায় তথ্য সংগ্রহের স্থান বিশেষ নেই।

২। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যুক্তিসম্মত চিন্তা গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং তাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়।

৩। এই পদ্ধতিতে এত দ্রুত বিষয়বস্তু অগ্রসর হয় যে তার সামান্য অংশই ছাত্রেরা আয়ত্ত করতে পারে।

৪। গণিতের ভাবধারা যুক্তিসম্মত ও সংবদ্ধ। বক্তৃতা-পদ্ধতিতে গণিতকে ঠিক চিত্তাকর্ষক করে বোঝানো সম্ভব নয়। ফলে ছাত্রদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

৫। গণিত ধারাবাহিক বিষয়। কোন অংশ ঠিক মত বুঝতে না পারলে বক্তৃতার বাকী অংশ ছাত্রদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায়।

৬। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া যায় না। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কোন সংযোগ থাকে না। ফলে ছাত্রেরা বক্তৃতা ঠিক বুঝতে পারছে কিনা শিক্ষক তা জানতে পারেন না।

৭। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলক দিকটি সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়।

৮। যথাযথ প্রস্তুতি ও চিন্তাশক্তির সম্পূর্ণতার অভাবে এবং নানাবিধ মনোবিজ্ঞান-সংক্রান্ত কারণে এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের বিশেষ লাভ হয় না।

৯। এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, যুক্তি ও বিচার করার ক্ষমতা এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে না।

১০। যে কোন শিক্ষণ-পদ্ধতিতে ব্ল্যাকবোর্ডের কাজের গুরুত্ব খুব বেশী। এই পদ্ধতিতে তার নিতান্ত অভাব।

১১। এই পদ্ধতিতে গৃহকাজের চাপ অত্যন্ত বেশী।

আবিষ্কারক-পদ্ধতি ও বক্তৃতা-পদ্ধতির তুলনা

আবিষ্কারক-পদ্ধতি	বক্তৃতা-পদ্ধতি
১। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ছাত্রদের বাস্তব উপলব্ধি হয়।	১। শিক্ষক যা পড়ান, ছাত্রেরা তা ঠিক বোঝে কিনা সন্দেহ।
২। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে।	২। ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে বলে তাদের স্বাধীন চিন্তার কোন অবকাশ থাকে না।
৩। শিক্ষায় ছাত্রদের আগ্রহ ও ইচ্ছা প্রবল হয়।	৩। ছাত্রদের বিশেষ আগ্রহ থাকে না এবং তারা বিরক্তি বোধ করে।
৪। ছাত্রেরা বিষয়বস্তু ঠিক মত বুঝতে পারে বলে সহজে ভুলে না। ভুললেও পুনরায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।	৪। ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা থাকে বলে বিষয়বস্তু সহজে ভুলে যায় এবং একবার ভুলে গেলে তা আর সহজে আবিষ্কার করতে পারে না।
৫। এই পদ্ধতি অনুসরণ করা শিক্ষকের পক্ষে কঠিন হয়। তাঁকে বিশেষভাবে পাঠ-প্রস্তুতি করতে হয়। এই কারণে সকল শিক্ষক এই পদ্ধতিতে সাফল্য লাভ করেন না।	৫। শিক্ষকের কাজ খুব সহজ। তাঁকে বিশেষভাবে পাঠ-প্রস্তুতি করতে হয় না।
৬। শিক্ষকের পাঠ্য-পুস্তক অনুসরণ করলে চলে না। তাঁকে প্রত্যেকটি ছাত্রের মানসিক বয়স ও পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী সমাধানের নির্দেশ দিতে হয়।	৬। শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে পাঠ্য-পুস্তক অনুসরণ করেন। তাঁকে ব্যক্তি-গত মনোযোগ দিতে হয় না।

আবিষ্কারক-পদ্ধতি	বক্তৃতা-পদ্ধতি
৭। অল্প বয়সের ছাত্ররা যুক্তিসম্মত চিন্তা করতে পারে না বলে এই পদ্ধতি তাদের শিক্ষণের উপযুক্ত নয়।	৭। ছাত্রদের নিজেদের যুক্তি করতে হয় না বলে তাদের উপর কোন চাপও পড়ে না।
৮। ছাত্রদের আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় বলে শিক্ষায় সময় বেশী লাগে।	৮। শিক্ষকের বক্তৃতা ও বই-এর মাধ্যমে ছাত্র জ্ঞান আহরণ করে বলে সময় কম লাগে।

পরীক্ষাগার-পদ্ধতি (**Laboratory Method**) :

ছাত্রদের কার্যসম্পাদন ও আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করাই পরীক্ষাগার-পদ্ধতির বাস্তব উদ্দেশ্য। একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, 'মূর্ত বস্তু থেকে বিমূর্ত ধারণায়' উপনীত হওয়ার পদ্ধতির ইহা বিস্তৃত সংস্করণ। আবার বলা যেতে পারে, ইহা আবিষ্কারক-পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ। আরোহী পদ্ধতির পরীক্ষামূলক দিকটি ইহা রূপায়িত করে। এই পদ্ধতিতে গণিতের পরীক্ষাকার্য চালান হয়, ঠিক যেভাবে বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানের পরীক্ষাকার্য চালানো হয়। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার যেভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো হয়, গণিতের শ্রেণী কক্ষটিও সেইভাবে গাণিতিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো হয়। এইজন্য গণিতের শ্রেণী কক্ষকে পরীক্ষাগার বলা হয়। পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতিগুলি চিত্রলেখ সংক্রান্ত ও বিভিন্ন স্তরে বাস্তব পরীক্ষা চালানোর উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম। গণিতের পরীক্ষাগারে যে সকল যন্ত্রপাতি থাকা দরকার তার মধ্যে আছে জ্যামিতিক অঙ্কনের যন্ত্রপাতি, জরিপের কাজের যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন জ্যামিতিক মডেল, যেমন—গোলক, ঘনক, প্রিস্‌ম্ ও শঙ্কু, চোঙ্, পিরামিড ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও থাকবে কার্ড বোর্ড, ব্যালান্স, ওজন, লীভার, পুলী, টিউব, গণনাকারী যন্ত্র, রেফারেন্স বই প্রভৃতি।

গণিতের পরীক্ষাগারের একমাত্র কাজ হচ্ছে গাণিতিক তথ্য আবিষ্কারে ও তাদের প্রয়োগে ছাত্রদের উৎসাহ দান করা। পরীক্ষাগার-পদ্ধতি ছাত্রদের গাণিতিক তত্ত্বের প্রমাণ আবিষ্কারে ও প্রয়োগে আগ্রহান্বিত করে। গণিতের মূলসূত্রগুলি বুঝতে এই পদ্ধতি যথেষ্ট সাহায্য করে।

শিক্ষক গণিতের পরীক্ষাগারের পরিচালক। ছাত্রেরা ব্যক্তিগতভাবে বা ছোট ছোট দলে তাঁর অধীনে কাজ করে। পদার্থ বিদ্যার পরীক্ষাগার ও গণিতের পরীক্ষাগারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরীক্ষাগার-পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি এখন আলোচনা করা হচ্ছে।

সুবিধা :—

১। গাণিতিক তথ্য আবিষ্কারের ইহা একটি স্বাভাবিক পন্থা।

২। এই পদ্ধতিতে 'মূর্ত বস্তু থেকে বিমূর্ত ধারণায়' উপনীত হওয়া যায়। ইহার ভিত্তি মনোবিজ্ঞানসম্মত।

৩। পদ্ধতিটি বেশ চিত্তাকর্ষক, আনন্দদায়ক এবং শিশুদের পক্ষে উপযোগী।

৪। 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা'—এই নীতিটি ইহার মধ্যে প্রতিফলিত।

৫। দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ এই তিনটি ইন্দ্রিয়, পদ্ধতিটিতে একযোগে কাজ করার সুযোগ পায়। ফলে ছাত্রদের ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬। পদ্ধতিটির সাহায্যে ত্রি-মাত্রিক আকার সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা করা সম্ভব হয়।

৭। অর্জিত জ্ঞান স্থায়ী ও কার্যকরী হয়।

অসুবিধা ঃ—

১। গণিতের যাবতীয় তথ্য এই পদ্ধতিতে শেখা যায় না।

২। ৪০/৫০টি ছাত্রের শ্রেণীর পক্ষে পদ্ধতিটি উপযোগী নয়।

৩। শিক্ষক সঠিক পরিকল্পনা, তদারক এবং পরিচালনা না করলে পদ্ধতিটি যন্ত্রপাতি নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে খেলায় পর্যবসিত হবে।

৪। ছাত্রেরা ভালো বুঝতে পারে না, যুক্তিসম্মত প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম করে না—এই ভুল ধারণা—পদ্ধতিটির ভিত্তি।

৫। পদ্ধতিটিতে ছাত্রেরা গণিতের তথ্য আহরণ করে কিন্তু গণিতের যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হয় না।

৬। উন্নতির হার খুব কম। ইহা পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ।

৭। গণিতের পরীক্ষাগার-নির্মাণ বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। অনেক বিদ্যালয়ই অর্থাভাবে এরূপ পরীক্ষাগার তৈরী করতে পারে না।

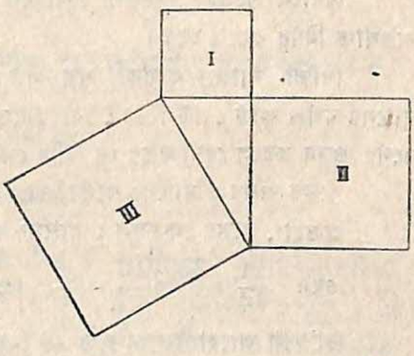
এখন পরীক্ষাগার-পদ্ধতির দু' একটি পরীক্ষার আলোচনা করব।

পরীক্ষা ১। To find the ratio between the circumference and the diameter of a circle.

7 সে. মি. ব্যাসের কার্ড বোর্ডের একটি বৃত্ত তৈরী করতে হবে। বৃত্তটিকে একটি সরল রেখায় গড়িয়ে পূর্ণ আবর্তন করাতে হবে। ইহার পর ঐ পথটির দৈর্ঘ্য মাপলে দেখা যাবে প্রায় 22 সে. মি. হয়েছে। বৃত্তের পরিধিকে বক্রপথে না মেপে এইভাবে সরলপথে মাপা অপেক্ষাকৃত সোজা। পরীক্ষাতে দেখা যাচ্ছে—পরিধি ঃ ব্যাস ঃঃ 22 ঃ 7 বা $3\frac{1}{7}$। বিভিন্ন আকারের বৃত্ত নিয়ে পরীক্ষাটি বার কয়েক চালালেই দেখা যাবে সকল ক্ষেত্রেই পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের মান প্রায় একই থাকছে। এখন আরোহী-পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি নিয়ম জানা গেল—পরিধি ব্যাসের প্রায়

$3\frac{1}{7}$ গুণ হবে। আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষার সাহায্যে দেখানো যাবে যে, এই অনুপাতটি প্রায় 3·14159 বা π।

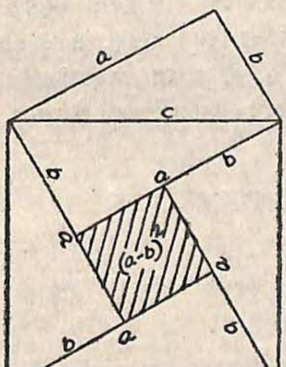
পরীক্ষা ২। To prove that in any right-angled triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. (Pythagorus Theorem).



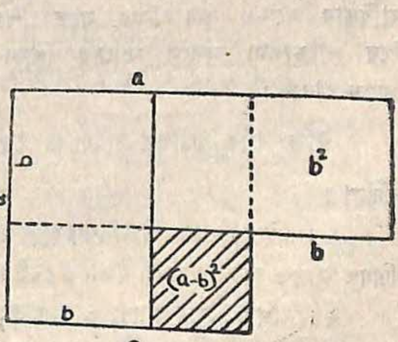
ক। পরীক্ষাগারে যে কোন সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহুর বর্গের সমান করে কার্ড বোর্ডের সাহায্যে তিনটি বর্গ তৈরী করতে হবে। বর্গগুলিকে I, II ও III চিহ্নিত করা হল। ছবিতে যেমন দেখানো আছে। এখন ব্যালেন্সের এক পাল্লায় I ও II এবং অপর পাল্লায় III কে রেখে ওজন করলে দেখা যাবে I+II এর ওজন III এর ওজনের সমান।

খ। ফিতা বা ফুট-রুলের সাহায্যে মেপে প্রত্যেকটি বর্গের ক্ষেত্রফল বাহির করতে হবে। এখন দেখা যাবে ক্ষেত্রফল (I+II)=ক্ষেত্রফল I'I.

গ। I ও II ছবির সাহায্যে দেখা যাবে—



I



II

$$\begin{aligned} c^2 &= 4\times\tfrac{1}{2}ab+(a-b)^2 \\ &= 2ab+a^2+b^2-2ab \\ &= a^2+b^2 \end{aligned}$$

পরীক্ষা ৩। To find the relation between the area of a circle and the square of its diameter.

এখানে বৃত্তের ক্ষেত্রফল দ্বিমাত্রিক বলে, বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে ব্যাসের বর্গের অনুপাত নির্ণয় করতে হবে।

বিভিন্ন ব্যাসের কয়েকটি বৃত্ত কার্ড বোর্ড দিয়ে তৈরী করতে হবে এবং প্রত্যেকটির ব্যাসের বর্গও কার্ড বোর্ড দিয়ে তৈরী করতে হবে। এখন প্রত্যেক বৃত্ত ও তার ব্যাসের বর্গের ওজন করলে দেখা যাবে যে প্রতি ক্ষেত্রেই—

বৃত্তের ওজন : ব্যাসের বর্গের ওজন :: 11 : 14. (প্রায়)।

সুতরাং, বৃত্তের ক্ষেত্রফল : ব্যাসের বর্গ :: 11 : 14 (প্রায়)।

এখন $\frac{11}{14}=\frac{22}{28}=\frac{22}{4.7}=\frac{\pi}{4}$ (প্রায়)

তা'হলে আরোহী-পদ্ধতিতে এই নিয়মটি পাওয়া গেল।

বৃত্তের ক্ষেত্রফল : ব্যাসের বর্গ :: π : 4.

ঐতিহাসিক-পদ্ধতি (Historical Method) :

ঐতিহাসিক-পদ্ধতির মূল সূত্রটি হল তথ্যের অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং সমন্বয়সাধন। কিন্তু গণিতে ঐতিহাসিক শিক্ষণ-পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি, যে গণিতের বিষয়গুলি যে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়েছিল—সেই ক্রমে উহাদের পড়ানো। মানব সমাজ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গণিতের বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কার করেছিল। গণিত একটি ক্রমোন্নত বিষয়। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে ইহার নিবিড় যোগ। হাজার হাজার বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে গণিতের বিমূর্ত ধারণা ও প্রতীকগুলির আবিষ্কার ঘটে। প্রবক্তাদের মতে শিক্ষার্থীদেরও ঐ সকল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পরিচালনা করলে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে—তারা বিষয়টি ঠিক মত হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

ঐতিহাসিক-পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি এখন আলোচিত হবে।

সুবিধা :—

১। ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক শিক্ষণ-পদ্ধতি। অন্যান্য পদ্ধতির কৃত্রিমতাজনিত অসুবিধাগুলি ইহাতে নেই।

২। শিশু বিমূর্ত ধারণা ও গণিতের প্রতীকগুলি সহজে আয়ত্ত করতে পারে না। মূর্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে সে ঐগুলি আয়ত্ত করে। মানব সমাজও মূর্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে সামান্যীকরণ ও বিমূর্ত ধারণা লাভ করেছে। শিশুর প্রকৃতি যে পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী, এই পদ্ধতির তার সঙ্গে খুব সামঞ্জস্য আছে।

৩। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা জীবনধর্মী, বাস্তব ও ফলপ্রদ হয়।

৪। পদ্ধতিটি গণিত-শিক্ষায় ছাত্রের আগ্রহ উদ্দীপিত করে।

অসুবিধা ঃ—

১। পদ্ধতিটি অনুসরণের উপযুক্ত পাঠক্রম রচনা করা দুরূহ।

২। ইহা সময়সাপেক্ষ শিক্ষণ-পদ্ধতি।

৩। অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় শেখাতে হবে। ছাত্রের অযথা সময় নষ্ট হবে এবং ইহাতে তার উপর চাপ সৃষ্টি হবে।

৪। নতুন বিষয় শিক্ষা দিতে অসুবিধা দেখা দেবে।

✓ একরোখা-পদ্ধতি (Dogmatic Method) :

পদ্ধতিটির প্রবক্তারা বলেন—গণিত নির্ভুল সিদ্ধান্তের বিজ্ঞান। গণিত-শিক্ষণের লক্ষ্য হবে চরম নির্ভুলতা এবং একান্ত নিয়ম-অনুসরণের শিক্ষা দেওয়া। এ ব্যাপারে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করা উচিত নয়। প্রতি পদক্ষেপে কঠোরভাবে নিয়মকে অনুসরণ করে নির্ভুল উত্তরে উপনীত হতে হবে। এমন কি ভাষাও নির্ভুল হওয়া চাই—বানানকেও শুদ্ধ রাখতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীর চিন্তা-রাজ্যেও বিশৃঙ্খলা ও অস্পষ্টতা দেখা দেবে। গণিত পরীক্ষায় ছাত্রদের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য এঁরা গণিত-শিক্ষণে নির্ভুলতা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ না করাকেই দায়ী করেন। নির্ভুলতা শিক্ষার জন্য আদর্শ মডেল মুখস্থ করার উপর তাঁরা জোর দেন। তাঁদের মতে সঠিক সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি অর্জনের জন্যও এই পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এইরূপ আদর্শ পাঠ না বুঝে মুখস্থ করে কিভাবে ছাত্রেরা গণিতের সমস্যা সঠিক অনুধাবন করে সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করবে তার কোন ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন গণিতের নিয়মগুলি কঠোরভাবে এবং নির্ভুলতার সঙ্গে অনুসরণ করার অভ্যাসের মধ্য দিয়ে কোন অজ্ঞাত উপায়ে এ ক্ষমতা জন্মায়।

এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে গণিতের নিয়ম ও সূত্রগুলি ছাত্রদের কণ্ঠস্থ করতে হবে। প্রয়োগের প্রশ্ন আসবে পরে। পদ্ধতিটি সংজ্ঞা-সর্বস্ব। সংজ্ঞা, সূত্র ও নিয়ম ঠিকমত ধারণা করতে না পারলেও অন্ধভাবে মুখস্থ করতে হবে। তারপর আদর্শ মডেল বিশুদ্ধতার সঙ্গে অনুসরণ করে তাদের প্রয়োগ করতে হবে। ছাত্রদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, সৃজনীশক্তি প্রভৃতির তাঁরা কোন মূল্য দেন না। যে সমস্ত ছাত্রের স্মৃতিশক্তি বেশী, তারাই এই পদ্ধতিতে বেশী যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক যে, শিক্ষক সরল সুদকষা ছাত্রদের শেখাবেন। শিক্ষক প্রথমে

$$\text{S. I.} = \frac{p \times r \times n}{100},$$ (যেখানে p= আসল, r= শতকরা সুদের হার, n= বৎসরের সংখ্যা এবং S. I.= সরল সুদ)

সূত্রটি ছাত্রদের মুখস্থ করাবেন। পরে ব্ল্যাকবোর্ডে একটি অঙ্কের আদর্শ উত্তর সম্পূর্ণরূপে লিখে দেবেন এবং ছাত্রদের সেটি টুকে নিতে বলবেন। আদর্শ মডেলটি যথাযথভাবে ছাত্রদের মুখস্থ করতে বলবেন। তারপর অনুশীলনের জন্য কয়েকটি অঙ্ক ছাত্রদের কষতে দেবেন। ছাত্রেরা আদর্শ মডেল অনুসারে যথাযথভাবে প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করে

অঙ্কগুলি কষবে। আদর্শ মডেল থেকে কোন রকম বিচ্যুতির প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। জ্যামিতির উপপাদ্য বা সম্পাদ্য এই পদ্ধতি অনুসারে অবিকল মুখস্থ করতে হয়। এমন কি কোন শব্দেরও পরিবর্তন করা চলে না। পূর্বে শুভঙ্করী যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হত, পদ্ধতিটি অনেকটা সেই রকম।

পদ্ধতিটির সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। এখন তার আলোচনা করব।

সুবিধা ঃ—

১। গণিত-শিক্ষায় সময় সংক্ষেপ হয় এবং ছাত্রদের শক্তির অপব্যয় হয় না। তাদের চিন্তাধারায়ও আবিলতা বা অস্পষ্টতা থাকে না।

২। ছাত্রদের তথ্যমূলক জ্ঞান সম্পূর্ণ ও খাঁটি হয়।

৩। সমস্যা সমাধানে ছাত্রদের দক্ষতা, নির্ভুলতা ও দ্রুততার শিক্ষা দেয়।

৪। এই পদ্ধতিতে ছাত্রেরা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত করে না।

৫। অল্প সময়ে পাঠক্রমের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়।

৬। ছাত্রের মানসিক বয়স নির্ণয় করে পদ্ধতিটি অনুসরণ করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

৭। আরোহী-পদ্ধতিতে সূত্র ও নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠিত করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়।

অসুবিধা ঃ—

১। এই পদ্ধতিতে গণিতের সংজ্ঞা, সূত্র ও নিয়মগুলি মাত্র জানা হয়—প্রকৃত শিক্ষা হয় না।

২। ছাত্রদের শিক্ষক-নির্দেশিত পথেই চলতে হয়। তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে না। শিক্ষকের দেওয়া চিন্তাধারাই তারা স্মরণ করে মাত্র।

৩। ছাত্রদের যান্ত্রিকভাবে পড়তে বা পড়া মুখস্থ করতে উৎসাহিত করা হয়। ফলে তাদের গণিত সম্বন্ধে ভুল ধারণা হয়।

৪। স্মৃতি-প্রক্রিয়ার ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন মানসিক ক্ষমতার অনুশীলন হয় না। সুতরাং কোন মানসিক ক্ষমতাই বিকাশ লাভ করে না।

৫। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর জন্য আদর্শ মডেল হিসাবে সাধারণত পাঠ্যপুস্তককেই গ্রহণ করা হয়। পাঠ্য-পুস্তকই ছাত্রদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে পড়ে।

৬। শিক্ষণ ছাত্রদের চিত্তাকর্ষক হয় না বলে গণিতে ছাত্রদের আগ্রহ জন্মায় না।

৭। নিয়ম বা সূত্র ভুলে গেলে সমস্যার সমাধান করা যায় না।

৮। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সম্ভব নয়।

৯। শিক্ষকের কাজ খুব কঠিন হয়। কারণ আগ্রহহীন ছাত্রদের পাঠ গ্রহণ করতে তাঁকে বাধ্য করতে হয়।

মনোবিজ্ঞানসম্মত-পদ্ধতি (Psychological Method) :

এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষণে ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নির্ভুলতা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা হবে ছাত্রের মানসিক বয়স অনুসারে। গণিতে তথ্যমূলক জ্ঞানের দিকটির উপর কেবলমাত্র দৃষ্টি দেওয়া ভুল। ছাত্রের মানসিক বয়সকে উপেক্ষা করা চলে না। তথ্য শেখাতে হবে। কিন্তু সেটি যেন ছাত্রের বোধগম্য হয়, তার মানসিক বয়সের উপযুক্ত হয়। মূল সূত্রটি না বুঝে, শুধুমাত্র সূত্র বা নিয়ম মুখস্থ করে নির্ভুল অঙ্ক কষতে পারলেও—এই শিক্ষা বাস্তবে ছাত্রদের কোন কাজে লাগে না। নির্ভুলতা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখলে নির্ভুলভাবে চিন্তা করা যায় না। পাঠক্রমকে ছাত্র অনুসরণ করবে না; ছাত্রকেই অনুসরণ করে পাঠক্রম সংগঠন করতে হবে। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও নির্ভুলতাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে দেখতে হবে শিক্ষা ছাত্রের মানসিক বয়সের উপযোগী কিনা।

পদ্ধতিটির সুবিধা-অসুবিধাগুলি এখন আলোচিত হবে।

সুবিধা :—

১। মানসিক স্তর অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয় বলে ছাত্র শিক্ষায় আগ্রহী হয়।

২। ছাত্রের জ্ঞান ভাসা ভাসা (superficial) হয় না, স্থায়ী হয়।

৩। ছাত্রের স্মৃতির উপর অযথা চাপ পড়ে না।

৪। শিক্ষক আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে শিক্ষা দিতে পারেন। কারণ তিনি যা শেখান ছাত্রেরা তা বুঝতে পারে। শ্রেণী কক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

অসুবিধা :—

১। ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

২। ছাত্রেরা সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা করতে শেখে না।

৩। অল্পসংখ্যক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ছাত্রদের সামান্যীকরণের প্রবণতা দেখা দেয়।

৪। নির্ভুলতা ও যথাযথ নিয়মের শিক্ষা এই পদ্ধতিতে হয় না!

নির্দেশমূলক-পদ্ধতি (Assignment Method) :

বক্তৃতা-পদ্ধতি ও আবিষ্কারক-পদ্ধতির সমন্বয়ে এই পদ্ধতির সৃষ্টি। উভয় পদ্ধতির সুবিধাগুলি পদ্ধতিটিতে কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়েছে। বক্তৃতা-পদ্ধতিতে ব্যক্তিবৈষম্য অনুযায়ী পাঠদান সম্ভব নয়। আবিষ্কারক-পদ্ধতিতে পাঠক্রমের যাবতীয় অংশ, বিশেষ করে তত্ত্বগত দিকটি, ছাত্রের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না। পদ্ধতিটিতে কিছু অংশ (যেমন তত্ত্বগত অংশ এবং যে সমস্ত অংশ ছাত্রদের কঠিন মনে হয়) শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা দেন আর বাকী অংশ শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা অনুসরণ করে স্বাধীনভাবে শিক্ষা করে। ব্যক্তিবৈষম্য ও স্বাধীনতার নীতি, নীরব কর্ম এবং

সহযোগিতার নীতির উপরই পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত। হিউরিস্টিক নীতির বাস্তব প্রয়োগই এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

শিক্ষক পাঠক্রমটি কাঠিন্য অনুসারে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নেন। এক একটি পাঠ্যাংশের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেন (এক সপ্তাহ বা এক মাস) এবং নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশের জন্য শিক্ষার্থীদের একটি নির্দেশনা-পত্র দেন। প্রত্যেক ছাত্রকেই নির্দেশনা মত কাজ করতে হয়। নির্দেশনায় যে বই-এর রেফারেন্স থাকে সেগুলি ছাত্রদের পাঠ করতে হয়। তা ছাড়া, লেখার কাজ কতটুকু, কত সময়ের মধ্যে কাজগুলি শেষ করতে হবে—এসবেরও নির্দেশ থাকে নির্দেশনায়। পদ্ধতিটিতে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীপঠন উভয়ই বজায় থাকে। নির্দিষ্ট পিরিয়ডগুলিতে ছাত্রেরা নির্দেশনা অনুসারে কাজে অগ্রসর হয়। প্রয়োজন মত তারা গৃহকাজ করেও নির্দিষ্ট সময়ে নির্দেশিত পাঠ্যাংশ সমাপ্ত করে। দরকার মত তারা শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করে এবং পরস্পরে আলোচনা করে।

এই পদ্ধতিতে নির্দেশনা-পত্রটির গুরুত্ব খুব বেশী। এটিকে ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের নির্দেশ বা আদেশ মনে করলে ভুল হবে। এটিকে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি-পত্র বলে গণ্য করা হয়। চুক্তি-পত্রে উভয়কেই সই করতে হয়। চুক্তি অনুযায়ী নির্দেশনার সমস্ত কাজ ছাত্রকে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে হয়। নির্দেশনায় অন্ততঃ চারটি অংশ থাকে। প্রথমতঃ, পাঠ্যাংশের সমগ্র কাজের খুঁটিনাটির উল্লেখ থাকে এবং কাজগুলি সমাধা করার সময়-সীমা দেওয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, ইহা ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও কাজের সুযোগ দেয়। এই অংশটির গুরুত্ব খুব বেশী। কিছু কিছু সংকেত (suggestion) অবশ্য দেওয়া হয়। কিন্তু সেগুলি যেন ছাত্রের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধাস্বরূপ না হয়ে পরিপূরক হয়। ছাত্রকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ও তার বুদ্ধি-বৃত্তি অনুশীলনের উপযোগী প্রশ্ন থাকে। তৃতীয়ত, কি ভাবে পড়াশুনা করতে হবে তার নির্দেশ থাকে এবং সামগ্রিকভাবে নির্দেশনাটি কি ভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার সংকেত দেওয়া হয়। চতুর্থত, পাঠ্য-পুস্তক অথবা স্কুল-লাইব্রেরীতে পাওয়া রেফারেন্স থাকে যেগুলি ছাত্রকে পড়তে হবে।

পদ্ধতিটিতে শিক্ষকের কাজ ও দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। তাঁকে নির্দেশনা-পত্রটি প্রস্তুত করতে প্রচুর পরিশ্রম ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। আবার একটিমাত্র নির্দেশনা-পত্র তৈরী করলেই চলে না। নির্দেশনার ব্যাপারে ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি অনুসরণ করতে হয়। সেইজন্য শ্রেণীর একই পাঠ্যাংশের জন্য ২।৩ রকম নির্দেশনা-পত্র দরকার, যাতে ছাত্রের মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী নির্দেশনা-পত্রটি সে পেতে পারে। নির্দেশনা-পত্র ছাত্রদের দেবার পর পাঠ্যাংশের অন্তর্গত সাধারণ সূত্র ও তত্ত্বের বিষয়টি শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতায় শ্রেণী কক্ষে আলোচনা করেন এবং সেগুলি সকলকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করেন। তারপর ছাত্রেরা নির্দেশনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করে। কোন কঠিন অংশে অনেকের অসুবিধা দেখা গেলে শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে সকলকে একত্রে বুঝিয়ে দেন। এছাড়া শিক্ষককে সকল সময়ে ছাত্রদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় যেন তারা পরস্পরে নকল না করে।

শুধু নির্দেশনা-পত্রের কোন মূল্যই নেই যদি না ছাত্রদের কাজ সংশোধন ও মূল্যায়ন করা হয়। সেইজন্য কোন ছাত্রের কাজ সমাপ্ত হলে শিক্ষক তার কাজ পরীক্ষা করে দেখেন। মৌখিক অংশটির জন্য মৌখিক প্রশ্ন করেন এবং লিখিত অংশের ভ্রম-সংশোধন করেন ও মূল্যায়ন করে নম্বর দেন। সংশোধিত ভুলগুলি ছাত্রেরা যাতে সংশোধন করে সেদিকে নজর দেন। শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রের কাজের রেকর্ড রাখেন। এই রেকর্ড দেখে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই ছাত্রের উন্নতির হার বুঝতে পারেন। ছাত্রের যোগ্যতা নির্ণয়ে এই রেকর্ড সত্যিকার সাহায্য করে। রেকর্ড ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্রের অগ্রগতির একটি চিত্র লেখ রাখতে হয়। এটি শিক্ষক ও ছাত্রকে ছাত্রের অগ্রগতির চিত্রটি এক নজরে বুঝতে সাহায্য করে।

পদ্ধতিটির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি এখন আলোচনা করা হবে।

সুবিধা :—

১। পদ্ধতিটি ছাত্রদের আত্মনির্ভরতা শেখায়। পদ্ধতিটিতে ছাত্রদের আত্ম-বিশ্বাস জন্মায়।

২। ছাত্রদের কাজে ও চিন্তায় স্বাধীনতার মনোভাব গঠিত হয়।

৩। যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্র পাঠে অগ্রসর হয়।

৪। শিক্ষায় ছাত্রদের আগ্রহ উদ্দীপিত হয়।

৫। 'কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা'র নীতিটি রূপায়িত হয় এই পদ্ধতিতে। ছাত্র শিক্ষায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

৬। বই পড়া ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করার অভ্যাস ছাত্রেরা গঠন করে।

৭। ছাত্রেরা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করতে শেখে।

৮। ছাত্রেরা তত্ত্বগত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে শেখে।

অসুবিধা :—

১। শিক্ষকের পক্ষে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা কঠিন হয়। নির্দেশনা-পত্র প্রস্তুত করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। প্রত্যেকটি ছাত্রের মৌখিক পরীক্ষা ও লিখিত কাজের সংশোধন ও রেকর্ড রাখার জন্য যথেষ্ট সময় দরকার। শ্রেণীতে ছাত্রের সংখ্যা বেশী হলে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২। এই পদ্ধতিতে পাঠ শেষ করতে বেশী সময় লাগে।

৩। একই নির্দেশনা-পত্র অনুসৃত হয় বলে ছাত্রেরা নকল করতে পারে।

৪। উত্তম পরীক্ষাগার ও পাঠাগার ব্যতীত এই পদ্ধতিটির সার্থকতা নেই। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ঐ দুইটিরই একান্ত অভাব।

৫। পদ্ধতিটি অনুসরণের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকেরও অভাব আছে।

৬। উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব আছে।

খ। প্রণালী (Mode) :

১। পরীক্ষা-প্রণালী (Examination Mode) :

শিক্ষক ছাত্রদের গৃহকাজ দেন ; সাধারণত পাঠ্য-পুস্তকের কোন অংশ তৈরী

করে আনা, দু'একটি সমস্যার সমাধান করা—এই জাতীয় গৃহকাজ। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক ছাত্রদের পরীক্ষা নেন। প্রণালীটি মুখস্থ করার কাজকে উৎসাহিত করে। ইহার স্বপক্ষে কিছুই বলা যায় না।

২। আবৃত্তি-প্রণালী (**Recitation Mode**) ঃ

ইহা পরীক্ষা-প্রণালীরই একটি পরিবর্তিত রূপ। এই প্রণালীতে শ্রেণী-কক্ষের কাজকে বলা হয় 'আবৃত্তি'। কারণ, গৃহকাজ হিসাবে ছাত্রদের যা শিখে আসতে বলা হয়, সেটি তারা শ্রেণী কক্ষে আবৃত্তি করে। এই প্রণালীতে বিষয়বস্তু ভালো করে বুঝতে শিক্ষক ছাত্রদের সাহায্য করেন।

৩। বক্তৃতা-প্রণালী (**Lecture Mode**) :

এই প্রণালীতে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। ছাত্রেরা প্রয়োজনীয় অংশ টুকে নেয়। তারা ইচ্ছে করলে পরে নোটটি পূর্ণ আকারে লিখে পাঠ তৈরী করতে পারে। প্রণালীটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইহা একেবারে অচল।

৪। ব্যক্তিগত-প্রণালী (**Individual Mode**) ঃ

প্রণালীটি ব্যক্তি-বৈষম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা প্রত্যেক ছাত্রের যোগ্যতা অনুযায়ী অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা করে। গণিত-শিক্ষণে পদ্ধতিটি খুব উপযুক্ত। গণিতে সব কিছুর বোঝার উপর অগ্রগতি নির্ভর করে।

প্রণালীটির বৈশিষ্ট্য ঃ

১। প্রত্যেক ছাত্রকেই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

২। ছাত্র তার ক্ষমতা অনুসারে দ্রুত অথবা মন্থর গতিতে কাজ করে।

৩। কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর কাজে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সূত্রপাতে সকলেই একত্রে কাজ করে। কিন্তু শীঘ্রই শ্রেণীটিকে অগ্রগতি অনুযায়ী বিভিন্ন দলে ভাগ করতে হয়। কাজের আরও অগ্রগতি হলে ঐ দলগুলিকে আবার আরও ছোট ছোট দলে ভাগ করতে হয়। এইভাবে ভাগ করতে করতে শেষ পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক ছাত্রই একত্রে থাকতে পারে। শিক্ষক দলগুলিকে বা প্রত্যেক ছাত্রকে প্রয়োজন মত সাহায্য করেন।

সুবিধা ঃ—

১। প্রত্যেক ছাত্রেরই পাঠে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২। সমস্ত ছাত্রই সব সময় কাজ করে।

৩। ছাত্রেরা আত্মনির্ভর হয়।

৪। ছাত্রেরা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজ করতে পারে।

৫। তারা বেশী কাজ করতে পারে।

৬। স্বল্পবুদ্ধি ছাত্রেরা নিজেদের ক্ষমতার সীমার মধ্যে থেকে শিখতে পারে তাদের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিতে হয় না।

৭। ছাত্রের সময় ও শক্তির অপচয় বন্ধ হয়।

৮। ছাত্রেরা শিক্ষায় আগ্রহী হয়।

৯। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

অসুবিধা :—

১। শ্রেণী-পঠনের উপকারিতাগুলি পাওয়া যায় না।

২। যারা দ্রুত কাজ করে তাদের মধ্যে ভাসা ভাসা কাজ করার প্রবণতা দেখা যায়।

৩। শিক্ষকের পক্ষে কাজটি কঠিন হয়। তাঁকে অনবরত বিষয়বস্তুর এক অংশ থেকে অন্য অংশ আলোচনা করতে হয় এবং শ্রেণীকক্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে হয়।

৪। ২০টি ছাত্রের শ্রেণীতেও এক পিরিয়ডে শিক্ষক ছাত্র প্রতি ২ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারেন না। প্রণালীটি চল্লিশ বা ততোধিক ছাত্রের শ্রেণীতে প্রয়োগ করা যায় না।

৫। **দলগত-প্রণালী (Genetic Mode) :** শিক্ষকের পরিচালনায় শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রই পাঠে অংশ গ্রহণ করে। সমস্ত ছাত্রই একত্রে কাজ ও চিন্তা করে। শিক্ষক অনুমতি বা আদেশ করলে ছাত্রেরা তাদের মতামত ব্যক্ত করে। প্রয়োজন মত শিক্ষক প্রশ্ন, ইঙ্গিত বা সংকেত দ্বারা তাদের সাহায্য করেন। শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি থাকে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচনাটি অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়। শিক্ষককেই কেন্দ্র করে এই প্রণালীর শিক্ষণ-কাজ অগ্রসর হয়।

দলগত-প্রণালীর সঙ্গে আবৃত্তি-প্রণালী সংযুক্ত হলে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী-পঠন হয়। দলগত-প্রণালীতে শ্রেণীতে ছাত্রদের কাজ ভালো হয়। আবৃত্তি-প্রণালীতে গৃহকাজ ছাত্রেরা ঠিক অনুধাবন করেছে কিনা তা' দেখা সম্ভব হয়।

দলগত-প্রণালীতে শ্রেণী-পঠনে হিউরিষ্টিক নীতি প্রয়োগ করা হয়। আবিষ্কারক-প্রণালী থেকে ইহার পার্থক্য শুধু পরিমাণগত। আবিষ্কারক-প্রণালীতে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ছাত্রের কাজের উপর জোর দেওয়া হয়। দলগত-প্রণালীতে শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে একটি দল হিসাবে কাজ করতে হয়।

৬। **পরীক্ষাগার-প্রণালী (Laboratory Mode) :** এই প্রণালীতে গণিতের শ্রেণী-কক্ষটি পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাজিয়ে পদার্থ বিদ্যার পরীক্ষাগারের মত পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করা হয়। এইজন্য গণিতের শ্রেণী কক্ষকে পরীক্ষাগার বলা হয়। এই পরীক্ষাগারেই শিক্ষণীয় যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করা হয়। পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতিগুলি চিত্র লেখ-সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন স্তরে বাস্তব পরীক্ষা চালানোর উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম। শিক্ষক এই পরীক্ষাগারের পরিচালক। ছাত্রেরা ব্যক্তিগতভাবে বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করে।

আবৃত্তি-প্রণালী, বক্তৃতা-প্রণালী ও পরীক্ষাগার-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য একটিমাত্র বাক্যে বলা যেতে পারে—আবৃত্তি-প্রণালীতে ছাত্র শ্রেণীর কাজ সুরু হবার আগে

নিজে কাজ করে, বক্তৃতা-প্রণালীতে শ্রেণীর কাজ শেষ হবার পর ছাত্রের কাজ সুরু হয় এবং পরীক্ষাগার-প্রণালীতে ছাত্র শ্রেণীতেই নিজের কাজ করে।

শ্রেষ্ঠ প্রণালী ঃ এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে 'কোন্ প্রণালী শ্রেষ্ঠ' ?—কোন্ প্রণালী শিক্ষক অবলম্বন করবেন ? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত শিক্ষক কোন নির্দিষ্ট প্রণালীতে আবদ্ধ থাকবেন না। বিষয়ের প্রকৃতি, শ্রেণীর বিশেষত্ব ছাত্রদের চাহিদা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, শ্রেণী কক্ষের সাজ-সরঞ্জাম, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান প্রভৃতির উপর প্রণালীটি নির্ভর করবে। আবার শিক্ষকের অভিজ্ঞতাও বছরে বছরে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কোন বিষয় পঠনে তিনি নিশ্চয়ই কোন প্রণালীকে স্থায়িরূপে গ্রহণ করবেন না। যে প্রণালী গণিত-শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যে ছাত্রকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেটাই শ্রেষ্ঠ প্রণালী।

শ্রেষ্ঠ প্রণালী সম্বন্ধে যা বলা হল পদ্ধতি সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য।

গ। *পদ্ধতি ও প্রণালী সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ*

পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

১। শিক্ষণীয় বিষয়টি ছোট ছোট সরল অংশে কাঠিন্য অনুসারে বিভক্ত করে নিতে হবে। এক পিরিয়ডে একটি অংশ শেষ করতে হবে। অংশগুলি কাঠিন্য অনুসারে পর পর নিয়ে সম্পূর্ণ বিষয়টি শেষ করতে হবে। এইভাবে শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা অনুভব করবে যে গণিত-বিষয়টি সহজ ও সরল। শিক্ষককে দেখতে হবে যে ছাত্রেরা যেন গণিতকে একটি জটিল, রহস্যময় এবং দুর্বোধ্য বিষয় মনে না করে।

২। কোন বিষয় শেষ করতে যেন খুব বেশী দিন সময় নেওয়া না হয়—সেদিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে। এতে ছাত্রেরা ক্লান্তি বোধ করে।

৩। গণিতের প্রমাণে বিজ্ঞানসম্মত চরম নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন—একথা ঠিক। কিন্তু শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য এই চরম নিয়মানুবর্তিতার দরকার নেই। মাধ্যমিক স্তরে এই ধরনের প্রচেষ্টা ছাত্রদের কাছে গণিত বিষয়টিকে নীরস, বিরক্তিকর ও দুর্বোধ্য করে তুলবে। এই অসুবিধা দূর করা যেতে পারে যদি বিষয়টিকে অধিক সংখ্যক প্রকল্পের (*hypotheses, which might be proved*) উপর ভিত্তি করা হয় এবং এই প্রকল্পগুলি থেকে যথাযথ যুক্তিসম্মতভাবে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

৪। অল্প-সংখ্যক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সামান্যীকরণ করা সযত্নে পরিহার করতে হবে। কোন নিয়ম বা উপপাদ্যের সামান্যীকরণ করতে হলে দেখতে হবে নিয়ম বা উপপাদ্যটি যে সকল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি সামান্যীকৃত নিয়ম বা উপপাদ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ধনাত্মক, পূর্ণসংখ্যা-সূচকবিশিষ্ট দ্বিপদ উপপাদ্য (*Binomial Theorem*) ঋণাত্মক ও ভগ্নাংশ-সূচকের ক্ষেত্রে সামান্যীকরণ করা চলে

না। কিন্তু পাটীগণিতের নিয়ম চারটি বীজগাণিতিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সামান্যীকরণ করা যায়।

৫। প্রচলিত প্রয়োগ (*convention*) ও সত্যের মধ্যে পার্থক্যটি ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন। প্রথমে বিয়োগের কাজ করলে কিংবা প্রথমে গুণের কাজ করলে $24-3\times5$ রাশিমালাটির মান যথাক্রমে 105 বা 9 হয়। রাশিমালাটির প্রকৃত মান কি?

উত্তর। রাশিমালাটির কোন প্রকৃত মান (*true value*) নেই। এখানে দরকার ক্রিয়া-পদ্ধতির ক্রমসম্বন্ধে একটা মতের মিল। সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, গুণের কাজ আগে করতে হবে। কিন্তু যদি স্বীকার করে নেওয়া হত যে, বাম থেকে ডান দিকে পড়ার সময় ক্রিয়ার ক্রম অনুসারে কাজ করতে হবে তা হলেও ব্যাপারটি প্রচলিত ক্রিয়াপদ্ধতির মত স্বাভাবিক ও সত্য হত।

ছাত্রদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, গাণিতিক প্রতীক-সম্বলিত কোন রাশিমালার কোন সত্য মান নেই। মানটি নির্ভর করে রাশিমালাটির যে ব্যাখ্যা স্বীকার করে নেওয়া হবে তার উপর।

৬। অনাবশ্যক জটিলতা পরিহার করতে হবে। অনুশীলনের জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী করা উচিত নয়। যে ছাত্র 4 দশমিক স্থান পর্যন্ত $\sqrt{2}$-এর মান বার করতে পারে, সে 40 দশমিক স্থান পর্যন্তও মান বার করতে পারবে। কিন্তু তাকে এরূপ করতে বলা তার শক্তির অপচয় করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৭। গণিতের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। প্রত্যেক সমীকরণ, অসমতা (*inequality*) একটি বাক্য। এই বাক্যের ক্রিয়াগুলি $=$, $>$, $<$ ইত্যাদি। এই ভাষায় বাক্যরচনা যাতে সঠিকভাবে করা হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। $8+6=14+3=17$—এই জাতীয় বিবৃতি সম্পূর্ণ অর্থহীন। এরূপ ভুল সযত্নে সংশোধন করতে হবে ও বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকের নিজেরও নির্ভুলভাবে গণিতের ভাষা প্রয়োগ করার অভ্যাস গঠন করা উচিত এবং ছাত্রদেরও ইহাতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত।

৮। ছাত্র যেমন যেমন গণিতের ভাষার শব্দ-সম্পদ (*vocabulary i.e. symbols*) আয়ত্ত করবে তেমন তেমন তাকে তার ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা উচিত এবং মাতৃভাষায় সম্পূর্ণটি লিখতে নিরুৎসাহিত করা দরকার। গণিতের প্রতীকমূলক ভাষা শর্টহাণ্ডের ভাষা এবং ইহার যথেষ্ট সুবিধা আছে।

৯। ছাত্রকে যে সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া হবে, সেটি যেন তার নিজেরও সমস্যা হয়। সে যেন অনুভব করে যে, সমস্যাটির সমাধান করা দরকার আছে। কৃত্রিম সমস্যা সমাধানে ছাত্রের আগ্রহ থাকে না।

১০। সমস্যাটি সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত করতে হবে এবং তার সমাধানও যেন সুনির্দিষ্ট হয়। অনির্দিষ্ট উত্তর এবং অনির্দিষ্ট সমস্যার কোন মূল্য নেই।

১১। গৃহকাজের প্রধান উদ্দেশ্য হবে—

ক। যে তত্ত্ব বা নিয়ম ছাত্র সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছে তার অনুশীলন।

খ। যে সামান্য কয়েকটি জিনিস মনে রাখা দরকার সেগুলি স্মৃতিতে ধারণ।

গ। পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন।

ঘ। নীরব চিন্তা করার সুযোগ দান।

মনে রাখা দরকার যে, গৃহকাজ পূর্বদিনের শ্রেণীকাজকে পূর্ণতা দান করবে, কিন্তু পরের দিনের শ্রেণীকাজের প্রস্তুতি হবে না।

গৃহকাজ এমন হবে যেন শ্রেণীর স্বল্পবুদ্ধি ছাত্রও কাজটি সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে ও কাজটি করে উপকৃত হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গণিতে অনগ্রসরতার কারণ ও তার প্রতিকার

[Causes of Inefficiency in Mathematics and their Remedies]

অধিকাংশ লোকই মনে করেন যে, বর্তমানে গণিত-শিক্ষার ফল সন্তোষজনক নয়। গণিত-পরীক্ষার ফলও আশানুরূপ নয়—এটা প্রতি বৎসরই অনুভূত হয়। যে সমস্ত ছাত্র পরীক্ষায় ভালো ফল দেখাতে সক্ষম হয়, তাদের মধ্যেও প্রায়ই বিষয়টির মৌলিক ধারণা থাকে না। তারা লব্ধজ্ঞান উচ্চতর শিক্ষায় অথবা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অসমর্থ হয়।

গণিতের এইরূপ অসন্তোষজনক ফলের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

অনেকে বলেন, গণিত বিষয়টিই নীরস ও কঠিন। ইহা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র-মেধার উপযুক্ত নয়। বাস্তবে কিন্তু এ মত মোটেই গ্রাহ্য নয়। সাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্রমাত্রই গণিতে সাফল্য লাভ করতে পারে। গলদ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত।

কেহ কেহ বলেন, বর্তমান পাঠক্রম ঠিক বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয় বলে ছাত্রদের গণিতের প্রতি তেমন আগ্রহ নেই। আবার কেহ কেহ সমস্ত দোষ শিক্ষকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান।

আমরা গলদগুলি কোথায় তা নিরূপণ করার চেষ্টা করব এবং কি উপায়ে সেগুলির প্রতিকার করা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

গণিত-শিক্ষায় আজ যে শোচনীয় ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় তার জন্য কোন নির্দিষ্ট ত্রুটি দায়ী নয়। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিটি উপাদানের মধ্যে এগুলি নিহিত। এখন একে একে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

॥ প্রথমত ॥ ছাত্র-সংক্রান্ত ঃ

ক। **শারীরিক ত্রুটি**—ছাত্রের শারীরিক ত্রুটি গণিত-শিক্ষায় ব্যর্থতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। গণিত-শিক্ষায় মনোযোগের স্থান অতি উচ্চে। যে সমস্ত ছাত্র চোখে কম দেখে বা কানে কম শোনে তাদের পক্ষে শ্রেণীকক্ষে ঠিক মত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। এরা সহজে গণিতে সাফল্য দেখাতে পারে না।

খ। **শারীরিক, পরিবেশ-সংক্রান্ত ও প্রক্ষোভিক কারণ**—গণিতে মনোযোগের দরকার। যাদের শরীর রুগ্ন অথবা যাদের পরিবেশ প্রতিকূল কিংবা যাদের প্রক্ষোভের মাত্রা বেশী তারা ঠিক মত গণিত-শিক্ষায় মনোনিবেশ করতে পারে না। গণিতের 'ক্লান্তি-মূল্য' খুব বেশী। গণিত-শিক্ষায় খুব সহজেই শারীরিক ও মানসিক

ক্লান্তি দেখা দেয়। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও প্রক্ষোভমাত্রা অনুকূল না হলে শিক্ষায় ঠিক মত অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা হয়।

গ। শ্রেণীতে অনিয়মিত উপস্থিতি বা দীর্ঘ অনুপস্থিতি—অনিয়মিত উপস্থিত বা দীর্ঘ অনুপস্থিত থাকলে গণিতের পাঠ অনুসরণ করা যায় না। গণিত ধারাবাহিক বিষয়, পূর্বাপর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। শ্রেণীতে অনুপস্থিত হলে অধীত বিষয় গৃহশিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত অনেক ছাত্রই তৈরী করতে পারে না। ফলে নতুন অধ্যায়গুলিও তারা বুঝতে পারে না এবং স্থায়ীভাবে গণিতে অনগ্রসর থেকে যায়।

ঘ। অন্যান্য—(১) গণিতে অজ্ঞতা গোপন করা যায় না। যে কোন সমস্যার উত্তর একটিই হয়—ঠিক অথবা ভুল। বেশী ভাবপ্রবণ ছাত্রেরা তাদের অজ্ঞতা শ্রেণীর সকলের সামনে প্রকাশিত হওয়ার ফলে গণিত-বিষয়টির উপর বিরক্ত হয় এবং তাদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

(২) অধিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছাত্রেরা অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। গণিতেও তারা স্মৃতির জোরে সাময়িক লাভবান হয়। কিন্তু তারা গণিতের চিন্তাধারা জানা বা শেখার প্রয়োজন বোধ করে না বলে স্থায়ীভাবে গণিতে দুর্বল থেকে যায়।

(৩) গণিতে অভ্যাস ও অনুশীলনের মূল্য খুব বেশী। অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র প্রচেষ্টার অভাবে গণিতে সফল হয় না।

॥ দ্বিতীয় ॥ শিক্ষক-সংক্রান্ত ঃ

॥ ক ॥ **অযোগ্যতা**—আমাদের দেশে বহু শিক্ষক আছেন যাঁরা নিজেরাই গণিত ভালো বোঝেন না এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত নন। জ্ঞানের অগভীরতা ও শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য তাঁরা ছাত্রদের বিষয়টির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁরা ছাত্রদের মুখস্থ করতে উৎসাহিত করেন। গণিতে এর ফল হয় শোচনীয়।

॥ খ ॥ **উদ্দেশ্যের অভাব**—শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকলেও গণিত-শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর সঠিক ধারণা না থাকলে, তিনি সফল হবেন না। ছাত্রেরাও বুঝতে পারবে না তারা কেন বিষয়টি শিখছে। গণিত-শিক্ষণের উদ্দেশ্য জানা না থাকলে, শিক্ষা ভুল পথে চালিত হতে পারে। বাস্তব জীবনে গণিতের প্রয়োজন আছে—এই জ্ঞানটি থাকলে শিক্ষকও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বিষয়টি পড়াতে সক্ষম হবেন এবং ছাত্রেরাও পাঠে আগ্রহ বোধ করবে। শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভের কোন মূল্য নেই। জ্ঞান তখনই মূল্যবান যখন তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়। এই সত্যটি শিক্ষককেও অনুধাবন করতে হবে এবং গণিতের বাস্তব মূল্য সম্বন্ধে ছাত্রদেরও অবহিত করতে হবে। উদ্দেশ্যহীন শিক্ষায় শিক্ষকও শিক্ষণে আগ্রহ বোধ করেন না এবং ছাত্রেরাও শিক্ষালাভে উৎসাহিত হয় না। প্রয়োজন বোধ না করলে কেহই কোন বিষয়ে মনোযোগ দেয় না। সেইজন্য শিক্ষার্থীদের বাক্যে এবং কাজের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করাতে হবে যে, গণিত একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। শিক্ষার মধ্যে শিক্ষককে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

॥ গ ॥ **পাঠ-প্রস্তুত ও পাঠ-টীকার অভাব**—গণিত বিমূর্ত বিষয়। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রেরা বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে না। তাদের মূর্ত বস্তুর সাহায্যে ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণা দিতে হয়। তা ছাড়া পাঠদান মনোবিজ্ঞানসম্মত না হলে ছাত্রদের কোন উপকার হয় না। এর জন্য শিক্ষকের পরিকল্পনা করার দরকার, দরকার প্রস্তুতির ও মনোবিজ্ঞানসম্মত পাঠ-টীকা তৈরী করার। অপ্রস্তুত অবস্থায় শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিলে ছাত্রদের বিশেষ উপকার হয় না। আমাদের দেশে বহু শিক্ষকই শিক্ষণ-প্রাপ্ত নয়। পাঠ-প্রস্তুতি ও পাঠ-টীকা তৈরী করা সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান নেই। যাঁরা শিক্ষণ-প্রাপ্ত, তাঁরাও এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। এটা খুব পরিতাপের বিষয়।

॥ ঘ ॥ **ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেওয়ার অভাব**—শ্রেণীতে সকল ছাত্রই সমান বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। কিছু থাকে স্বল্পবুদ্ধি, কিছু বেশী বুদ্ধিমান এবং বাকী সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন। শিক্ষক সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের উপযোগী পাঠ দান করেন শ্রেণী-কক্ষে। এর ফলে স্বল্পবুদ্ধি ছাত্রেরা পাঠ অনুসরণ করতে অক্ষম হয় এবং ক্রমশ অনগ্রসর হয়ে পড়ে। অধিক বুদ্ধিমান ছাত্রদেরও চাহিদা ঠিক মত পূরণ হয় না। তারা ক্রমশ শ্রেণীর পাঠের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। শ্রেণীতে প্রায়ই চল্লিশের অধিক ছাত্র থাকে। চল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডে শিক্ষকের পক্ষে সকল ছাত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

॥ ঙ ॥ **গণিতের ভাষার দিকে দৃষ্টিদানের অভাব**—গণিতের নিজস্ব একটি ভাষা আছে। এই ভাষা প্রতীকমূলক। প্রতীকগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে শিক্ষার্থীর সময়ের দরকার হয়। কিন্তু শিক্ষক সাধারণত এই বিষয়ে খুব কম সময় নিয়োগ করে থাকেন।

॥ চ ॥ **শিক্ষণে সহজ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব**—অনেক শিক্ষক গাণিতিক প্রমাণে কঠিন নিয়মানুবর্তিতা (*rigour*) অনুসরণ করে পাঠদান করেন এবং কঠিন, দুরূহ অংশগুলি শিক্ষা দিতে চান। গণিতের তাত্ত্বিক দিকের উপর অযথা জোর দেন। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মানসিক বয়স এইরূপ তত্ত্বগত আলোচনায় বা কঠিন নিয়মানুবর্তিতা অনুসারে প্রমাণে অংশগ্রহণ করার পক্ষে অনুকূল নয়—এটা তাঁরা বোঝেন না। ফলে তাঁদের শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের কোন উপকার তো হয়ই না, পরন্তু তাদের ধারণা হয় যে, গণিত একটি রহস্যময়, জটিল এবং দুর্বোধ্য বিষয়। তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং গণিতে বিতৃষ্ণ হয়।

॥ ছ ॥ **অপ্রয়োজনীয় অধ্যায়ে ও পরীক্ষায় বেশী সময়ক্ষেপ**—অনেক সময় শিক্ষক অপ্রয়োজনীয় অধ্যায়ে বেশী সময় দিয়ে থাকেন। ফলে প্রয়োজনীয় অধ্যায়গুলি পড়ানোর সময় দ্রুত পড়াতে হয়। পুনরালোচনা, পরীক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে অনাবশ্যক বেশী সময় দেওয়া হয়ে থাকে। এর ফলে নতুন পাঠ বিশেষ অগ্রসর হয় না।

॥ জ ॥ **শ্রেণীর পাঠ্যসূচী সঠিক অনুসরণ না করা**—অনেক সময় শিক্ষক

শ্রেণীর পাঠ্যসূচী সঠিক অনুসরণ করেন না। ফলে নিম্নশ্রেণীতে কঠিন বিষয় ও উচ্চ শ্রেণীতে সহজ বিষয় পড়ানো হয়ে যায়।

॥ ঝ ॥ **ভুল পদ্ধতিতে পড়ানো**—নতুন শিক্ষকদের মধ্যে একটি বিশেষ ত্রুটি দেখা যায়। তাঁরা অতি উৎসাহে বক্তৃতা-পদ্ধতিতে প্রচুর তথ্য পরিবেশন করেন শ্রেণীতে, যেমন করা হয় কলেজে। তাঁরা শ্রেণীতে নিজেদের পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করেন। একবারও তাঁরা ভাবেন না যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একত্রে বেশী তথ্য গ্রহণ করতে অক্ষম। ছাত্রেরা তাঁদের মোটেই অনুসরণ করতে পারে না। ফলে তারা অজ্ঞই থেকে যায়।

এইসব শিক্ষকেরা ভুলে যান যে, তাঁদের কাজ পড়ানো নয়—শেখানো।

॥ তৃতীয়ত ॥ পদ্ধতি-সংক্রান্ত ঃ

॥ ক ॥ **ভুল পদ্ধতিতে পাঠদান**—অনেক সময় শিক্ষক ভুল পদ্ধতিতে পাঠদান করেন। প্রায়ই দেখা যায় যে জ্যামিতি পড়ানো হয় সংশ্লেষণী (*Synthetic*) পদ্ধতিতে এবং পাটীগণিত ও বীজগণিত শিক্ষণে অবরোহী (*Deductive*) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এতে ছাত্রদের কোন উপকার হয় না। তারা শ্রেণীতে যা শেখে তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না বলে পরে ভুলে যায়। এইরূপ ভুল পদ্ধতিতে পাঠদান করলে ছাত্রেরা স্বাধীন চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করার কোন সুযোগ পায় না। পাঠদান এমন হবে যাতে ছাত্রেরা আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে পারে। গণিত-শিক্ষণে যতদূর সম্ভব আরোহী (*Inductive*) ও বিশ্লেষণী (*Analytic*) পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার।

॥ খ ॥ **নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ**—অনেকে কোন বিশেষ সূত্র শেখানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি সকল সময় অনুসরণ করেন। তাঁরা মনে করেন যে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের (*Topic*) জন্য বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিই উপযুক্ত। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কোন বিষয়ের জন্যই কোন পদ্ধতি নির্দিষ্ট নেই। যে কোন বিষয় পাঠদানে ছাত্রেরা যে পদ্ধতিতে সহজ, সরল ও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে—সেটিই উপযুক্ত পদ্ধতি। তত্ত্বের দিক থেকে পদ্ধতিটি যত ভালোই মনে হোক না কেন—সেটি যদি বাস্তবে ভালো কাজ না করে, তা'হলে তার কোন মূল্যই নেই।

॥ গ ॥ **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির বিরুদ্ধতা**—গণিতের অনেক সমস্যা লগারিদম ও স্লাইড রুলের সাহায্যে দ্রুত সমাধান করা যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে এগুলির সাহায্য বড় একটা গ্রহণ করা হয় না। স্লাইড রুল ব্যবহারের শিক্ষা তো দেওয়াই হয় না। ঐচ্ছিক গণিতে লগারিদম পড়ানো হয়, কিন্তু তার বাস্তব ব্যবহারে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয় না। দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার নির্ভুল সমাধান করতে হলে, হিসাব-তালিকা (*ready-reckoner*), স্লাইড রুল, বিভিন্ন সারণী, এমন কি গণনাকারী যন্ত্রেরও (*computing machine*) ব্যবহার করতে হবে। আজকাল বিভিন্ন শিল্পে এগুলির বেশ চলন হয়েছে। বিদ্যালয়েই ঐগুলি ব্যবহারের শিক্ষা দিতে হবে।

॥ ঘ ॥ **পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষণ-পদ্ধতি**—বর্তমানে আমাদের শিক্ষণ-পদ্ধতির উপর পরীক্ষার প্রভাব খুব বেশী। কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, কি ছাত্র সকলের কাছেই পরীক্ষার ফলের দ্বারা শিক্ষার মান নির্দিষ্ট হয়। যে বিষয়ে ছাত্রেরা অধিক সংখ্যায় এবং ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছেও সেই বিষয়ের শিক্ষক বিশেষ প্রশংসা পেয়ে থাকেন। শিক্ষকও কাজেই ছাত্রের প্রকৃত শিক্ষার দিকে নজর না দিয়ে ছাত্র যাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং ভালো নম্বর পায় তার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করেন। ছাত্রও প্রকৃত শিক্ষা অর্জন না করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সব কিছু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে না। প্রয়োজনীয় বা পরীক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অংশ না বুঝে মুখস্থ করে পরীক্ষার উত্তরপত্রে উদ্গীরণ করে। পরীক্ষা শিক্ষার মূল্যায়নের একটা পদ্ধতি মাত্র না হয়ে আজ ইহা শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ ঙ ॥ **সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনে বাস্তব অসুবিধা**—মূর্ত বস্তুর সাহায্যে পাঠদান করতে হলে শ্রেণী কক্ষে কিছু কিছু সাজসরঞ্জামের দরকার হয়। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ইহার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া গণিতে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাদের বাস্তব ধারণা শ্রেণীকক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কোন জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেওয়া থাকলে জমিটির ক্ষেত্রফল কত একর হবে হিসাব করে ছাত্রেরা তা বলে দিতে পারে। কিন্তু এক একর কতটা জমি হয় তার বাস্তব ধারণা শ্রেণী-কক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় বলে ছাত্রের জ্ঞান তত্ত্বগত থেকে যায়।

॥ চতুর্থতঃ ॥ পাঠক্রম সংক্রান্ত ঃ

॥ ক ॥ **শিশু-কেন্দ্রিক পাঠক্রমের অভাব**—পাঠক্রম মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ রচনা করেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পর্ষদের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এই পাঠক্রম বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক। শিক্ষক উহা অনুসরণ করে শিক্ষা দেন এবং শিক্ষার্থীদেরও তাহাই অনুসরণ করতে হয়। এই ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। শিক্ষার্থীকে অনুসরণ করেই পাঠক্রম রচিত হওয়া দরকার।

॥ খ ॥ **অতিদীর্ঘ পাঠ্যসূচী**—গণিতের পাঠ্যসূচী অত্যন্ত দীর্ঘ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই পাঠ্যসূচী শেষ করা মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষককে দ্রুত পড়াতে হয়। ব্যক্তিগত মনোযোগ দেবার অবকাশ তাঁর হয় না। ছাত্রদের পক্ষেও ঐরূপ দ্রুত পাঠ আয়ত্ত করা এবং অধীত বিষয় নিয়ে চিন্তা করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া পাঠ্যসূচীতে এমন বহু বিষয় আছে যেগুলির সঙ্গে শিশুর বাস্তব জীবনের কোন যোগ নেই। কিছু কিছু অংশ এরূপ দুরূহ যে সাধারণ ছাত্রের পক্ষে সেগুলি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

॥ গ ॥ **অনুবন্ধের অভাব**—জ্ঞান অখণ্ড ও অবিভাজ্য। সেইজন্য শিক্ষাকে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া মনে রেখে পাঠক্রম রচনা করা দরকার। শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, বিষয়টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে অনুবন্ধ-প্রণালীতে

পাঠক্রম রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ দিকটি প্রায় অবহেলিত। ফলে শিক্ষা বিষয়-কেন্দ্রিক হচ্ছে—জীবন-কেন্দ্রিক হচ্ছে না; জ্ঞান খণ্ডিত হচ্ছে—সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

॥ পঞ্চম ॥ পরিচালন-সংক্রান্ত ঃ

॥ ক ॥ **প্রমোশন ব্যবস্থায় শিথিলতা**—বিদ্যালয়ে এক বিষয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে দুই বিষয়ে ফল খারাপ হলেও ছাত্র-সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া *special case* তো আছেই। গণিতের ফল খারাপ হলে প্রমোশন দেওয়ার ফল মারাত্মক হয়। গণিত ধারাবাহিক বিষয়। পিছিয়ে-পড়া ছাত্রের পক্ষে উঁচু শ্রেণীতে গণিতের পাঠ বোঝা বা অনুসরণ করা অসম্ভব। কাজেই এরূপ ছাত্র কোন দিনই গণিতে সাফল্যলাভ করতে পারে না। বহুমুখী বিদ্যালয়ে কলা বিভাগে (*Humanity stream*) গণিত প্রায়ই অবহেলিত।

॥ খ ॥ **ছাত্র-ভর্তির ব্যাপারে শিথিলতা**—অনেক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ভর্তির আগে যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার প্রতি বিশেষ গুরুত্বই দেওয়া হয় না। এটি যেন একটি নিয়মতান্ত্রিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করার চেয়ে ছাত্র-ভর্তির আগ্রহই বেশী দেখা যায়।

॥ ষষ্ঠ ॥ অন্যান্য ঃ

॥ ক ॥ **পাঠাগার ও পরীক্ষাগারের অভাব**—ছাত্রদের জন্য শ্রেণী-কক্ষে পাঠাগারের ব্যবস্থা কোন বিদ্যালয়ে বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণ পাঠাগারেও গণিত সম্বন্ধে ভালো বই বিশেষ থাকে না। শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য গণিত-শিক্ষণ সম্বন্ধে বইও খুব কম বিদ্যালয়ের পাঠাগারে থাকে।

আমাদের দেশে গণিত-শিক্ষণের জন্য কোন বিদ্যালয়েরই পরীক্ষাগার নেই। ফলে গণিত-শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটি সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়। শিক্ষাও কাজেই তত্ত্বগত থেকে যায়।

॥ খ ॥ **পাঠ্যপুস্তকের অভাব**—আমাদের দেশে উচ্চমানের পাঠ্য-পুস্তকের একান্ত অভাব। যেগুলি আছে সেগুলি গতানুগতিক ধারায় যুক্তিসম্মতভাবে অবরোহী বা সংশ্লেষণা-পদ্ধতিতে লেখা। মনোবিজ্ঞানসম্মত আরোহী বা বিশ্লেষণী-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। এ সমস্ত পাঠ্যপুস্তক ছাত্রেরা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত আয়ত্ত করতে পারে না। কাজেই ছাত্রদের বিশেষ কোন উপকারে লাগে না। তা ছাড়া মুদ্রণে যথেষ্ট ভুল থাকে। উত্তরমালায় মুদ্রণের ভুল ছাত্রদের প্রায়ই খুব অসুবিধায় ফেলে। একই সমস্যা বার বার সমাধান করে উত্তর মেলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদের অযথা সময় নষ্ট হয়। বইগুলিতে যথেষ্ট উদাহরণও থাকে না। আবার যেগুলি থাকে সেগুলি ঠিক ছাত্রদের বোধগম্য করে সমাধান করা থাকে না। কাজেই শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া গণিতের পাঠ্যপুস্তক ছাত্ররা অনুসরণ করতে পারে না।

॥ গ ॥ **সাধারণ ত্রুটি ও ভুল**—ছাত্রদের মধ্যে প্রায়ই কতকগুলি সাধারণ ত্রুটি ও ভুল পরিলক্ষিত হয়। যেমন $2x$ এবং x^2 অথবা nx এবং x^n-এর পার্থক্য ঠিকমত তারা ধরতে পারে না। বন্ধনীর মধ্যে একাধিক পদ থাকলে এবং বন্ধনীর পূর্বে ঋণাত্মক চিহ্ন থাকলে পদগুলি বন্ধনীমুক্ত করার সময় শুধুমাত্র প্রথম পদের চিহ্ন পরিবর্তন করে এবং বাকী পদগুলির চিহ্ন অপরিবর্তিত রাখে। $\sqrt{2}$ বা $\sqrt{3}$-এর মান লগারিদ্‌ম সারণী থেকে যথাক্রমে 1·415 বা 1·732 ছাত্রেরা ধরে নিয়ে থাকে ; π-এর মানও $\frac{22}{7}$ বা 3·142 ধরে নেয়। কিন্তু $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ বা π অমূলদ সংখ্যা এবং ধৃত মানগুলি মূলদ সংখ্যা। কোন অমূলদ সংখ্যা মূলদ সংখ্যার সঙ্গে সমান হতে পারে না। ধৃত মানগুলি যে আসন্নমান মাত্র এ ধারণা সকল ছাত্রের থাকে না। মৌলিক ধারণার অভাবই এ সমস্ত ত্রুটির জন্য দায়ী। পূর্বজ্ঞান ঠিক মত আয়ত্ত করতে না পারাই ইহার কারণ।

প্রতিকার :

॥ এক ॥ **দুর্বলতা নির্ণয় (Diagnosis)**—প্রথমেই ছাত্রদের দুর্বলতাগুলি নির্ণয় করা দরকার। গণিতে ছাত্রদের দুর্বলতা নির্ণয়ের জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে :—

১। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবেন এবং তাদের অসুবিধাগুলি জানবেন। সেগুলি টুকে রেখে অসুবিধাগুলি দূর করতে সচেষ্ট হবেন।

২। অনগ্রসর ছাত্রদের প্রশ্ন করে শিক্ষক জেনে নেবেন তারা কতদূর শিখেছে এবং তারপর তাদের পৃথক দলে বিভক্ত করে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে তিনি মৌখিক কাজের উপর বেশী জোর দেবেন।

৩। অনবধানবশত ছাত্রেরা যে সব ভুল-ত্রুটি করে সেগুলির একটা তালিকা শিক্ষক প্রণয়ন করবেন। এইরূপ ভুলগুলি সম্বন্ধে তিনি ছাত্রদের বার বার সাবধান করবেন এবং নজর রাখবেন যেন তাদের ভবিষ্যতে এই জাতীয় ভুল না হয়।

৪। শিক্ষক ছাত্রদের সর্বাত্মক পরিচয়-লিপি (*Cumulative Record Card*) রাখবেন এবং প্রয়োজনমত সেগুলি পর্যালোচনা করবেন।

৫। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত দুর্বলতা-নির্ণায়ক অভীক্ষা করে তিনি ছাত্রদের দুর্বলতা জেনে নেবেন।

॥ দুই ॥ **প্রতিকার ও প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা (Remedies and Remedial Measures)**—ছাত্রদের দুর্বলতা নির্ণয়ের পরে শিক্ষক নিম্নলিখিতভাবে সেগুলির প্রতিকার করবেন এবং অবস্থা বিশেষে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

১। ছাত্রের শারীরিক ত্রুটিগত অসুবিধা থাকলে শিক্ষক অনতিবিলম্বে প্রধান শিক্ষককে জানাবেন। স্কুল ক্লিনিক থাকলে সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন এবং অভিভাবককেও এ বিষয়ে যত্ন নিতে ও ব্যবস্থা করতে বলবেন।

২। গণিত-শিক্ষায় অখণ্ড মনোযোগ দরকার। গণিত-বিষয়টির ক্লান্তি-মূল্য খুব বেশী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরিয়ডে ছাত্রদের মনোযোগ সর্বাধিক থাকে এবং ঐ

সময়ে তাদের মনও খুব সতেজ থাকে। সুতরাং ঐ দুটি পিরিয়ডে গণিত-শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। অনিয়মিত ছাত্র যাতে নিয়মিত হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা দরকাব। যে পাঠগুলি অনুপস্থিতির জন্য ছাত্রের অধিগত হয় নি, সেগুলি যাতে সে তৈরী করে নিতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। ভাবপ্রবণ ছাত্রের অভিমানে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি দেবেন। গণিতে যাতে তারা আকৃষ্ট হয় তার জন্য তাদের ভাবপ্রবণতাকে কাজে লাগাবেন।

৫। গণিত মুখস্থ করার বিষয় নয়। যারা মুখস্থ করে তাদের নিরুৎসাহিত করতে হবে। ছাত্রেরা গণিতের যুক্তি যাতে বুঝতে পারে তার জন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

৬। শিক্ষককে শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। বিষয়টি সরস ও সহজবোধ্য করার জন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। তিনি প্রতিদিন মনোবিজ্ঞানসম্মত পাঠ-টীকা তৈরী করে পাঠদান করবেন। গণিত-শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে তিনি সচেতন থাকবেন এবং শিক্ষণ যাতে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। ছাত্রেরাও যাতে গণিতের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে সেজন্য যতদূর সম্ভব বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে সংযুক্ত করে তিনি বিষয়টি সজীব করবেন। তত্ত্বগত জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে তিনি বেশী নজর দেবেন।

৭। যতদূর সম্ভব প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি শিক্ষককে ব্যক্তিগত নজর দিতে হবে। যারা অনগ্রসর তাদের প্রতি বিশেষভাবে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া দরকার। সকল শ্রেণীতে একই পদ্ধতি অবলম্বন করলে চলবে না। ছাত্রদের মানসিক বয়স, ক্ষমতা, প্রবণতা অনুযায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। পদ্ধতি যেন যান্ত্রিক না হয়।

৮। গণিতের প্রতীকগুলির অর্থ ছাত্রেরা যাতে সঠিক উপলব্ধি করে এবং তারা যাতে সেগুলি যথাযথ ব্যবহার করতে পারে সেদিকে শিক্ষক নজর দেবেন এবং তাব জন্য সমুচিত সময় দেবেন।

৯। গণিত অমূর্ত বিষয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রেরা সহজে অমূর্ত ধারণা করতে পারে না। মূর্ত বস্তুর দ্বারা বাস্তব সমস্যার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের এই ধারণা জন্মাতে হবে। শিক্ষক এইজন্য যথেষ্ট ধৈর্যশীল হবেন। একটি পাঠ সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদের আয়ত্ত না হলে পরবর্তী পাঠে শিক্ষক যাবেন না।

১০। অনুশীলন না করলে গণিতে দক্ষতা জন্মায় না। শ্রেণীতে যা পড়ানো হয় ছাত্রেরা যাতে তার পুনঃপুনঃ অভ্যাস করে শিক্ষক সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। পূর্বজ্ঞানও মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করতে হবে যাতে ছাত্রেরা না ভুলে যায়।

১১। গণিত শিখতে ছাত্রেরা যাতে অনুপ্রাণিত হয় শিক্ষক তার সমুদয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

১২। ছাত্রেরা যাতে শিক্ষায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সেইভাবে শিক্ষাদান করতে হবে।

১৩। সমস্যার সমাধানে ছাত্রেরা যেন কিছু না বুঝে যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে। প্রত্যেক সমস্যায় 'কি দেওয়া আছে এবং কি প্রমাণ করতে হবে'—এই দুটি অংশ ছাত্রেরা যাতে নিজেরাই বুঝতে পারে তা ভালো করে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে কি করে ঐ দুটি অংশের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে ধাপে ধাপে সঠিক অনুমানের উপর ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান করা যায়। পদ্ধতিটি ছাত্রদের ভালো করে বোঝাতে হবে এবং আয়ত্ত করতে সাহায্য করতে হবে। আয়ত্ত করার পরই অনুশীলনের প্রশ্ন আসে। যান্ত্রিকভাবে অনুশীলন করার কোন মূল্যই নেই।

১৪। পাঠদানে শিক্ষককে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। গণিত-শিক্ষণে অবরোহী ও সংশ্লেষণী পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী নয়; আরোহী ও বিশ্লেষণী পদ্ধতিই উপযুক্ত। পদ্ধতিটি এমন হবে যে ছাত্রের মধ্যে আবিষ্কারের মনোভাবটি যেন জাগরূক থাকে। আবার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিকেই সমস্যা-সমাধানে চূড়ান্ত বলে মনে করলে চলবে না। প্রয়োজন মত পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। যে পদ্ধতিতে ছাত্রেরা সবচেয়ে ভালো বোঝে সেইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

১৫। পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষক পাঠদান করবেন না। শিক্ষণ ঠিক মত অগ্রসর হচ্ছে কিনা জানার জন্য মাঝে মাঝে পরীক্ষার দরকার আছে সত্য, কিন্তু পরীক্ষাকে অনুসরণ করে পাঠদান হবে না। পাঠদানকে অনুসরণ করেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬। যে বিষয়গুলির বাস্তব ধারণা শ্রেণী-কক্ষে দেওয়া যায় না সেগুলির জন্য শিক্ষক শ্রেণী-কক্ষের বাহিরে সমস্যা সম্পাদনমূলক পদ্ধতির অনুসরণ করবেন।

১৭। যে সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ আছে পাঠদানকালে শিক্ষক সেগুলির উপর বেশী গুরুত্ব দেবেন। ছাত্রেরা যেন বুঝতে পারে যে গণিত একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এইজন্য পাটীগণিতের শিক্ষার উপর বেশী জোর দেওয়া দরকার।

১৮। গণিতের পাঠক্রমটি যেন অপরিবর্তনীয় না হয়। প্রয়োজন মত ইহাকে পরিবর্তন করা দরকার।

১৯। পাঠক্রম বিষয়কেন্দ্রিক না হয়ে যেন ছাত্রকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক এবং জীবনকেন্দ্রিক হয়।

২০। গণিতের পাঠক্রমটি পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত এবং বিভাগগুলি স্বতন্ত্রভাবে পড়ানো হয়। এইভাবে বিভক্ত না করে সামগ্রিক-ভাবে পাঠক্রমটি রচনা করতে পারলে ভালো হয়। তা না হলে যতদূর সম্ভব অনুবন্ধ-প্রণালীতে পাঠদান করতে হবে।

২১। শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুসুলভ ব্যবহার করবেন। শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন হলে ছাত্রেরা তাঁকে ভয় করবে এবং এই ভীতি ক্রমশ গণিত-বিষয়টিতে সঞ্চালিত হবে। তাছাড়া শিক্ষককে বেশী ভয় করলে ছাত্রেরা নিজেদের দুর্বলতা ও অজ্ঞতা তাঁর কাছে প্রকাশ করতে সাহস করবে না।

২২। যে সমস্ত ছাত্র গণিতে অনগ্রসর, কোন কারণেই তাদের প্রমোশন দেওয়া উচিত হবে না।

২৩। পাঠদানে যতদূর সম্ভব চার্ট, মডেল প্রভৃতির ব্যবহার করতে হবে এবং ছাত্রেরাও যাতে ঐগুলি তৈরী করে তার জন্য তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

২৪। পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া দরকার। পাঠ্য-পুস্তক যেন আকারে খুব বড় না হয়। কিন্তু ছাত্রেরা অন্যের সাহায্য ব্যতীত যাতে বুঝতে পারে এমনভাবে লিখতে হবে। পাঠ্য-পুস্তক যেন 'লিখিত শিক্ষকের' কাজ করতে পারে।

২৫। বিদ্যালয়ের পাঠাগারে গণিত সম্বন্ধীয় ভালো ভালো পাঠ্য-পুস্তক রাখতে হবে। ছাত্রদের জন্য শ্রেণী কক্ষেই '*Text Book Library*' করা যেতে পারে। শিক্ষকদের জন্য আধুনিক গণিত-শিক্ষণ সম্বন্ধীয় পুস্তক থাকা দরকার।

২৬। ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গণিতে অনুবন্ধ

[Correlation in Mathematics]

জ্ঞান অখণ্ড ও অবিভাজ্য। শিক্ষণ ও শিক্ষা লাভের সুবিধার জন্য জ্ঞানকে বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে। আগে মনে করা হত যে, কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধহীন স্বাধীন মানসিক শক্তি (*faculty*) দ্বারা মন সংগঠিত। চিন্তা করা, বিচার করা, মুখস্থ করা, যুক্তি করা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি ক্ষমতাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরস্পর স্বাধীন বলে গণ্য করা হত। এই ক্ষমতাগুলির স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ সাধনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান ও অনুশীলন করান হত। সেইজন্য বিষয়গুলিকেও পরস্পর স্বাধীন বলে মনে করা হত। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে মানসিক ক্ষমতাগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন নয়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির বিকাশ-সাধন সম্ভব নয়। জ্ঞানকেও তাই পরস্পর সম্পর্কহীন কতকগুলি বিষয়ের সমষ্টি বলে আর ধরা হয় না। বিভিন্ন বিষয় যেন একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা। মূলের সঙ্গে সকলের নিবিড় যোগ বিদ্যমান।

শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। জ্ঞান প্রয়োগধর্মী। প্রয়োগেই জ্ঞানের সার্থকতা। কাজেই জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জীবনের নিকট সম্বন্ধ। তাই শিক্ষা একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া। বাস্তব জীবনের সঙ্গে ইহার নিবিড় যোগ বিদ্যমান। আবার শিক্ষা সামগ্রিক প্রক্রিয়াও বটে। তাই বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া চাই। সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, সঙ্কীর্ণ হয়।

একই বিষয়ের মধ্যে আবার বিভিন্ন শাখা আছে। যেমন, গণিতের মধ্যে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি। কিন্তু এই শাখাগুলিও আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। বিচ্ছিন্নভাবে শাখাগুলির শিক্ষা দিলে গণিতের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। একটি শাখার মধ্যে আবার বিভিন্ন বিষয়বস্তু আছে। এই বিষয়বস্তুগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গণিতের একটি শাখার বিষয়বস্তুগুলি যেমন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকবে, বিভিন্ন শাখাগুলিকেও সেইরূপ সম্বন্ধযুক্ত করে শিক্ষা দিতে হবে। গণিতের সহিত অন্যান্য বিষয়গুলির সমন্বয় সাধন করা দরকার। আবার গণিত-বিষয়টির সঙ্গে জীবনের যোগসূত্রটি বজায় রাখতে হবে।

শিক্ষাবিদ্ হার্বার্টই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র বা অনুবন্ধ আছে। তাঁর মতে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার দ্বারা মানসিক ক্ষমতাগুলি ঠিকমত বিকাশলাভ করে না। বিভিন্ন বিষয়গুলিকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা দিলেই মানসিক ক্ষমতাগুলি সম্যক

বিকশিত হয়। বিষয়গুলির মধ্যে উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপন ও সুষ্ঠু সমন্বয়কেই তিনি অনুবন্ধের নীতি বা *Principle of Correlation* বলে আখ্যা দেন।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিক্ষাকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করতে হলে অনুবন্ধের নীতি অনুসরণ করা দরকার। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষণে অনুবন্ধ নীতি অনুসরণের উপর বিশেষ জোর দেন।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় (যেমন বুনিয়াদী শিক্ষা) এবং কর্ম-সম্পাদনমূলক পদ্ধতিতে (Project Method) অনুবন্ধ নীতির প্রকৃষ্ট রূপায়ণ হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে একটি বিষয়কে কেন্দ্রীয় বিষয় (*central subject*) হিসাবে ধরা হয়। কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের অনুবন্ধ স্থাপন করে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে লক্ষ্য রাখা হয় যেন অনুবন্ধ স্বাভাবিক হয়।

অনুবন্ধের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য গাণিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

গণিতে অনুবন্ধ চার রকমের। যথা, (১) জীবনের সঙ্গে অনুবন্ধ; (২) অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ; (৩) গণিতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক অনুবন্ধ এবং (৪) একই শাখার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুবন্ধ। এই চতুর্বিধ অনুবন্ধের নীতি অনুসরণ করে শিক্ষা দিলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হতে পারে। গণিতে কিভাবে এই অনুবন্ধগুলি স্থাপন করা যায় এখন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

॥১॥ জীবনের সঙ্গে অনুবন্ধ :

জীবনের সকল স্তরেই কম বেশী গণিতের ব্যবহার আমাদের করতে হয়। সুতরাং দেখতে হবে যেন গণিতের বিষয়বস্তুগুলি বাস্তব এবং জীবন ও জীবিকার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়। শ্রেণী-কক্ষে ছাত্র যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে সেগুলি যেন তার জীবনেরও সমস্যা বলে সে অনুভব করে। ক্রয়-বিক্রয়, মূল্য-নিরূপণ, জমি-জায়গার পরিমাপ, সময়, অর্থ ও শক্তির সংক্ষেপ প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবাস্তব সমস্যা গণিত-শিক্ষা লাভে ছাত্রদের বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। অবাস্তব সমস্যা অবাস্তব চিন্তারও জনক। ইহার ফলে ছাত্রদের জীবন সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

মেট্রিক-পদ্ধতি দেশে চালু আছে। এখন টাকা, আনা, পাই বা গজ, ফুট, ইঞ্চি কিংবা মণ, সের, পোয়া, ছটাক সংক্রান্ত সমস্যাগুলির বাস্তব মূল্য কিছুই নেই। সুতরাং এগুলি বর্জন করা দরকার। আবার বহু সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে বাস্তব মনে হতে পারে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে সমস্যাগুলি অবাস্তব। এরূপ একটি সমস্যার উদাহরণ দেওরা হল।

সমস্যা—৭ জন লোক একটি কাজ ৯৫ ঘণ্টায় শেষ করতে পারে। ৩০ ঘণ্টায় কাজটি শেষ করতে হলে কত জন লোক দরকার হবে?

॥ ২ ॥ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ ঃ

বিজ্ঞান, কলা ও কৃষ্টিমূলক বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতিতে গণিতের অবদান ও উহাদের সঙ্গে গণিতের সম্বন্ধের বিষয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। যে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাদানে গণিতের ব্যবহার করতে হয়, গণিত শিক্ষা দেবার সময় ঐ সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গণিত প্রযুক্ত হবে, দেখতে হবে, বিষয় শিক্ষককে যেন প্রয়োজনীয় গণিতের অংশটি আবার শিখিয়ে নিতে না হয়। উঁচু শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যার প্রায় সকল অংশেই গণিতের সাহায্য দরকার হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে আজ গণিতের বহুল প্রয়োগ হচ্ছে। সুতরাং গণিতের পাঠক্রমটি এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন অন্যান্য বিষয় শিক্ষা লাভে গণিতের প্রয়োগ করতে ছাত্রদের অসুবিধা না হয়।

॥ ৩ ॥ গণিতের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক অনুবন্ধ ঃ

গণিতের বিভিন্ন শাখা, যেমন পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতির জন্য বিদ্যালয়ে সাধারণত আলাদা আলাদা পিরিয়ড থাকে। শিক্ষকও এমনভাবে পড়ান যেন ঐগুলি আলাদা আলাদা বিষয়। আবার সকল স্কুলে বিভিন্ন শাখা পড়ানোর জন্য একই শিক্ষক থাকেন না। যিনি পাটীগণিত পড়ান, তিনি হয়ত বীজগণিত পড়ান না। আবার যিনি বীজগণিত পড়ান, তাঁর সঙ্গে জ্যামিতির কোন সম্পর্ক নেই। ফলে শিক্ষকও তাঁর নির্দিষ্ট শাখাটিকে একটি পৃথক বিষয়রূপে মনে করেন। সুতরাং ছাত্রেরাও শাখাগুলিকে পরস্পর সম্পর্কহীনভাবে শেখে। এতে জ্ঞানের ভিত্তি দুর্বল হয় এবং গণিত-শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। জ্যামিতির আয়তক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন ধারণা না দিয়ে পাটীগণিতের ক্ষেত্রফল-সংক্রান্ত সূত্র ও সমস্যা সমাধান করতে শেখানোর কোন মূল্যই নেই। গণিতের বিভিন্ন শাখাগুলি অনুবন্ধ-প্রণালীতে শেখাতে হবে। পাটীগণিত, বীজগণিত বা জ্যামিতির জন্য পৃথক পৃথক পিরিয়ড থাকা উচিত নয়। পিরিয়ডটি হবে গণিতের এবং এই পিরিয়ডে গণিতই শিক্ষা দেওয়া হবে সবগুলি শাখার একীকরণ করে। একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন শাখার পিরিয়ডে আলাদা আলাদা করে শেখানোর কোন প্রয়োজন নেই। সমস্যাকে পাটীগণিতের সমস্যা, বীজগণিতের সমস্যা বা জ্যামিতির সমস্যা বলে চিহ্নিত করার কোন কারণ নেই। সমস্যা সমস্যাই। সমাধানের সময় সবচেয়ে সহজ ও সরল পথটি বেছে নিতে হবে। যে শাখাটি যখন কাজে লাগবে তখনই তাকে কাজে লাগাতে হবে। সমস্যার সমাধানে বীজগণিতের সমীকরণকে প্রয়োগ করাই সমীচীন। ক্ষেত্রফল-সংক্রান্ত বিষয়ে জ্যামিতির সাহায্য নেওয়া দরকার এবং বীজগণিতকে পাটীগণিতের বিস্তৃতিরূপে শেখাতে হবে। উদাহরণস্বপ সূত্র $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ নেওয়া যাক।

প্রথমে দুটি মূর্ত সংখ্যার সাহায্যে দেখাতে হবে যে, তাদের যোগফল ও অন্তর-ফলের গুণফল সংখ্যা দুটির বর্গের অন্তরফলের সমান। এইভাবে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সূত্রটির সত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে ছাত্রদের সাহায্য করতে হবে। তারপর বীজগণিতের নিয়মে সূত্রটি প্রমাণ করতে হবে। পরে জ্যামিতিক-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

ছাত্রদের বোঝাতে হবে $a+b$ এবং $a-b$ বলতে কি বোঝায়। $(a+b)(a-b)$ আয়তক্ষেত্রটি এঁকে দেখাতে হবে যে আয়তক্ষেত্রটি a^2 ও b^2 বর্গদ্বয়ের অন্তরফলের সমান।

বিস্তৃত উদাহরণের জন্য পাটীগণিত-শিক্ষণ, বীজগণিত-শিক্ষণ ও জ্যামিতি-শিক্ষণ পরিচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য।

॥ ৪ ॥ একই শাখার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুবন্ধ ঃ

গণিত ধারাবাহিক বিষয়। ইহার যে কোন শাখার বিষয়বস্তুগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হবে। বিষয়বস্তুগুলির বিন্যাসে যুক্তিসম্মত ও মনোবিজ্ঞানসম্মত ক্রম (**order**) অনুসরণ করা দরকার। অধ্যায়গুলি পূর্বাপর একটি শৃঙ্খলে এমনভাবে আবদ্ধ থাকবে যেন ছাত্রের ক্রমানুসারে শিখতে কোন অসুবিধা না হয়। ছাত্রের চাহিদা অনুসারে বিষয়বস্তুগুলিকে সাজানো দরকার। বিভিন্ন হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ শেখাবার সময়ই গ. সা. গু এবং ল. সা. গু-র অবতারণা করতে হবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গণিতে মূল্যায়ন

[Evaluation in Mathematics]

শিক্ষায় মূল্যায়ন ঃ

শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া—শিক্ষণ ও শিক্ষা লাভ। পূর্বে শিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রকে সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত দক্ষতা-অর্জনে সাহায্য করা বা তথ্যমূলক জ্ঞান দান করা। আর ছাত্রের শিক্ষা লাভ করা বলতে নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষক প্রদত্ত জ্ঞান গ্রহণ করা বোঝাত। শিক্ষা ঠিক মত অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা পরিমাপের জন্য পরীক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষণ ও শিক্ষা লাভ এই দুটি শব্দেরই সংজ্ঞার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এখন শিক্ষাকে একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া বলা হয়। শিক্ষণ বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সাহায্য করা। আর শিক্ষার্থী এখন জ্ঞান গ্রহণ করে না। সে মূর্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু শিক্ষণ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী আমূল পরিবর্তিত হলেও পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। পরীক্ষার কাজ প্রধানত ছাত্রদের শিক্ষামূলক জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপ করা। যদিও রচনাধর্মী পরীক্ষায় একাজও সুষ্ঠুভাবে হয় না। ইহার অনেক ত্রুটি আছে। সে যাই হোক, শিক্ষা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা—শিক্ষার উদ্দেশ্য ঠিক মত রূপায়িত হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করার মত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি দরকার।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় মূল্যায়ন শব্দটি নতুন। পরীক্ষার উদ্দেশ্যের চেয়ে ইহার উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক। পরীক্ষায় প্রধানতঃ অধীত বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানের বা কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপ মূল্যায়নের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক। পরিমাপের পরই মূল্যায়নের কাজ শেষ হয় না বরং পরিমাপের মাধ্যমেই ইহার কাজ সুরু হয়। পরিমাপ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্র মাত্র। ইহা মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি বা উপায়। মূল্যায়নের আসল উদ্দেশ্য শিশুর শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষার লক্ষ্যগুলি ঠিক মত রূপায়িত হচ্ছে কিনা দেখা। পরিমাপ ও মূল্যায়নের পার্থক্যটি **মনরো** সুপরিস্ফুট করেছেন। তিনি বলেন—মূল্যায়নে কেবল মাত্র বিষয়বস্তুর জ্ঞানের পরিমাপ করা হয় না—ইহা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ক্রম-পরিবর্তন এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলি কি পরিমাণে রূপায়িত হচ্ছে তারও পরিমাপ করে। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শ, চিন্তন-ক্রিয়া, কর্ম-অভ্যাস, আগ্রহ, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক খাপখাওয়ানোর ক্ষমতা—এক কথায় তার দৈহিক, মানসিক, আচরণগত, মেজাজগত, আবেগমূলক, চারিত্রিক এবং ব্যক্তিত্বের গতিশীল পরিবর্তনকে পরিমাপ করতে এবং সঠিক পথে পরিচালনা করতে মূল্যায়ন সাহায্য করে।

ক্রমপরিবর্তনশীল শিশুর আচরণগুলি মাপার জন্য একাধিক যথার্থ ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রস্তুত করা এবং তাদের যথাযথভাবে প্রয়োগ করার উপর মূল্যায়ন নির্ভর করে।

শিক্ষা একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। শিক্ষার সঙ্গে মূল্যায়ন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মূল্যায়নও একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষা লক্ষ্যাভিমুখী হচ্ছে কিনা তা নিরবচ্ছিন্নভাবে যাচাই করা দরকার।

মূল্যায়নের ব্যাপক স্বরূপ সম্বন্ধে 'কুইলেন বা হান্না' বলেছেন—

১। শিশুর আচরণ ঠিক মত নির্ণয় করার জন্য মূল্যায়ন যাবতীয় উপায় নির্ধারণ করে।

২। শিশুর সদা পরিবর্তনশীল বৃদ্ধির দিকে ইহা নজর দেয়।

৩। ইহা শিক্ষা প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৪। ইহা এক দিকে বিবরণমূলক এবং অপর দিকে সাংখ্যমানে প্রকাশিত হয়।

৫। ইহা শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে।

৬। মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া শিশু, শিক্ষক ও অভিভাবক—এই তিন জনের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান ঃ

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর মধ্যে সামগ্রিক পরিবর্তন আনা—তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা। যোগ্যতা অনুযায়ী শিশু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঠিক মত অগ্রসর হচ্ছে কিনা মাঝে মাঝে পরিমাপ করে দেখা দরকার। মূল্যায়ন-পদ্ধতি সমগ্র শিশুকে সম্পূর্ণরূপে পরিমাপ করার ভার নিয়েছে।

শিশুর মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত ও সমর্থনযোগ্য পরিবর্তন আনাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এক দিকে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দ্বারা শিশুর মধ্যে পরিবর্তন আনা এবং অপর দিকে মাঝে মাঝে তার মূল্যায়ন করা সার্থক শিক্ষা-ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ। তাই মূল্যায়ন হচ্ছে এক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে—

ক। শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা নিরূপণ করা হয়।

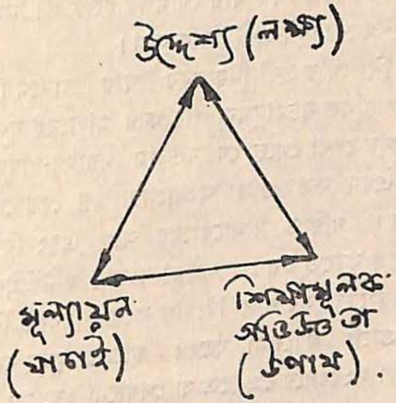
খ। শ্রেণীতে প্রদত্ত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ফলাফল কি, তা স্থির করা হয়।

গ। শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কিরূপ ভাবে সফল হয়েছে তা নিরূপণ করা হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান। উদ্দেশ্যকে যদি 'লক্ষ্য' বলা হয়, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাকে বলা হবে 'উপায়' এবং মূল্যায়নকে বলতে হবে 'যাচাই'। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের কেন্দ্রস্থলে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য অবস্থিত। শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে মূল্যায়নের দ্বারাই যাচাই করা হয়। উদ্দেশ্যগুলির উপর নির্ভর করে অভিজ্ঞতাগুলিকে সাজানো হয়। কি পরিমাণ শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা শিশুর মধ্যে কতটা পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে শিক্ষার প্রতি-স্তরে মূল্যায়নের

দ্বারা তা জানা যায়। উদ্দেশ্য, অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ তা নিম্নের প্রতীক-চিত্রে দেখানো হয়েছে।

শিশু অভিজ্ঞতা দ্বারা সর্বদাই শিক্ষা লাভ করছে। বছরের শেষে একটিমাত্র পরীক্ষার দ্বারা শিশুর পরিবর্তনের ফলাফল নিরূপণ করা যায় না এবং তা করা উচিতও নয়। শিশুর প্রতিদিনের পরিবর্তন মূল্যায়ন করা দরকার। এ ছাড়া শিক্ষাদানের আগে শিশুর শিক্ষা কতদূর হয়েছিল এবং এই প্রারম্ভিক শিক্ষার পটভূমিকায় শিক্ষাদানের সময়ে শিশুর শিক্ষায় যে অগ্রগতি ঘটেছে, তার মূল্যায়নের উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ করা দরকার। যথাযথ মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমতঃ শিশুর প্রারম্ভিক অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানলাভ করে তার শিক্ষা দান কালে যে পরিবর্তন



হয়েছে তাকে পরিমাপ করা দরকার। দ্বিতীয়ত, শিশুর অগ্রগতিকে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, সমর্থনযোগ্য পরিবর্তনগুলি শিশুর মধ্যে কেমনভাবে এসেছে মূল্যায়নের দৃষ্টিতে তা বিচার করা দরকার।

গণিতে মূল্যায়ন ঃ

পাঠক্রমে গণিত একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মাতৃভাষার পরই গণিতের স্থান। দৈনন্দিন জীবনে ও সভ্যতার বিকাশে ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য। তা ছাড়া শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলির রূপায়ণেও ইহা যথেষ্ট সাহায্য করে। ইহা শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতাগুলির বিকাশ সাধন করে এবং জীবনের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের যোগ্যতা তাকে দান করে। শিক্ষার মূল লক্ষ্যগুলির দিকে শিশুর যে পরিমাণ অগ্রগতি হয় তার দ্বারাই শিক্ষা-প্রক্রিয়ার সাফল্য বিচার করা হয়। মূল্যায়ন শিক্ষা-প্রক্রিয়ার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

গাণতে মূল্যায়নের বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব আছে। গণিত বিষয়টিই এমন যে উপযুক্ত শিক্ষণ-পদ্ধতি অবলম্বন না করলে, গণিত-শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

(১) মনে করা জাতীয় (Recall type) :

ক। প্রশ্ন আকারের : (*Question type*)
সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু দুটির বর্গের সমষ্টি কত ?

খ। শূন্য স্থান পূরণ আকারের : (*Completion type*)
১। যে কোন ত্রিভুজে তিনটি কোণের সমষ্টি— ।

(২) চিনতে পারা জাতীয় (Recognition type) :

ক। বহু-নির্বাচন জাতীয় : (*Multiple choice type*)
১। 28)7342(অঙ্কটি করা যাবে—
(১) যোগ ক্রিয়া দ্বারা, (২) ভাগ ক্রিয়া দ্বারা, (৩) গুণ ক্রিয়া দ্বারা, (৪) বর্গমূল ক্রিয়া দ্বারা, (৫) বিয়োগ ক্রিয়ার দ্বারা।
২। একটি ঘরের ক্ষেত্রফল 112 বর্গফুট। ইহার প্রস্থ 8 ফুট। ইহার দৈর্ঘ্য হবে—
(১) 1 ফুট, (২) 11 ফুট, (৩) 2 ফুট, (৪) 13 ফুট, (৫) 14 ফুট।

খ। সত্য-মিথ্যা জাতীয় বা হাঁ-না জাতীয় : (*Alternate Response type*)
১। বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ। সত্য-মিথ্যা
২। একজন মজুরের সাতদিনের মজুরি 28 টাকা। তার বারো দিনের মজুরি 50 টাকা। হাঁ-না

গ। ঠিক করে সাজান জাতীয় : (*Matching type*)

স্তম্ভ 1	স্তম্ভ 2
(i) 5×8	(i) $\frac{2}{5}$
(ii) $\frac{3}{2} \div \frac{15}{4}$	(ii) 90°
(iii) শঙ্কুর আয়তন	(iii) 40
(iv) এক সমকোণ	(iv) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

ঘ। শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় : (*Completion type*)
১। 1 : 2 :: — : 8।
২। (i) 3, 6, 9, 12, —, —
(ii) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}$, —, —

(৩) বুদ্ধিগত প্রশ্ন : (Intelligent Questions)
১। আট ফুট দীর্ঘ একটি পিচ্ছিল রড মাটিতে পোঁতা আছে। একটি বাঁদর প্রথম মিনিটে দু' ফুট ওঠে ও দ্বিতীয় মিনিটে এক ফুট নামে। এইভাবে সমস্ত রডটি উঠতে তার কত মিনিট লাগবে ?
২। এক ডজনে যদি 12-টি 5 টাকার নোট হয়, এক ডজনে কটি টাকা হবে ?
৩। ঘড়িতে 6টা বাজতে 5 সেকেণ্ড সময় লাগলে, 12টা বাজতে কয় সেকেণ্ড সময় লাগবে ?

এছাড়া প্রতিটি বিষয়বস্তু পাঠের শেষে এবং বছরের শেষে শিক্ষাগত ফলের অভীক্ষা (Attainment Test) করা দরকার। প্রশ্নগুলি এমন হবে যাতে ছাত্রদের গতি ও শক্তি (Speed and Power) পরিমাপ করা যায়। গতি-পরীক্ষায় নির্দিষ্ট সময়ে সমকঠিন কত বেশী সংখ্যক নির্ভুল উত্তর ছাত্রেরা করতে পারে তা দেখা হয়। শক্তি-পরীক্ষায় ছাত্রেরা কত কঠিন প্রশ্নের উত্তর করতে পারে তা দেখা হয়। মাঝে মাঝে দুর্বলতা-নির্ণায়ক (Diagnostic) এবং পূর্বাভাসসূচক (Prognostic) পরীক্ষাও করা সমীচীন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গণিতে মৌখিক কাজ

[Oral work in Mathematics]

গণিতে মৌখিক কাজের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়—বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে। ছড়া ও আবৃত্তির মাধ্যমেই শিশুরা গণনা করতে শেখে। ধীরে ধীরে গণিতের লিখিত রূপের সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো হয় এবং এটাই গণিতের প্রকৃত রূপ। কিন্তু এক্ষেত্রেও চার নিয়মে ও অন্যান্য গাণিতিক প্রক্রিয়ায় তাদের দক্ষ করে তোলার জন্য এবং দ্রুততার সঙ্গে হিসাব করার জন্য তাদের মনে মনে অনেক হিসাব করার শিক্ষা দেওয়া হয়। বহু মৌলিক তথ্যে তাদের দক্ষ করে তোলা হয়। এই অভ্যাস তাদের পরবর্তী শিক্ষা স্তরেও খুব সাহায্য করে। ছোট ছোট হিসাব যা ছাত্রেরা মনে মনে করতে সক্ষম তাকে লিখে করতে তাদের নিরুৎসাহিত করা উচিত। সমস্যার যে সমস্ত অংশ মনে মনে সমাধান করা যায়—সেগুলি মনে মনেই করতে হবে। এতে অনেক সময় বাঁচে এবং মানসিক সক্রিয়তা বাড়ে।

শ্রেণী পঠনের সুরুতে আয়োজন স্তরে মৌখিক কাজের ওপর আমরা জোর দিয়ে থাকি। এই ব্যবস্থা ছাত্রদের পক্ষে মানসিক টনিকের মত কাজ করে। অবশ্য শ্রেণী পাঠের সঙ্গে এগুলিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়; কেহ কেহ আয়োজন স্তরে শুধু মাত্র মানসিক টনিক হিসাবেই মৌখিক কাজ দিয়ে শ্রেণী পঠন সুরু করার পক্ষপাতী। শ্রেণীর বাকী কাজের সঙ্গে মৌখিক কাজের সম্পর্কের ওপর কোন গুরুত্ব দিতে চান না। Godfrey ও Siddons তাঁদের 'Teaching of Elementary Mathematics'-এ ৯টি প্রশ্ন দিয়ে পাঠ সুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রশ্নগুলির মুখে মুখে উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ—

১। $2-{\cdot}2$ কত? ২। $8\times{\cdot}5$ কত? ৩। ·06কে ভগ্নাংশে বল।
৪। $3{\cdot}25\times10$ কত? ৫। ${\cdot}42\div7$ কত? ৬। $1\frac{1}{4}$ কে দশমিকে বল।
৭। $3{\cdot}25\div100$ কত? ৮। 1 টাকায় $\frac{4}{5}$ কত? ৯। $(1\frac{1}{2})^2$ কত?

এরূপ ধরা বাঁধা ছকে অনেকেই কাজ করার পক্ষপাতী নন। তাঁরা নিয়ম মাফিক মৌখিক কাজের পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে মৌখিক কাজের একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা চাই। যেমন, ছাত্রের দুর্বলতা নির্ণয় করা বা পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা বা নতুন বিষয়বস্তু পরিবেশনের পর লিখিত অঙ্ক করার আগে কিছু মৌখিক প্রশ্ন করে বিষয়টি উপলব্ধি করতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

আমাদের মতে দ্বিতীয় পদ্ধতিই শ্রেয়। মৌখিক বা মনে মনে কাজ প্রয়োজন মতই করা উচিত। তার একটা সুনির্দিষ্ট এবং তাৎক্ষণিক মূল্যও থাকা দরকার। তাছাড়া কাজটি এমন হওয়া চাই যা না লিখে মনে মনে করা যায় এবং ইহা গণনা বা

হিসাব সংক্রান্ত কাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। একটি মৌখিক পরিবেশিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ও সেই একই প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিলে তার উত্তর দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে কাঠিন্যের মাত্রায়—একথা শিক্ষকের মনে রাখা উচিত।

যে সকল শিশুর বুদ্ধি কিছুটা কম বা যারা অঙ্কে দুর্বল, তাদের পক্ষে মৌখিক কাজের বিশেষ উপযোগিতা আছে কি না সন্দেহ আছে। গণিতের কয়েকটি বিষয়ে তাদের অনুশীলন করাতে হয়—যেমন গুণের নামতা। অনুশীলনের দ্বারা নামতা মুখস্থ করা ছাড়া তাদের দ্বারা আর কিছু হয় না। ঐ নামতাকে প্রয়োগ করে মনে মনে কিছু হিসাব সঠিকভাবে করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে। তাদের ক্ষেত্রে মৌখিক কাজ ক্ষতিকারক হতে পারে। যে সমস্ত কাজ সাধারণ ছাত্রেরা মনে মনে করতে পারে সে কাজগুলিও তাদের কাগজে-কলমে করতে দেওয়াই প্রশস্ত হবে। এতে তারা কিছুটা শুদ্ধ ফলের মান বজায় রাখতে পারবে। এই সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করলে তারা কিছু মাত্র লাভবান তো হবেই না বরং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। যে সব ছাত্র আবার গণিতে ভালো, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যতটা হিসাবের কাজ মনে মনে সঠিক ভাবে করতে পারে, ততটা মৌখিক কাজেই তাদের উৎসাহিত করা উচিত। দুর্বল ছাত্রদের জন্য কিন্তু এই ব্যবস্থা বিপজ্জনক হবে।

মৌখিক কাজে কিছুটা অভ্যাস দরকার। একটু অনুশীলন করলে এ বিষয়ে যোগ্যতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিক্ষক ঠিক মত পরিচালন করলে অনেক ছাত্রই নিজেদের মৌখিক হিসাব করার ক্ষমতা দেখে নিজেরাই বিস্মিত হবে।

লিখিত কাজকে সংক্ষেপ করার জন্য ভালো ছাত্রদের মৌখিক কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত—একথা ঠিক। কিন্তু তার একটা সীমা থাকা দরকার। নির্ভুলতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে দেওয়া কখনই উচিত নয়। যেখানে মৌখিক কাজে ভুল হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকে সেখানে এ অভ্যাসকে সংযত করা উচিত। $(2a-5b)^2-(a+6b)^2$ জাতীয় রাশিমালাকে মনে মনে সরল করতে শিশুদের উৎসাহ দেওয়া বিপজ্জনক।

মৌখিক কাজের অভ্যাসের দ্বারা একটা সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যায়। সমস্যাকে নানা দিক থেকে মনে মনে আক্রমণ করে সমাধানের পক্ষে যে উপায়টি সবচেয়ে সুবিধাজনক, তাকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা মৌখিক কাজের অভ্যাসের দ্বারা বিকশিত হয়।

গণিতের বহু সংখ্যক তথ্য এবং সূত্র মুখস্থ রাখতে পারলে মৌখিক কাজে পদ্ধতি, প্রচেষ্টা এবং সময়ের দিক দিয়ে অনেক সংক্ষেপ হয়। অনেক সময় অতি উৎসাহে ছাত্ররা এরূপ করে থাকে এবং শিক্ষকও তা সমর্থন করেন। এ বিষয়ে বেশী উৎসাহ দিলে ছাত্রদের না বুঝে মুখস্থ করার একটা প্রবণতা দেখা দিতে পারে। গণিতে মুখস্থ করার চেয়ে চিন্তা ও যুক্তি-শক্তির বিকাশের দিকে শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছাত্রদের বিষয়বস্তুগুলি ঠিক মত বুঝতে হবে। তার পরেই যা মনে রাখার দরকার তাকে অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে। গণিতে তথ্য ও সূত্র মুখস্থ রাখা সীমিত হওয়া দরকার। কোন্ তথ্য বা সূত্র মনে রাখা দরকার তা স্থির করার আগে বিচার করা দরকার—(১) কোন গণিতজ্ঞ তথ্যটি মনে রাখা দরকার বিবেচনা করবেন কি না (যেমন $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

উপবৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ মনে রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ থেকে ইহা সহজেই পাওয়া যায়); (২) তথ্যটির প্রয়োগ যথেষ্ট আছে কি না।

মৌখিক কাজের সীমারেখা বজায় রেখে চললে ইহার প্রচুর উপযোগিতা আছে। সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

১। মৌখিক কাজে ছাত্ররা বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে। শিশুরা কথা শুনতে ও বলতে ভালবাসে।

২। মৌখিক কাজে চোখ ও কান—এই দুটি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়। লিখিত কাজে একটি ইন্দ্রিয়ের কাজ হয়। তাই মৌখিক কাজে শিক্ষণ ভালো হয়।

৩। মৌখিক কাজে সময়, প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির সংক্ষেপ হয়।

৪। ইহার দ্বারা দ্রুত চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

৫। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রেরা সপ্রতিভ হয়। তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বৃদ্ধি পায়।

৬। ইহাতে ছাত্ররা সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ উত্তর দিতে শেখে।

৭। ছাত্রদের বাস্তব জীবনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই অভ্যাস কাজে লাগে।

৮। ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা, দুর্বলতা নির্ণয় করা এবং নতুন পাঠ তারা ঠিক বুঝল কি না পরীক্ষা করার জন্য শিক্ষক মৌখিক কাজের সাহায্য নিয়ে ভালো ফল পান। নতুন পাঠও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দ্রুত অগ্রসর হয়।

৯। ইহা শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে পাঠে মনোযোগী ও সক্রিয় করে তোলে।

১০। ইহা শ্রেণীর একঘেয়েমি দূর করতে বিশেষ সহায়তা করে। অমনোযোগী ছাত্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে শিক্ষক ইহাকে ব্যবহার করেন।

১১। শ্রেণীর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইহা খুব ফলদায়ক।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গণিত-শিক্ষক

[Teacher of Mathematics]

প্রাচীনকালে শিক্ষকের বিষয়বস্তুর উপর ব্যুৎপত্তি থাকলেই চলত। পাণ্ডিত্যের দ্বারা শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার করা হত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব খুব বেশী। শিক্ষকের শুধু বিষয়ের উপর দখল থাকলেই চলবে না, তাঁকে শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ করতে হবে। বস্তুতঃ বিষয়ের জ্ঞানের চেয়েও শিক্ষার্থীকে জানা, বোঝা শিক্ষকের অনেক বেশী দরকার। এর কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণার বিরাট পরিবর্তন। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর অন্তর্জাত ক্ষমতাগুলিকে বিকশিত করা এবং তার জন্মগত প্রবণতাগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করা। শিক্ষার এই মূল উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার দায়িত্ব শিক্ষকের। গণিত শিক্ষকের উপর এই দায়িত্ব খুব বেশী। গণিত-চর্চায় কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা আপনা থেকেই নিযুক্ত হয়। যেমন, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ, ধৈর্য ইত্যাদি। এছাড়া অনেকগুলি মানসিক ক্ষমতারও অনুশীলন হয়। যেমন, যুক্তিসম্মত চিন্তা করা, বিচার করা, বিমূর্ত চিন্তা করা প্রভৃতি। গণিতের শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গীতে নৈর্ব্যক্তিতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতাও প্রদান করে। কাজেই গণিত-শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিও সাধারণ শিক্ষার খুব নিকটবর্তী। গণিত-শিক্ষককেও তাই সকল সময় গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি স্মরণ রেখে শিক্ষা দিতে হবে।

শিক্ষকের কাছে ছাত্র, অভিভাবক ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ অনেক কিছুই প্রত্যাশা করেন। সমাজ শিক্ষককে একজন আদর্শ মানুষ হিসাবেই দেখতে চায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই ভুলে যান যে শিক্ষকও সমাজের অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ। তাঁর ক্ষমতারও যেমন সীমা আছে তেমনই মানবিক দোষ-ত্রুটিও আছে। তিনি সর্বগুণান্বিত নন। তাঁর অতিমানবিক গুণ ও যোগ্যতা থাকবে আশা করলে নিরাশ হতে হবে। তবে তাঁর যা কাজ, সেই কাজের জন্য যে নিম্নতম বিশেষ যোগ্যতা ও বিশেষ গুণাবলী থাকা দরকার সেটুকু অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে আশা করব।

শিক্ষকের প্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য কাজ শিক্ষা দেওয়া এবং এ কাজে তাঁকে সফলতা অর্জন করতেই হবে। শিক্ষা দেওয়া মানে এমন নয় যে ছাত্রদের তথ্যমূলক জ্ঞানে পণ্ডিত অথবা তাদের পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের বিদ্যা দান করতে পারলেই শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হবে। তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, ভাবী কালের সুনাগরিক তৈরী করার ভার ন্যস্ত হয়েছে তাঁর উপর—মানব সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধারের দায়িত্ব তাঁর উপর। এ কাজের উপযুক্ত নিম্নতম যোগ্যতা ও গুণাবলী শিক্ষকের কাছে নিশ্চয়ই সমাজ আশা করবে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে জাতি গঠনের মত দায়িত্বপূর্ণ কাজের যোগ্যতা ও গুণাবলী সমন্বিত শিক্ষক খুব কমই পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবে যে কোন শিক্ষক একটু ধৈর্য, একটু অধ্যবসায় ও চেষ্টা থাকলেই এ কাজে সফল হতে পারেন। শিক্ষণ-প্রাপ্ত, উদ্যোগী, সহানুভূতিশীল ও শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন শিক্ষক মাত্রেই সুষ্ঠুভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। গণিত-শিক্ষককে সাফল্য অর্জন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে ঃ—

১। শিক্ষক ছাত্রকে জানতে সদা সচেষ্ট থাকবেন। তার চাহিদা, আগ্রহ, মানসিক বয়স, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্ষমতা, অতীত জ্ঞান, সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি সঠিক জ্ঞান অর্জন করবেন। এর জন্য মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা তাঁকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে হবে।

২। ছাত্রের গণিতে আগ্রহ সৃষ্টি করতে এবং উপলব্ধির ক্ষমতা বিকশিত করতে শিক্ষক সচেষ্ট থাকবেন।

৩। শিক্ষক ছাত্রের ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেবেন।

৪। শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে আবিষ্কারকের মনোভাব গড়ে তুলবেন। সে যাতে অন্যের সাহায্য ছাড়াই শিক্ষালাভ করতে শেখে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। প্রয়োজন মত সংকেত ও ইঙ্গিতের দ্বারা সাহায্য করবেন।

৫। দুর্বলতা নির্ণায়ক পরীক্ষা দ্বারা ছাত্রের গণিতে দুর্বলতার কারণ কি তা শিক্ষক খুঁজে বের করবেন এবং তার জন্য উপযুক্ত প্রতিকার ও প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। পূর্বাভাসমূলক পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রকে সঠিক পথে চালিত করবেন।

৬। শিক্ষক ছাত্রদের কাছে খুব বেশী বা খুব কম আশা করবেন না।

৭। শিক্ষক পাঠক্রমকে কাঠিন্য অনুসারে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে পাঠ দান করবেন। অংশগুলি যেন ধারাবাহিক হয়। পাঠক্রমকে মনোবিজ্ঞনসম্মত-ভাবে ছাত্র-অনুগামী করে, তিনি প্রয়োজন হলে পুনর্বিন্যাস, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করে নেবেন।

৮। শিক্ষক বক্তৃতা-পদ্ধতিতে পড়াবেন না। সংকেত, ইঙ্গিত, কখনও একটু সাহায্য করে ছাত্রদের স্বাবলম্বনের দ্বারা শিখতে তিনি অনুপ্রাণিত করবেন।

৯। মনোবিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত পদ্ধতি শিক্ষক অবলম্বন করবেন। সকল শ্রেণীতেই এক পদ্ধতিতে পড়াবেন না। পদ্ধতিটি নির্ভর করবে ছাত্রদের মানসিক বয়সের উপর।

১০। শিক্ষক গণিতের সমস্যাগুলিকে বাস্তব ও ছাত্রের জীবনভিত্তিক করতে সচেষ্ট থাকবেন।

১১। গণিতে অনুশীলনের বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু ছাত্রকে অনুশীলন করানোর আগে শিক্ষক নিশ্চিত হবেন যে সমস্যা ও তার সমাধানের প্রতিটি ধাপ ছাত্র সঠিক হৃদয়ঙ্গম করেছে।

১২। কোন নতুন পাঠ গৃহ-কাজ হিসাবে শিক্ষক দেবেন না। অর্জিত জ্ঞানের শুধু অনুশীলনের উদ্দেশ্যেই গৃহ-কাজ থাকবে। গৃহ-কাজের সমস্যাগুলি এমনভাবে শিক্ষক নির্বাচন করবেন যেন শ্রেণীর সবচেয়ে কম বুদ্ধিমান ছাত্রও গৃহ-কাজ করতে আগ্রহ বোধ করে। গৃহ-কাজ অল্প হবে।

১৩। প্রস্তুত না হয়ে শিক্ষক শ্রেণীতে যাবেন না।

১৪। যে কোন বিষয়বস্তু পড়ানোর সময় শিক্ষক বিষয়বস্তুটি শেখানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন।

গণিত-শিক্ষকের যে সমস্ত গুণাবলী থাকা একান্ত দরকার, সেগুলি সম্বন্ধে এখন আমরা কিছু কিছু আলোচনা করব।

গুণাবলী ঃ

১। শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান গুণ হবে—তাঁর গণিত বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতা থাকবে। বিষয়ের সম্পূর্ণ দখল না থাকলে এবং গণিতের নানাবিধ বাস্তব ব্যবহারের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে শিক্ষকের পাঠদান সফল হবে না। শিক্ষণ-পদ্ধতিগুলির সঙ্গেও তিনি পরিচিত থাকবেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির উপর তিনি নির্ভরশীল হবেন না। এ বিষয়ে তাঁর কোন গোঁড়ামি থাকলে চলবে না। যে পদ্ধতিতে পড়ালে ছাত্রেরা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবে, সে পদ্ধতিটি আবিষ্কার করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে।

২। গণিত-শিক্ষক বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তি থাকবে যাতে ছাত্রদের আগ্রহশীল করার জন্য তিনি প্রয়োজন মত নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেন।

৩। ছাত্রদের বুঝবার ও চালনা করার মত মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান তাঁর থাকবে।

৪। শিক্ষকের যুক্তি-সহকারে ও সুসম্বদ্ধভাবে পাঠদানের যোগ্যতা থাকবে। তিনি যথাযথ ও নির্ভুলভাবে কাজ করতে সক্ষম হবেন। প্রতি স্তরেই যুক্তির আশ্রয় নিয়ে পাঠদান করার ক্ষমতা রাখবেন। কোন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাবেন না—বিশেষজ্ঞের মতের দোহাই দিয়ে।

৫। গণিত-শিক্ষক নিরপেক্ষ হবেন। বিশেষ বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ মনোভাব তিনি পোষণ করবেন না এবং পরীক্ষায় নম্বর দানে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হবেন।

৬। জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকবে। গণিত দৈনন্দিন জীবনে আজীবন মানুষের প্রয়োজনে লাগে। বিষয়টি জীবন্ত করে তুলতে হলে এ জ্ঞান থাকা অবশ্যই তাঁর দরকার।

৭। তিনি বিভিন্ন বিষয়, গণিতের বিভিন্ন শাখা ও জীবনের সঙ্গে অনুবন্ধ-প্রণালীতে পাঠ দানে সক্ষম হবেন।

৮। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার হবে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল। তিনি হবেন তাঁদের একজন বয়স্ক বন্ধু। তাঁর অভিজ্ঞতা তারা কাজে ব্যবহার করবে।

৯। গণিত-শিক্ষক বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন হবেন। তাঁর মধ্যে আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে। নতুন নতুন বিষয় ও পদ্ধতি তিনি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবেন।

১০। তিনি বেশ খোলা মনের লোক হবেন। ছাত্রদের কাছে নিজের ভুল স্বীকার করতে কখনও দ্বিধা করবেন না।

১১। শিক্ষক বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে পড়াতে সক্ষম হবেন।

১২। ছাত্রদের গণিতে আগ্রহশীল করতে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার, সেগুলি তাঁর থাকা চাই।

১৩। শিক্ষক সৎ, নিষ্ঠাবান ও আত্মবিশ্বাসী হবেন।

১৪। তিনি ধৈর্যশীল ও চরিত্রবান হবেন। তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণ থাকা চাই।

১৫। তাঁর হস্তাক্ষর সুন্দর ও স্পষ্ট হবে।

১৬। তাঁর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও উচ্চ হবে। তাঁর বাচনভঙ্গী হবে সংযত।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ বিষয়

[Miscellaneous]

গণিতের পাঠাগার (Mathematical Library) :

গণিত শিক্ষণ ও শিক্ষায় গণিতের পাঠাগারের ভূমিকা আজ সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের ক্ষেত্রেই পাঠাগার অপরিহার্য। গণিত বিষয়টিই এমন যা ছাত্রদের আকৃষ্ট করে না। বিষয়টি বিমূর্ত এবং ইহার ভাষা প্রতীকমূলক ; লক্ষ্য—যুক্তিসম্মত চিন্তা করতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া। ইহার আগা-গোড়া সব কিছু বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ। চঞ্চলমতি শিশুদের আকর্ষণ করার মত কিছুই এখানে পাওয়া যায় না। বিষয়টিতে শিশুদের আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষকের যেমন নিরলস প্রস্তুতি দরকার তেমনি দরকার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যা সাধারণ ছাত্রদের বিষয়টিতে আকৃষ্ট করবে। শ্রেণীতে কিছুসংখ্যক বুদ্ধিমান ছাত্রও থাকে। তারা সহজেই গণিতের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে এবং বিষয়টি ভালো করে শিখতে আগ্রহী হয়। এই সব অগ্রসর ছাত্রদের গণিত সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধিৎসা জন্মায় ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। গণিতের পাঠাগারই এই ত্রিবিধ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

শিক্ষকের দরকার গণিতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয়, শিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ছাত্রদের বিষয়টিতে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী মাল-মশলা। অগ্রসর ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্য চাই পরিপূরক ব্যবস্থা এবং আরো অগ্রসর হবার খোরাক। আর সাধারণ ছাত্রদের দরকার এমন একটা পরিবেশ যেখানে গণিত বিষয়টিতে আকৃষ্ট হবার যথেষ্ট উপাদান থাকবে। গণিতের পাঠাগার ছাড়া এই প্রয়োজনগুলি মেটে না।

গণিতের পাঠাগারের তিনটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাকা দরকার। প্রথমটি শিক্ষকদের জন্য, দ্বিতীয়টি অগ্রসর ছাত্রদের জন্য এবং তৃতীয়টি সাধারণ ছাত্রদের জন্য।

শিক্ষকদের বিভাগ থাকবে নানা রকম প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক বই, গণিতের ইতিহাস সম্বন্ধে বই, আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বই, গণিত বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা। সেমিনার রিপোর্ট প্রভৃতি এবং চিত্তবিনোদনমূলক বই।

অগ্রসর ছাত্রদের বিভাগে থাকবে পাঠ্য পুস্তক এবং নানা প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক বই (যা সাধারণ ছাত্রদের উপযোগী নয়)। প্রত্যেকটি শ্রেণীর অগ্রসর ছাত্রদের জন্য এই সমস্ত বই যত্নের সঙ্গে নির্বাচন করতে হবে।

সাধারণ ছাত্রদের বিভাগের বই নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী যত্ন নেওয়া দরকার। ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারে এমন বই যথেষ্ট রাখতে হবে। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বই দরকার। সবচেয়ে নীচু শ্রেণীর ছাত্রকেও আকর্ষণ করতে হবে আবার

সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীর ছাত্রকেও খুসী করতে হবে। এ কাজ খুব সোজা নয়। ছোট ছেলেদের উপযোগী বই অবশ্য পাওয়া যেতে পারে। বই নির্বাচনের সময় মনে রাখতে হবে যে প্রধানত তিনটি কারণে একজন সাধারণ ছাত্র গণিতের পাঠাগারে আসতে পারে। পাঠাগারে

ক। এমন গণিতের বই আছে যা নিজেই তাকে আকর্ষণ করে।

খ। এমন বই আছে যা তাকে গণিত শিক্ষায় সাহায্য করে বা তার বিশেষ শখ (hobby) মেটায়।

গ। এমন বই আছে যা তার শিক্ষার মান উন্নত করে।

এই নীতিগুলি মনে রেখে সাধারণ বিভাগটির আরো কয়েকটি উপবিভাগ করা প্রশস্ত। যেমন—

১। ইতিহাস: ছাত্রের পাঠাগারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় এই উপবিভাগের মাধ্যমে হতে পারে। এখানে সকল শ্রেণীর ছাত্রের উপযোগী গণিতের ইতিহাসের বই। স্বদেশ ও বিদেশের প্রখ্যাত গণিতবিদদের জীবনী থাকবে।

২। ধাঁধার এবং কৌতূহলোদ্দীপক ও মনোরঞ্জক বই: অনেক ছাত্রই গণিতের এই জাতীয় বইয়ে আকৃষ্ট হয় এবং এগুলির মাধ্যমেই ধীরে ধীরে গণিত বিষয়কে ভালোবাসতে শেখে। তা ছাড়া এগুলি পরবর্তী কালে বেশ উপভোগও করে।

৩। জ্যোতির্বিজ্ঞান: গণিতের পাঠক্রমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্থান নেই। বিদ্যালয়ে গণিতের শ্রেণীতে প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে উল্লেখ করার মাঝে মাঝে সুযোগ হয়। শিক্ষক এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে ছাত্রদের এ বিষয়ে ঔৎসুক্য হবে এবং তারা নিজেরাই আরো জানতে আগ্রহী হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর সকল স্তরের ছাত্রের উপযোগী অনেক জনপ্রিয় বই আছে।

৪। গণিতের বিষয়বস্তুকে জনপ্রিয় করে লেখা বই: এই জাতীয় বই ছাত্রদের গণিতে কৌতূহল ও আগ্রহের উদ্রেক করে।

৫। অন্যান্য বিষয়, বৃত্তি বা বিশেষ শখের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত গণিতের বই: এই জাতায় বই গণিতের বাস্তব মূল্য সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করে।

৬। ইংরাজী ভাষায় লিখিত বই: সহজ ভাষায় ইংরাজীতে অনেক ভালো ভালো বই আছে। উল্লিখিত সকল উপবিভাগেরই বই ইংরাজী ভাষায় পাওয়া যায়। এগুলি রাখা দরকার।

৭। পাঠ্য পুস্তক: গরীব ছাত্রদের জন্য কিছু সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক রাখা উচিত।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি উপবিভগের প্রত্যেকটি বইয়ের একাধিক কপি রাখা দরকার।

গণিতের পাঠাগারে উল্লিখিতভাবে বই সাজিয়ে রাখলেও পাঠাগার ব্যবহারে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষক সচেষ্ট না হলে পাঠাগারটি অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা গণিতের পাঠাগারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না। তা'ছাড়া সুপরিচালনায় গণিতের পাঠাগার ব্যবহার না করলে ছাত্র এমন বই প্রথম দিকে নিতে পারে যা সে নাও বুঝতে পারে। ফলে সে পাঠাগার ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত

হবে। পাঠাগার ব্যবহারে ছাত্ররা যাতে উৎসাহিত হয় সে বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে—

১। শ্রেণী-শিক্ষণের সময় শিক্ষক পাঠাগার সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন এবং মাঝে মাঝে তার উল্লেখ করবেন। বিদ্যালয়ের সবচেয়ে নীচু শ্রেণীর ছাত্রও যেন ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে। কোন বিখ্যাত গণিতজ্ঞের বিষয় বা গণিতের কোন আকর্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করার সময় শিক্ষক পাঠাগার থেকে কোন বই নিয়ে তার প্রয়োজনীয় অংশ পাঠ করতে পারেন।

২। শ্রেণী ও মেধা অনুসারে পাঠাগার থেকে বই নিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের পড়তে দিতে পারেন।

৩। শ্রেণীতে আলোচিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বইয়ের পরিচ্ছেদগুলির উল্লেখ করতে পারেন।

৪। সকল শ্রেণীতেই বিস্তৃত পটভূমিকায় শিক্ষক গণিতের পাঠ দিতে পারেন। ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গণিতের যোগটি সুপরিস্ফুট করা দরকার।

৫। পাঠাগারের জন্য যখনই গণিতের কোন নতুন বই কেনা হবে, তখনই তা নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপিত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ছোট নোট দিলে ভালো হয়।

৬। সপ্তাহে অন্তত একটি পিরিয়ড গণিতের পাঠাগারে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পঠন হওয়া দরকার।

গণিতের পাঠাগার সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনা করলুম তা থেকে এটা বেশ পরিষ্কার হয় যে, গণিতের একটি স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকা উচিত। সাধারণ পাঠাগারের সঙ্গে একত্রে এই পাঠাগার রাখা উচিত নয়। পাঠাগারটি হবে আলো বাতাস যুক্ত এবং একটু নিরিবিলি। পাঠাগারের দেওয়ালে বিখ্যাত গণিতবিদ্‌দের ছবি টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে। নানারূপ আকর্ষণীয় চার্ট, মডেল, লেখচিত্র প্রভৃতি পাঠাগারে থাকবে। মোট কথা, পাঠাগারের পরিবেশটি যেন ছাত্রদের গণিতে আকর্ষণ করে। পাঠাগারের পরিচালনা যোগ্য ব্যক্তির হাতে থাকা দরকার। পরিচালকের যেন গণিতে যথেষ্ট জ্ঞান থাকে, যাতে ছাত্রদের গণিতের যে যে বিষয়বস্তুতে আগ্রহ, সেই সেই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন কোন বই ভালো এবং শ্রেণী অনুযায়ী উপযুক্ত তা' তিনি তাদের বলে দিতে পারেন। তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন যেন গণিতের পাঠাগারে গোলমাল না হয় এবং ছাত্ররা এখানে গল্প-গুজব না ক'রে।

পরিশেষে বক্তব্য যে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক কারণে বহু বিদ্যালয়েই স্বতন্ত্র গণিতের পাঠাগার করা সম্ভব নয়। সে স্থলে সাধারণ পাঠাগারেই গণিতের বিভাগটি আলাদা করা দরকার এবং বিভাগটি যতদূর সম্ভব উল্লিখিতভাবে সাজানো উচিত।

গণিতের পরীক্ষাগার (Mathematical Laboratory)

আমাদের দেশে কোন বিদ্যালয়ে গণিতের পরীক্ষাগার আছে কি না সন্দেহ আছে। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের জন্য পরীক্ষাগার আছে —এগুলি বিদ্যালয়ে না থাকলে ঐ সব বিষয় পড়াবার অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে সেকেণ্ডারী বোর্ডের এমন কোন দাবী নেই। কারণ গণিতের সত্যগুলি পরীক্ষালব্ধ নয়। কিন্তু গণিতেও পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। আমরা সেগুলি আলোচনা করব।

গণিত একটি বিমূর্ত বিষয়। আধুনিক শিক্ষায় শিশুদের সঠিক ধারণা করতে সাহায্য করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিশুরা বিমূর্ত ধারণা করতে পারে না। তারা পরিবেশের মূর্ত বস্তুগুলি বুঝতে পারে। তাই নানা রকম মূর্ত বস্তু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা তাদের ধারণা স্পষ্ট করা দরকার। এতে গণিতের বিষয়বস্তুকে তারা যেমন ঠিক মত হৃদয়ঙ্গম করবে তেমনি তাদের গণিতের জ্ঞান যথার্থ ও দৃঢ় হবে।

শিশুরা কাজের মধ্য দিয়েই শেখে। হাতে কলমে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা বিষয়গত নানা সমাধান করে বিষয়টি যথার্থ উপলব্ধি করতে পারে।

গণিতের বিমূর্ত তথ্যগুলির সত্যতা সম্বন্ধে ছাত্ররা দৃঢ় প্রত্যয় হবে যদি তারা পরীক্ষা করে, মূর্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে সেগুলি সত্য বলে দেখতে পায়।

শিশুরা কিছু করতে আনন্দ পায়। হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখতে তারা ভাল বাসে। এই সব কাজের ভিতর দিয়ে তারা তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হয়।

গণিতের পরীক্ষামূলক কাজের ভিতর দিয়ে শিশুরা গণিতের বাস্তব মূল্যও বুঝতে পারে। এই বিমূর্ত বিষয়টির সঙ্গে বাস্তবের যোগ তারা দেখতে পায়। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিষয়টির যোগসূত্রটি তারা বুঝতে পারে। গণিত শিক্ষণে প্রথম স্তর থেকেই বাস্তব জীবনের পরীক্ষামূলক কাজে শিশুদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। তা না হলে গণিতকে তারা কতকগুলি বিশেষ ধরনের সমস্যা সমাধানের কৌশল বলে ভাবতে শিখবে। একবার এ ধারণা বদ্ধমূল হলে তাকে ভাঙ্গা শক্ত হবে।

শিশুর আগ্রহ ও মনোযোগ বজায় রাখতে পরীক্ষমূলক কাজের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার চেয়ে এ কাজে শিশুর ক্ষমতাগুলি বেশী প্রয়োগ করতে হয়। তা' ছাড়া পরীক্ষার কাজে সময় বেশী লাগে বলে বিষয়টি মনে অনেকক্ষণ স্থায়ী স্থান গ্রহণ করে থাকে। এর ফলে তারা বিষয়টি আরো ভালো করে বোঝে ও জ্ঞান স্থায়ী হয়।

পরীক্ষামূলক কাজের ভিতর দিয়ে শিশুরা গণিতের তথ্যগুলি পুনরাবিষ্কার করে। এটা আবিষ্কারক মূলক পদ্ধতির বাস্তব দিক। এতে তারা আবিষ্কারের আনন্দ পায়। ফলে নতুন নতুন পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়।

বিদ্যালয়ে গণিতের শাখাগুলিকে পৃথক পৃথক বিষয় রূপেই পড়ানো হয়। শাখাগুলির মধ্যে এতে অনুবন্ধ ঘটে না। পরীক্ষামূলক কাজে তারা শাখগুলির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পায়।

আমরা পরীক্ষাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। তার মানে এ নয় যে, গণিতে শ্রেণী-শিক্ষণের দরকার নেই। পরীক্ষাগার শ্রেণী শিক্ষণের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। ইহা শ্রেণী-শিক্ষণের পরিপূরক মাত্র—শ্রেণী শিক্ষণকে পূর্ণতা দান করে।

গণিতে শ্রেণী-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অসামান্য। এখানেই ছাত্রদের বিমূর্ত ধারণা রূপ নেয়। এখানেই তারা সাধারণ বস্তুগুলির গাণিতিক গুরুত্ব ও অর্থ বুঝতে সমর্থ হয়। এখানেই তারা বস্তু নিরপেক্ষ যুক্তি করতে শেখে। এখানেই তাদের কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে। গণিত শিক্ষণের যা প্রকৃত লক্ষ্য তা হচ্ছে যুক্তিসম্মত চিন্তা করার ক্ষমতাকে বিকশিত করা। এই লক্ষ্যের দিকে ছাত্রদের এগিয়ে দেওয়া শ্রেণী কক্ষেই সম্ভব। সেইজন্য যে সমস্ত ধারণাগুলি শ্রেণী কক্ষে সঠিক ভাবে দেওয়া সম্ভব নয়—সেগুলির জন্যই পরীক্ষাগারের সাহায্য নিতে হবে।

পরীক্ষাগারে কাজের সময় শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ছাত্ররা না ধারণা করে যে গণিতের সত্যগুলি পরিমাপের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরীক্ষাগারের পরিচালক হবেন শিক্ষক। অল্প বয়সের ছাত্রদের পক্ষে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করে কোন সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। শিক্ষক সর্বদাই তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। তা না হলে পরীক্ষা কার্য উদ্দেশ্যবিহীন খেলায় পরিণত হবে।

গণিতের পরীক্ষাগারে যে সমস্ত জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি থাকা দরকার তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল।

সুতো, দড়ি, মোম, টেপ, সুচ, পিন, শিরীষ, কাগজ, স্ক্রু, স্ক্রু-ড্রাইভার, লেবেল, দেশলাই, কার্ডবোর্ড, কাঁচি, রং, ছিপি, তার, তুলো, লিভার, পুলি, কীলক, গ্রাফ কাগজ, বিভিন্ন চার্ট, মডেল, গোলক, ঘনক, প্রিসম, শঙ্কু, সিলিণ্ডার, তুলাদণ্ড ও ওজন, ব্ল্যাক বোর্ড এবং *Sextant, Barometer, Thermometer, cross-staff, Angle Mirror, Plain Table, Hypsometer, Clinometer, Level, Transit, Slide rule Pantographs, Verniers, Calculating machine etc.*

পরীক্ষাগারের বহু জিনিস ও যন্ত্রপাতি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহায্যে বিদ্যালয়েই তৈরী করে নেওয়া সম্ভব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাটীগণিত-শিক্ষণ

[Teaching of Arithmetic]

পাটীগণিত-শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ঃ

গণিত-শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যগুলি যা, পাঠীগণিত ও গণিতের বিভিন্ন শাখার শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যগুলিও তাই। সেগুলি প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। আমরা সেগুলি আর পুনরাবৃত্তি করব না। (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)

পাটীগণিত-শিক্ষণের কতকগুলি বিশেষ লক্ষ্য আছে। ঐ লক্ষ্যগুলির বিষয় সর্বদা স্মরণ রেখে শিক্ষক পাটীগণিত-শিক্ষণে ব্রতী হবেন। J. W. Young-এর মতে, এই লক্ষ্যগুলি নিম্নোক্ত পাঁচটি ঃ

পাটীগণিত-শিক্ষণের বিশেষ লক্ষ্য ঃ

ক। গাণিতিক চিন্তাধারায় শিক্ষিত করা (To teach the child the mathematical type of thought) ঃ—গণিতের বিশেষ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করা এবং দক্ষতার সঙ্গে এবং সাবলীলভাবে তা ব্যবহার করতে শেখান গণিত-শিক্ষণের প্রাথমিক লক্ষ্য। পাটীগণিত-শিক্ষণেরও লক্ষ্য তাই। কিন্তু পাটীগণিত শিক্ষণের শিক্ষণ-পদ্ধতি ও প্রণালীর দিক দিয়ে যথেষ্ট তারতম্য আছে। শিক্ষণ-পদ্ধতি ও প্রণালী হবে অপরিণত ও দ্রুত বর্ধমান শিশুমনের উপযোগী।

পাটীগণিতে প্রধানতঃ কতকগুলি সরল প্রক্রিয়া শেখানো হয় এবং সেগুলির ব্যাপক অভ্যাস করানো হয় যাতে শিশু দ্রুত ও নির্ভুলভাবে তাদের ব্যবহার করতে পারে—এ কথা সত্য। কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে বিষয়টি শেখানোর মূল লক্ষ্যের কথা ভুলে গেলে চলবে না।

পাটীগণিতে তিনটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা লক্ষণীয়—

১। সমস্যাগুলি উপলব্ধি করা।

২। সেগুলির অন্তর্নিহিত বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা বা সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা।

৩। অনুসিদ্ধান্তের সাহায্যে ধাপে ধাপে সঠিক সমাধানে উপনীত হওয়া।

খ। ভৌত পরিবেশের পরিমাণগত দিকে আগ্রহী করা (To arouse his interest in the quantitative side of the world around him) ঃ—পাটীগণিতে শিশুর আগ্রহ উদ্দীপিত করতে হলে, পাটীগণিতের সমস্যাগুলি যেন শিশুর কর্মতৎপরতা (activity) থেকেই উদ্ভূত হয় অথবা তাদের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত হয়। শিশু তার পরিবেশকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তা থেকে যেভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে

সমস্যাগুলি যেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, "বিমূর্ত সংখ্যা বলে কিছু নেই; সংখ্যামাত্রই মূর্ত বস্তুর সংখ্যা।" এ বিষয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে একমত না হয়েও বলতে পারি শিশুর জগতে বিমূর্ত সংখ্যা বলে কিছু নেই। সে মূর্ত বস্তু থেকে সংখ্যাকে অভিন্ন করে দেখতে পারে না। সুতরাং পাটীগণিতে শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে, শিশু বাস্তব জীবনকে যেভাবে দেখে তার সঙ্গে পাটীগণিতকে সম্বন্ধযুক্ত করতে হবে। সমস্যাগুলি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে তৈরী করতে হবে। বাস্তবে সে যা কিছু দেখে, যা কিছু বুঝতে পারে এবং যা কিছু তার ক্রিয়াকলাপের অঙ্গীভূত, সমস্যাগুলির মধ্যে সেগুলি যেন প্রতিভাত হয়।

গ। দ্রুত, সাবলীল ও নির্ভুল গণনা করতে শিক্ষা দেওয়া (To give accuracy and facility in simple computation):—বাস্তব প্রয়োজনের জন্য দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সরল গণনা করার ক্ষমতা অর্জন করা দরকার এবং এর জন্য শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট অনুশীলন করানো (drill) দরকার। খুব সরল ও সহজ যৌগিকের মাধ্যমেই প্রথমে অনুশীলন করাতে হবে। সরল যৌগিকগুলি ভালোভাবে করতে পারলেই জটিল যৌগিক অনুশীলন করানো যাবে।

পাটীগণিতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হলেই কিছু না কিছু অনুশীলন আপনা থেকেই হয়। সুতরাং অনুশীলনের জন্য যে সমস্ত সমস্যা দেওয়া হবে, সেগুলি চিত্তাকর্ষক হবে না বা বিমূর্ত হবে এমন ধারণা করা ভুল। কোন সমস্যারই মুখ্য উদ্দেশ্য 'অনুশীলন করা' নয়। সমস্যাগুলি শিশুর নিকট চিত্তাকর্ষক করতে হবে। অনুশীলন আপনা থেকেই হবে।

ঘ। বাস্তব জীবনে পাটীগণিতের জ্ঞান প্রয়োগ করতে শিক্ষা দেওয়া (To impart a working knowledge of a few practical applications of arithmetic):—শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বাস্তবজীবনে যা কিছু সমস্যা দেখা দেবে, সেগুলি আগে থেকে অনুমান করে, সমস্যাগুলির সমাধানে পাটীগণিতের জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ করা হবে—এরূপ শিক্ষা দেওয়া পাটীগণিতের বাস্তব প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্যটি হবে বাস্তব সমস্যার সমাধানে পাটীগণিতের জ্ঞান প্রয়োগ করবার ক্ষমতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা এবং দৈনন্দিন জীবনে পাটীগণিত যে অপরিহার্য তা বুঝিয়ে দেওয়া। অনেকগুলি বাস্তব প্রয়োগের উদাহরণ জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করার চেয়ে কয়েকটি প্রয়োগ ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে শিক্ষার্থীর ঢের বেশী উপকার হবে।

ঙ। উচ্চতর গণিত-শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত করা (To prepare the way for further mathematics):—যদিও অধিকাংশ ছাত্রই উচ্চতর গণিতের শিক্ষাগ্রহণ করে না, তবুও প্রত্যেককে তার যোগ্য করে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এতে যারা উচ্চতর গণিতের শিক্ষা নেবে তাদের তো উপকার হবেই, যারা ঐরূপ শিক্ষা নেবে না, তারাও পাটীগণিতের শিক্ষা ভালোভাবে পাবে।

পাটীগণিতের পাঠক্রম সংগঠনের মূলনীতি ঃ

পাঠক্রম রচনার দায়িত্ব যাঁদের উপর থাকবে, তাঁরা অবশ্যই নিম্নলিখিত মূলনীতি-গুলির দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রম রচনা করবেন।

১। পাটীগণিতের শিক্ষা একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া প্রতি স্তরেই এই কথা মনে রেখে পাঠক্রম পরিকল্পনা করতে হবে।

২। প্রতি স্তরের পাঠক্রমে বিষয়টির গাণিতিক ও সামাজিক—উভয় দিকের পূর্ণ সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৩। পাঠক্রমের বিষয় বস্তু নির্ণয়ের ভিত্তি হবে,—বিদ্যালয়ে ও তার বাহিরে, শিশুর ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনের বাস্তব চাহিদা।

৪। বিদ্যালয়ের অন্যান্য যাবতীয় কাজের সঙ্গে পাটীগণিতের কাজের নিকট সম্বন্ধ রাখতে হবে।

৫। যে সমস্ত সমস্যা শিশুর সামাজিক অবস্থা—বিশেষ করে আর্থিক সক্ষমতার উপর আলোকপাত করে সেগুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬। শিশুদের মধ্যে আগ্রহ, যোগ্যতা, চাহিদা ও শেখার ক্ষমতার দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে (সকল বয়স ও স্তরের মানুষের মধ্যেই এই পার্থক্য বর্তমান)। সেগুলির দিকে নজর রেখে প্রণালীবদ্ধভাবে পাঠ্য-সূচী রাখতে হবে, যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৭। শিশুর মানসিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রমকে এমনভাবে সংগঠন করতে হবে, যাতে পাঠ অনুসরণ করতে তার বিশেষ চাপ বা কষ্টবোধ না হয়।

পাটীগণিত শিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষকের মনে রাখা দরকার।

১। মৌলিক প্রক্রিয়াগুলি শেখানোর উদ্দেশ্য হবে—শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা-গুলিকে উন্নত করা। সুতরাং এমন পদ্ধতি শিক্ষককে অবলম্বন করতে হবে, যার দ্বারা সে সবচেয়ে দ্রুততা ও নির্ভুলতার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলি যেন যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। প্রতি স্তরেই সে যেন সেগুলি প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়েই প্রক্রিয়াগুলি শেখার কাজ অগ্রসর হবে।

২। বিনা প্রয়োজনে কোন নিয়ম শেখাবার দরকার নেই।

৩। যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে না এবং প্রয়োগের অভাবে শিশু ভুলে যাবে—এমন কিছু শেখাবার দরকার নেই।

৪। পরবর্তীকালে যা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত হবে, তাকে পূর্বেই বিশেষ নিয়ম বলে শেখাবার দরকার নেই।

৫। পাটীগণিতের সমস্ত কাজ যাতে প্রত্যেক ছাত্র নিজেই করে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। একজন ছাত্র বা শিক্ষক বোর্ডে করে দিলেই চলবে না। প্রত্যেক ছাত্রকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ভুল উত্তর করতে শিখতে হবে।

৬। ছাত্র প্রত্যেক অঙ্কটি যাতে নির্ভুলভাবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে করে তার উপর জোর দিতে হবে। যে সমস্ত গণনা মনে মনে করতে সে অক্ষম, খাতার যে পাতায় সমস্যাটির সমাধান সে করবে, সেই পাতায়ই পরিষ্কারভাবে সেগুলি করার শিক্ষা তাকে দিতে হবে। 'রাফ' কাজ মনে করে, অপরিষ্কার, অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ বা অবহেলাভরে যেন ঐ গণনার কাজগুলি সে না করে তা দেখতে হবে। এই কাজগুলি করার জন্য কোন আলাদা খোলা কাগজ ব্যবহার করতে শিক্ষক নিষেধ করবেন। এরূপ অভ্যাস অমনোযোগিতার জন্ম দেয়।

৭। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষক বার বার শেখাবেন এবং অভ্যাস করাবেন। কঠিন বিষয়গুলি বার বার বোঝাবেন।

৮। ছাত্ররা যখন শ্রেণীকাজ করবে, তখন শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন, তারা সঠিকভাবে কাজগুলি করছে কিনা।

৯। যে সকল বিষয় শিক্ষক শিক্ষাদান করেছেন, সেগুলি ছাত্ররা মনে রাখতে পারছে কিনা দেখার জন্য শিক্ষক মাঝে মাঝে তাদের পরীক্ষা করে দেখবেন।

পাটীগণিতের বিষয়বস্তু শিক্ষণ ঃ

সংখ্যাজ্ঞান ঃ—পাটীগণিতের ভিত্তি সংখ্যা। সামাজিক জীবনযাপনের মাধ্যমে সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা মানুষের আপনিই জন্মায়। সমাজে বাস করলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে এই জ্ঞানলাভ হয়। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোক—যে জীবনে কোন রূপ শিক্ষালাভের সুযোগ পায়নি—তারও সংখ্যার ধারণা আছে।

সে যাই হোক, সংখ্যার ধারণা কিন্তু খুব জটিল প্রক্রিয়া। শিশুকে এই ধারণা দেওয়া বেশ কঠিন কাজ। এই ধারণা লাভ করতে শিশুর যথেষ্ট সময় দরকার লাগে। সুতরাং এ ব্যাপারে শিক্ষকের ধৈর্যশীল হতে হবে। গণনা-পদ্ধতি আবিষ্কার করতে মানবসমাজের হাজার হাজার বৎসর সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই আবিষ্কারকে হৃদয়ঙ্গম করতে শিশুকে প্রয়োজনীয় সময় নিশ্চয়ই দিতে হবে।

সংখ্যার জটিল ধারণাটি কয়েকটি সরলতর ধারণার যৌগিক। সেগুলি—

১। সংখ্যা গণনা করা।

২। সংখ্যার প্রতীকগুলি চেনা ও উহাদের অনুরূপ সংখ্যাগুলির সঙ্গে অভিন্নরূপে ধারণা করা।

৩। শূন্যের ধারণা।

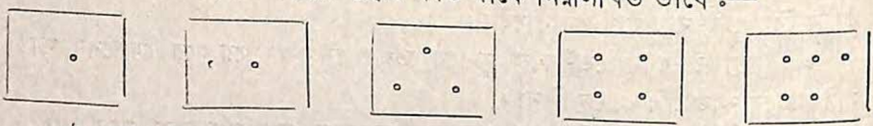
৪। সংখ্যার স্থানীয় মান।

১। সংখ্যা গণনা করা ঃ—গণনা করা মানে পরিবেশের পরিমাণগত দিকটি জানা। গুণতে চেষ্টা করা শিশুর সহজাত সংস্কার। সিঁড়ি দিয়ে উঠা নামার সময় সিঁড়ি গণনা প্রত্যেক শিশুই করে থাকে—এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। হাতে ছড়ি থাকলে বারাণ্ডার রেলিংগুলিকে আঘাত করে গণনা করতে শিশুকে প্রায়ই দেখা যায়।

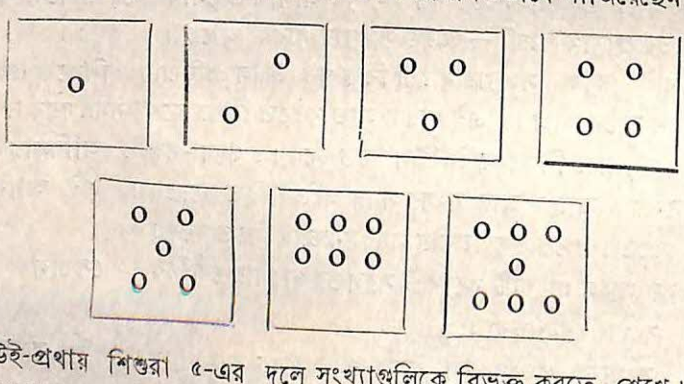
খেলাধূলা এবং ছড়ার মাধ্যমে শিশুকে সংখ্যা গণনা ভালোভাবেই শেখানো যায়। একত্রে আবৃত্তির দ্বারাও শেখানো যেতে পারে।

২। সংখ্যা প্রতীকগুলি চেনা ও উহাদের অনুরূপ সংখ্যাগুলির সঙ্গে অভিন্নরূপে ধারণা করা ঃ—পাটীগণিতের ভাষায় শব্দসম্পদ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯—এই নয়টি প্রতীক। এগুলি শেখাতে হবে প্রত্যেক প্রতীক ও অনুরূপ সংখ্যার মধ্যে একটা বন্ধন (bond) প্রতিষ্ঠা করে। যে কোন প্রতীকের সঙ্গে অনুরূপ সংখ্যক বস্তু বারবার একত্রে উপস্থাপন করলে এই বন্ধন সৃষ্ট হয়।

মণ্টেসরী প্রথায় বিভিন্ন ছোট ছোট কার্ড থাকে নিম্নলিখিত ভাবে ঃ—



এই কার্ডগুলির পিছনে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি প্রতীকগুলি লেখা থাকে। মনে করা যাক্, শিশুকে ৫নং কার্ড আনতে বলা হল। সে তখন পাঁচটি শূন্য চিহ্ন গণনা করে কার্ড তুলবে, পিছনের নম্বরটি দেখবে ও কার্ডটি নিয়ে আসবে। ৫ সংখ্যাটির সঙ্গে ৫ প্রতীকটির এইভাবে একটি বন্ধন সৃষ্টি হবে। চিহ্নগুলি বিন্যাসের এই পদ্ধতিতে শিশুরা অযুগ্ম ও যুগ্ম সংখ্যাও চিনতে পারে। কার্ডে চিহ্নগুলি নানারূপ দলে সাজানো যেতে পারে। ডিউই ৫-এর দলে চিহ্নগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজিয়েছেন ঃ—



ডিউই-প্রথায় শিশুরা ৫-এর দলে সংখ্যাগুলিকে বিভক্ত করতে শেখে। কিন্তু অযুগ্ম ও যুগ্ম সংখ্যার বিষয় জ্ঞানলাভ করে না।

৩। **শূন্যের ধারণা** ঃ—সংখ্যা-গণিতে শূন্যের ধারণা হিন্দুদের একটি বিশেষ অবদান। শিশুর মনে শূন্য সংখ্যাটির ধারণা দেওয়া খুব কঠিন। সংখ্যার স্থানীয় মান সম্বন্ধে ধারণাটি ঠিকমত অধিগত না হলে শিশু শূন্য সংখ্যাটি সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা করতে পারবে না। শূন্যের মূল্যমান দুটি—একটি সংখ্যাগত এবং দ্বিতীয়টি স্থানীয়-মানগত।

৪। **সংখ্যার স্থানীয় মান** ঃ—সমস্ত সংখ্যাকে প্রতীকের দ্বারা চিহ্নিত করতে হলে অসংখ্য প্রতীকের দরকার। ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই বড় বড়

সংখ্যাকে প্রতীকের দ্বারা প্রকাশ করার জন্য সংখ্যাগুলি দলবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু খুব বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিও মোটেই সুবিধাজনক নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বেশ জটিলতা দেখা দেয়। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ০, ১, ২, ৩,......৯—এই দশটি প্রতীকের সাহায্যে যে কোন বৃহৎ সংখ্যাকে প্রকাশ করার পদ্ধতিটি আবিষ্কারের কৃতিত্বও হিন্দুদের। এই পদ্ধতিতে ঐ দশটি প্রতীকের সংখ্যাগত মান ছাড়াও স্থানগত মান কল্পনা করা হয়েছে। যে কোন প্রতীক ডান থেকে বাম দিকে সরে বসলেই তার মান পরবর্তী ডান স্থানে অবস্থানের জন্য যে মান ছিল তার দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। কাজেই ডান থেকে বাম দিকে সংখ্যাটির বিভিন্ন অবস্থাকে যথাক্রমে বলা হয় একক, দশক, শতক, সহস্রক প্রভৃতির স্থান। এইভাবে হিন্দুরা যে কোন বৃহৎ সংখ্যাকে দশটি প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই আবিষ্কার গণিতের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। হিন্দুদের নিকট হতে আরবীয়গণ এই গণনা-পদ্ধতি শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁদের মাধ্যমেই সারা পৃথিবীতে এই গণনা-পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক যুগে সমগ্র জগতে ইহাই একমাত্র সংখ্যা-গণনা পদ্ধতিরূপে অনুসৃত হচ্ছে। সংখ্যালিখন পদ্ধতি নিম্নলিখিত-ভাবে শেখানো যেতে পারে।

	সহস্রক	শতক	দশক	একক
	৭	৫	১	৩
		২	৯	৭
	৪	০	২	৪

ছাত্রদের উপরিলিখিত ছকটি কাটতে বলা হবে। তারপর যে কোন একটি সংখ্যা 'সাত হাজার পাঁচ শত তের' মুখে বলে বা বোর্ডে ভাষায় লিখে ছাত্রদের সহস্রকের খোপে সহস্রক সংখ্যা, শতকের খোপে শতক সংখ্যা, দশকের খোপে দশক সংখ্যা এবং এককের খোপে একক সংখ্যা লিখে পূরণ করতে বলা হবে। এইভাবে তাদের বারবার লেখা অভ্যাস করাতে হবে। যখন কোন খোপে বসাবার সংখ্যা থাকবে না, তখন সেখানে ০ বসাতে হবে। যেমন চার হাজার চব্বিশ সংখ্যাটিতে শতক খোপের কোন সংখ্যা নেই। সুতরাং শতকের খোপে ০ বসেছে। এইভাবে যখন ছাত্রেরা লিখতে অভ্যস্ত হবে, তখন খোপগুলি তুলে দিয়ে অর্থাৎ বিনা ছকেই তারা সংখ্যা লেখা আয়ত্ত করবে, এবং সংখ্যার স্থানীয় মানের নীতিটি হৃদয়ঙ্গম করবে। ০ সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা তাদের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হবে। অবশ্য সংখ্যার স্থানীয় মান নীতিটি সঠিক উপলব্ধি করার জন্য শিশুদের যথেষ্ট সময় লাগবে। যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এই চারিটি প্রক্রিয়া (four rules) শিক্ষার মাধ্যমে এই জ্ঞান আরো পাকা হবে।

পাটীগণিতের চার নিয়ম ঃ

১। যোগ—যোগ পাটীগণিতে প্রথম সরল নিয়ম।

প্রাচীনকালে গণনায় যোগ-প্রক্রিয়া খুব তুরূহ ছিল। কারণ সংখ্যার স্থানীয় মান তত্ত্বটি তখন আবিষ্কৃত হয়নি।

তুই বা ততোধিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় প্রক্রিয়াই যোগ।

যোগ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় দক্ষতা লাভ করতে শিশুর বেশ সময় লাগে। প্রক্রিয়াটি শেখাবার সময় 'সহজ থেকে জটিল'(from simple to complex), 'জানা থেকে অজানা' (from known to unknown), মূর্ত থেকে বিমূর্ত' (from concrete to abstract)—শিক্ষণের এই নীতিবাক্যগুলি অনুসরণ করতে হবে। প্রথমে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত তুটি সংখ্যার (সরল সংখ্যা) যোগ শিশুদের আয়ত্ত করাতে হবে। প্রথম স্তরে মূর্ত বস্তুর সাহায্যে যোগ শেখাতে হবে। 'Abacus'-এর সাহায্যও লওয়া যেতে পারে। পরের স্তরে আসবে সরল সংখ্যার যোগ। মূর্ত বস্তুর সাহায্যে ২ আর ৩-এ ৫ আবার বিপরীতভাবে ৩ আর ২-এও ৫ হয়। এটা বারবার দেখিয়ে যোগফলের অপরিবর্তনীয় প্রকৃতিটি শিশুদের বোঝাতে হবে। সরল যোগে শিশুকে যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এইরূপ দক্ষতাকে মনোবিদ্‌গণ মৌলিক দক্ষতা বলেছেন। মৌলিক দক্ষতাগুলি অর্জিত হলেই যোগের জটিল দক্ষতাগুলি (তুই বা ততোধিক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার যোগ) শিশু আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে। মৌলিক দক্ষতা অর্জনের জন্য শিশুদের নিম্নলিখিত ৪৫-টি তথ্য প্রথমে আয়ত্ত করা দরকার।

$\begin{array}{c}1\\1\\\hline 2\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\2\\\hline 3\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\3\\\hline 4\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\4\\\hline 5\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\5\\\hline 6\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\6\\\hline 7\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\7\\\hline 8\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\8\\\hline 9\end{array}$	$\begin{array}{c}1\\9\\\hline 10\end{array}$
	$\begin{array}{c}2\\2\\\hline 4\end{array}$	$\begin{array}{c}2\\3\\\hline 5\end{array}$	$\begin{array}{c}2\\4\\\hline 6\end{array}$	$\begin{array}{c}2\\5\\\hline 7\end{array}$	$\begin{array}{c}2\\6\\\hline 8\end{array}$	$\begin{array}{c}2\\7\\\hline 9\end{array}$	$\begin{array}{c}2\\8\\\hline 10\end{array}$	$\begin{array}{c}2\\9\\\hline 11\end{array}$
		$\begin{array}{c}3\\3\\\hline 6\end{array}$	$\begin{array}{c}3\\4\\\hline 7\end{array}$	$\begin{array}{c}3\\5\\\hline 8\end{array}$	$\begin{array}{c}3\\6\\\hline 9\end{array}$	$\begin{array}{c}3\\7\\\hline 10\end{array}$	$\begin{array}{c}3\\8\\\hline 11\end{array}$	$\begin{array}{c}3\\9\\\hline 12\end{array}$
			$\begin{array}{c}4\\4\\\hline 8\end{array}$	$\begin{array}{c}4\\5\\\hline 9\end{array}$	$\begin{array}{c}4\\6\\\hline 10\end{array}$	$\begin{array}{c}4\\7\\\hline 11\end{array}$	$\begin{array}{c}4\\8\\\hline 12\end{array}$	$\begin{array}{c}4\\9\\\hline 13\end{array}$
				$\begin{array}{c}5\\5\\\hline 10\end{array}$	$\begin{array}{c}5\\6\\\hline 11\end{array}$	$\begin{array}{c}5\\7\\\hline 12\end{array}$	$\begin{array}{c}5\\8\\\hline 13\end{array}$	$\begin{array}{c}5\\9\\\hline 14\end{array}$
					$\begin{array}{c}6\\6\\\hline 12\end{array}$	$\begin{array}{c}6\\7\\\hline 13\end{array}$	$\begin{array}{c}6\\8\\\hline 14\end{array}$	$\begin{array}{c}6\\9\\\hline 15\end{array}$
						$\begin{array}{c}7\\7\\\hline 14\end{array}$	$\begin{array}{c}7\\8\\\hline 15\end{array}$	$\begin{array}{c}7\\9\\\hline 16\end{array}$
							$\begin{array}{c}8\\8\\\hline 16\end{array}$	$\begin{array}{c}8\\9\\\hline 17\end{array}$
								$\begin{array}{c}9\\9\\\hline 18\end{array}$

এই 45-টি তথ্যকে 45 প্রত্যক্ষ তথ্য (direct facts) বলে। শিশুরা যেন আঙুল গুণে যোগ করার অভ্যাস না করে। 2+5=7 কে উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া-রূপে শিশুরা আয়ত্ত করবে। 2+5 হবে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া হবে 7। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করাই মৌলিক দক্ষতা অর্জনের উপায়।

$$S \text{ ——— } R$$
$$2+5=7$$

এখন 5+2ও 7-এর সমান। কিন্তু 5+2 ও 2+5 দুটি ভিন্ন উদ্দীপক, যদিও উভয়েরই প্রতিক্রিয়া সমান। উদ্দীপকটি ভিন্ন হওয়ায় প্রতিক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে হবে না। সুতরাং বিপরীত তথ্যগুলিও শেখাতে হবে। বিপরীত তথ্যগুলি সংখ্যায় 36-টি। কারণ—1+1=2, 2+2=4, 3+3=6, 4+4=8, 5+5=10, 6+6=12, 7+7=14, 8+8=16 এবং 9+9=18, এই 9-টি তথ্য প্রত্যক্ষ তথ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। সেগুলি বাদ যাবে।

এ ছাড়া আরো 19-টি শূন্য তথ্য আছে। যেমন,

$\begin{array}{r}0\\0\\\hline 0\end{array}$ $\begin{array}{r}0\\1\\\hline 1\end{array}$ $\begin{array}{r}0\\2\\\hline 2\end{array}$ $\begin{array}{r}0\\3\\\hline 3\end{array}$ $\begin{array}{r}0\\4\\\hline 4\end{array}$ $\begin{array}{r}0\\5\\\hline 5\end{array}$ $\begin{array}{r}0\\6\\\hline 6\end{array}$ $\begin{array}{r}0\\7\\\hline 7\end{array}$ $\begin{array}{r}0\\8\\\hline 8\end{array}$ $\begin{array}{r}0\\9\\\hline 9\end{array}$ (10-টি প্রত্যক্ষ তথ্য)

$\begin{array}{r}1\\0\\\hline 1\end{array}$ $\begin{array}{r}2\\0\\\hline 2\end{array}$ $\begin{array}{r}3\\0\\\hline 3\end{array}$ $\begin{array}{r}4\\0\\\hline 4\end{array}$ $\begin{array}{r}5\\0\\\hline 5\end{array}$ $\begin{array}{r}6\\0\\\hline 6\end{array}$ $\begin{array}{r}7\\0\\\hline 7\end{array}$ $\begin{array}{r}8\\0\\\hline 8\end{array}$ $\begin{array}{r}9\\0\\\hline 9\end{array}$ (9-টি বিপরীত তথ্য)

উপরি-উক্ত 45-টি প্রত্যক্ষ ও 36-টি বিপরীত এবং 19-টি শূন্য তথ্য—মোট 100-টি তথ্য শিশুদের প্রথমে শিক্ষা দিতে হবে।

যোগ শেখানোর বিভিন্ন ধাপ ঃ

প্রথম ধাপ ঃ (ক) মূর্ত বস্তু গণনা করে যোগফল বের করতে বলা হবে। শিক্ষণ সহায় (Teaching aids)—পুঁথির মালা, Abacus, মার্বেল, বল প্রভৃতি। শিশুরা বিমূর্ত সংখ্যার ধারণা সহজে আয়ত্ত করতে পারে না। কাজেই মূর্ত বস্তুর সাহায্যে তাদের বিমূর্ত ধারণার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(খ) অর্ধ-মূর্ত বস্তুর সাহায্যে তথ্যগুলি শেখাতে হবে। যেমন 3-টি লাল ফুল ও 2-টি সাদা ফুল অঙ্কন করে বা তাদের ছবি দিয়ে, কটা ফুল আছে গুণতে বলা হবে। চিত্রের পরবর্তী স্তরে বিন্দু, রেখা, বৃত্ত প্রভৃতি রেখাচিত্রের সাহায্য নেওয়া হবে।

(গ) তথ্যগুলি যোগ-চিহ্নযুক্ত করে শেখাতে হবে। যেমন **2+3=5**। এতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার বন্ধনটি ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(ঘ) মৌখিক সমস্যায় তথ্যগুলি প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগ না করলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। সমস্যাগুলি যেন শিশুর জানা পরিবেশের উপযোগী হয়। তা না হলে সমাধানে শিশু আগ্রহী হবে না।

শিক্ষা-প্রণালীটি হবে 'মূর্ত থেকে অমূর্ত এবং পরে আবার মূর্ত' (from con-

crete to abstract and again to concrete)। সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে বলা যেতে পারে C→A→C।

দ্বিতীয় ধাপ : Wilson-এর মতে দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি সংখ্যার সরল স্তম্ভাকার যোগ (column addition) শেখাতে হবে। যোগফল যেন অনধিক 10 হয়।

যেমন—

```
  3
  1
  3
 ---
  7
```

অনধিক 10 যোগফল বিশিষ্ট তিনটি সংখ্যার দ্বারা মোট 120-টি তথ্য পাওয়া যায়।

তৃতীয় ধাপ : একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা এবং আর একটি এক অঙ্কের সংখ্যার যোগ। একক স্তম্ভের যোগফল অনধিক 10.

```
 25      12
  3       7
 ---     ---
 28      19
```

চতুর্থ ধাপ : দুটি দুই অঙ্কের সংখ্যার যোগ। উভয় স্তম্ভেই যোগফল অনধিক 10. যেমন,

```
 45      25
 32      14
 ---     ---
 77      39
```

পঞ্চম ধাপ : দুটি দুই অঙ্কের সংখ্যার যোগ। একক স্তম্ভের যোগফল 10-এর বেশী। যেমন,

```
 45
 37
 ---
 82
```

ষষ্ঠ ধাপ : দুটি দুই অঙ্কের সংখ্যার যোগ। দশকের স্তম্ভের যোগফল 10-এর বেশী। যেমন,

```
  47      58
  62      76
 ---     ---
 109     134
```

সপ্তম ধাপ : 0 ও ফাঁকসমেত জটিল যোগ। যেমন,

```
 539
  89
 203
  64
 ---
 895
```

যোগ শেখানোর নির্দিষ্ট ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম অবশ্য নেই। মনে রাখতে হবে শিক্ষণের নীতিটি হবে 'জানা থেকে অজানা'।

দ্রুত এবং নির্ভুল গণনার জন্য উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে তথ্যগুলি শিখতে হবে ছাত্রদের। সুতরাং আঙ্গুল গুণে গণনা করার রীতি তাদের পরিত্যাগ করতে হবে এবং যান্ত্রিক গণনার অভ্যাস গঠন করতে হবে।

যান্ত্রিক গণনা অভ্যাসের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এক স্তম্ভের একটি যোগ নেওয়া যাক।

6
5
9
6
7

গণনা করার সময় আঙ্গুল গণনা একেবারে চলবে না। 6 আর 5-এ 11, 11 আর 9-এ 20, 20 আর 6-এ 26, 26 আর 7-এ 33—এইভাবে যোগটি করার অভ্যাস করাও উচিত নয়। যোগটি করার নিয়ম সংখ্যাগুলি দেখে শুধু যোগফলগুলি শব্দ করে বলা। যেমন, 6 11 20 26 33. এইভাবে পর পর সংখ্যার যোগফল দ্রুত বলার অভ্যাস করতে হবে। কোন কিছু মনে রাখার দরকার নেই। 6-এর পর 11 বলার সঙ্গে সঙ্গে 6-এর কথা ভুলে যেতে হবে। 11-এর পর 20 বলার সঙ্গে সঙ্গে 11-এর কথা মনে রাখার দরকার নেই। শুধু দ্রুত যোগফলগুলি বলার অভ্যাস দরকার। দুই স্তম্ভের একটি যোগ নেওয়া যাক।

28
75
63
57
12
89
324

একক শব্দটির যোগ (উপর থেকে নীচে) 8 13 16 23 25 (3) 4 ;

সঙ্গে সঙ্গে 4টি লিখে দশকের স্তম্ভে হাতের 3 থেকে আরম্ভ করে উপর দিকে যোগ করতে হবে —11 12 17 23 30 32। অভ্যাস এমন ভাবে করতে হবে যেন পর পর যোগফলটি বলার সময় থামতে না হয়—কোন কিছু ভাবতে না হয়। কাজ হবে একেবারে যন্ত্রের মত।

২। বিয়োগ : একটি সংখ্যা থেকে আর একটি সংখ্যাকে বাদ দেওয়াকে বিয়োগ বলে। যে সংখ্যাটি থেকে বাদ দেওয়া হবে সেটি বড় (বিয়োজন) এবং বিয়োজ্য সংখ্যাটি ছোট হবে। ইহা যোগ প্রক্রিয়ার বিপরীত। বিয়োগও একটি জটিল প্রক্রিয়া। যোগেরই মত প্রথমে মূর্ত বস্তু ও তারপর অর্ধ-মূর্ত বস্তুর সাহায্যে বিয়োগ শেখাতে হবে। পরে শিশুর জানা পরিবেশ—সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে লব্ধ-জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে। বিয়োগ না করে, যোগের মাধ্যমে বিয়োগ করাই বিয়োগ শিক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায়। 9 থেকে 3 বিয়োগ করা মানে 3-এর সঙ্গে কত যোগ করলে 9 হবে?

বিয়োগে দক্ষতা অর্জন করতে হলে নিম্নলিখিত 100-টি মৌলিক তথ্য ছাত্রকে আয়ত্ত করতে হবে :—

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	মোট 10টি,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

প্রথম ধাপ : যোগে অনুসৃত C→ A→ C নীতি অনুসারে এই 100-টি মৌলিক তথ্য ছাত্রদের আয়ত্ত করাতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : ধার না করা সরল বিয়োগ। যেমন—

$$\begin{array}{r} 78 \\ 35 \\ \hline 43 \end{array}$$

আঙুল গুণে অঙ্ক কষলে চলবে না। শুধু মুখে মুখে বলে উত্তর লিখতে হবে : যথা 5, 3→8 ; 3, 4 →7.

তৃতীয় ধাপ :

প্রথম পদ্ধতি : বিয়োজ্যে কোন পরিবর্তন না করে, শুধু বিয়োজনে পরিবর্তন করে। যথা—

$$\begin{array}{l} 7\ 3=70+3\ =60+13=6\ 13 \\ 4\ 9=40+9\ =40+9\quad 4\ \ 9 \\ \hline \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad 2\ \ 4 \end{array}$$

এই পদ্ধতিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ধার করা-পদ্ধতি (Take away method), সরল ধার (Simple borrowing) বা পৃথকীকরণ (Decomposition)। এই পদ্ধতির প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীর কাছে বেশ বোধগম্য হয়। বিয়োজনের 70 থেকে 10 ধার করে 3-এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে এখানে। বিয়োজ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষার্থীর সমগ্র প্রক্রিয়াটি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : বিয়োজ্যকে পরিবর্তন করা। যথা—

$$\begin{array}{r} 7\,3 = 7\,13 \\ 4\,9 \quad\; 5\,9 \\ \hline 2\,4 \end{array}$$

পদ্ধতিটির বিভিন্ন নাম—ধার ও শোধ পদ্ধতি (Borrow and repayment method) এবং সমান যোগ পদ্ধতি (Equal addition method).

এই পদ্ধতি অবলম্বন করে যান্ত্রিকভাবে বিয়োগ করা যায়। কিন্তু সমগ্র প্রক্রিয়াটি ঠিক যুক্তিসম্মত নয়। বিয়োজন ও বিয়োজ্যের প্রত্যেকটির সহিত কেন 10 যোগ করা হল তা' শিশুদের ব্যাখ্যা করে বোঝান যাবে না। তবে পদ্ধতিটির সুবিধা হ'ল যে এটি তাড়াতাড়ি শেখা যায় এবং এইভাবে অঙ্কও দ্রুত করা যায়। প্রথম শিক্ষার্থী'র পক্ষে প্রথম পদ্ধতিই বেশী উপযোগী, কারণ উহা যুক্তিসম্মত। প্রথম পদ্ধতিটি শিক্ষার্থী শিখলে এবং ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করলে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তাকে শেখানো যেতে পারে যাতে সে দ্রুত যান্ত্রিকভাবে অঙ্ক কষতে পারে।

তৃতীয় পদ্ধতি : বিয়োগফলকে পরিবর্তন করা। যথা—

$$\begin{array}{r} 7\,3 \\ 4\,9 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7\,13 \\ 4\;\;9 \\ \hline 2\;\;4 \end{array}$$

এখানে বিয়োগফল থেকে 10 ধার করে বিয়োজনের 3 এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। বিয়োজনের দশক, শতক প্রভৃতি যে কোন স্থানে 0 শূন্য থাকলে এবং ঐ স্থান থেকে ধার করার দরকার হলে প্রথম পদ্ধতি অনুসারে অঙ্ক কষতে হলে ধাপটির ব্যাখ্যা করা যায় না। 0 থেকে 10 ধার করা অর্থহীন এবং অবাস্তব। এরূপ ক্ষেত্রে এই তৃতীয় পদ্ধতিটি যুক্তিসম্মত। যেমন—

$$\begin{array}{r} 2\,0\,3 \\ 1\,0\,9 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{rrr} 2 & 10 & 13 \\ 1 & 0 & 9 \\ \hline & 9 & 4 \end{array}$$

বর্তমান উদাহরণে বিয়োজনের দশক ও এককের প্রত্যেকটিতে 10 যোগ করা হয়েছে। ঐ 10-গুলি ধার করা হয়েছে বিয়োগফলের যথাক্রমে শতক ও দশক থেকে।

৩ **গুণ :** কতকগুলি সমান সংখ্যার সংক্ষিপ্ত যোগকে গুণ বলা হয়। যেমন—

$$3+3+3+3=3\times 4=12$$

× চিহ্নটি + চিহ্নগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ।

আবার, $4+4+4=4\times 3=12$

সুতরাং, $3\times 4=4\times 3$.

গুণ করতে হলে গুণ-তালিকা বা নামতা (multiplication table) মনে রাখা দরকার। কিন্তু গুণ-তালিকা যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করা উচিত নয়। কার্য-সম্পাদনের

মাধ্যমে (principle of activity) ইহা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। নামতা শেখানোর ক্রম—প্রথমে 2, 5 ও 10-এর নামতা, তারপর 4 ও 8-এর, তারপর 3, 6 ও 9-এর এবং সর্বশেষে 7-এর নামতা।

নানারূপ মূর্ত বস্তুর সাহায্যে শিশুরা নিজেরাই গুণ-তালিকা প্রস্তুত করবে। কার্য-সম্পাদনী নীতি অনুসারে সংখ্যার সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে গুণ-তালিকা তৈরী করতে পারে। যেমন—

4-এর তালিকা

1	1	2	3	4
2	5	6	7	8
3	9	10	11	12

এখানে প্রত্যেক সারিতে 4টি সংখ্যা আছে। 4×1=প্রথম সারির শেষ সংখ্যা। 4×2=দ্বিতীয় সারির শেষ সংখ্যা। 4×3 =তৃতীয় সারির শেষ সংখ্যা ইত্যাদি।

তালিকা অন্যভাবেও করা যেতে পারে। যেমন—3-এর তালিকা

এই তালিকায় সংখ্যা-সারির প্রতি তৃতীয় সংখ্যাকে রং করে দেখাতে হবে। যথা—1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ইত্যাদি।

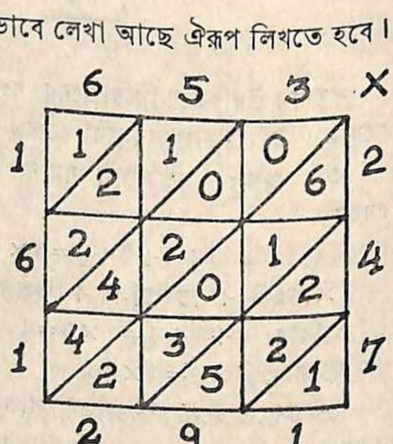
এই সারির 3, 6, 9, 12, ইত্যাদি সংখ্যাগুলি 3কে 1, 2, 3, 4 ইত্যাদির দ্বারা গুণ করে পাওয়া যাচ্ছে।

শিশু গুণ-তালিকাটি নিজেই তৈরী করবে এবং সমস্যামূলক অঙ্কের সমাধানের জন্য তালিকাটি প্রয়োজনমত ব্যবহার করবে। বারবার তালিকাটি ব্যবহার করতে করতে সে আপনি গুণ শিখবে। নামতা মুখস্থ করানোর দরকার নেই।

গুণ করার পদ্ধতি ঃ

পদ্ধতি ১। 653×247

653 এবং 247 সংখ্যা দুটি চিত্রটিতে যেভাবে লেখা আছে ঐরূপ লিখতে হবে। 653 সংখ্যার অঙ্কগুলিকে প্রথমে 2 দ্বারা পর পর গুণ করে গুণফল 12, 10 ও 6-কে যথাক্রমে 6, 5 ও 3-এর নীচের বর্গক্ষেত্র-গুলির কর্ণের নীচে একক সংখ্যাগুলি ও কর্ণের উপরে দশক সংখ্যাগুলি লেখা হবে—চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে। অনুরূপভাবে 4 ও 7 দিয়ে গুণ করে গুণফলগুলি লিখতে হবে। গুণ-ক্রিয়া শেষ হলে কর্ণগুলি বরাবর যোগ করতে হবে যেমন চিত্রে আছে। উত্তর—161291



ঠিক সংখ্যাটি ঠিক জায়গায় লেখার

উপর যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগের অঙ্কের নির্ভুলতা নির্ভর করে। গুণ-ক্রিয়ার সংখ্যাগুলির অবস্থান ঠিক রাখা শিশুদের পক্ষে অসুবিধাজনক। সেই দিক দিয়ে এইপদ্ধতিতে ভুল হবার সম্ভাবনা কম পদ্ধতিটি প্রায় 500 বৎসর পূর্বে চালু ছিল। প্রথম শিক্ষার্থীকে বর্গ-ছককাটা কাগজে অঙ্ক শেখানো দরকার।

পদ্ধতি ২। ডান থেকে বাম দিকে গুণ। উদাহরণ 342 × 213

```
    3 4 2
  × 2 1 3
  -------
  1 0 2 6
  3 4 2 0
6 8 4 0 0
---------
7 2 8 4 6
```

342 কে 213 বার যোগ করতে হবে। এখন 213 = 200 + 10 + 3. সুতরাং প্রথমে 3 বার যোগ, তারপর 10 বার যোগ এবং পরিশেষে 200 বার যোগ করে উহাদের সমষ্ট করলেই গুণফলটি পাওয়া যাবে। ছাত্রেরা যোগ-অঙ্কে শিখেছে যে কোন সংখ্যাকে 10 বার যোগ করলে অর্থাৎ 10 দিয়ে গুণ করলে সংখ্যাটির ডানদিকে একটি 0 বসে। অনুরূপ ভাবে 100 বার যোগ করলে অর্থাৎ 100 দিয়ে গুণ করলে সংখ্যাটির ডানদিকে দুটি 0 বসে। আরোহী পদ্ধতিতে ছাত্রদের এই নিয়মটি শেখাতে হবে যে, গুণকে 1-এর পর যতগুলি 0 থাকবে, যে সংখ্যাটিকে গুণ করতে হবে, তার ডানদিকে ততগুলি 0 বসালেই গুণফলটি পাওয়া যাবে। এই নিয়মটি ঠিকমত আয়ত্ত হলেই ছাত্রেরা পদ্ধতিটি ঠিকমত অনুসরণ করতে পারবে যথা,

$$342 \times 3 = 1026 \quad \ldots(i)$$
$$342 \times 10 = 3420 \quad \ldots(ii)$$
$$342 \times 200 = \underline{68400} \quad \ldots(iii)$$
$$\therefore \quad 342 \times 213 = 72846$$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে যোগ-ক্রিয়ার সময় (ii) ও (iii) এর ডানদিকের 0 গুলির কোন মূল্য নেই। ওগুলি না থাকলে গুণফলের কোন তারতম্য হবে না। সুতরাং দ্রুত অঙ্ক কষার জন্য ঐগুলি বাদ দিয়ে গুণ করার অভ্যাস করতে হবে। যথা—

```
    3 4 2
    2 1 3
---------
  1 0 2 6
  3 4 2
6 8 4
---------
7 2 8 4 6
```

পদ্ধতি ৩। গুণকের বাম অঙ্ক থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে ডান অঙ্কগুলির গুণ।

উদাহরণ :— 342 × 213

```
  3 4 2
  × 2 1 3
6 8 4
  3 4 2
  1 0 2 6
---------
7 2 8 4 6
```

পদ্ধতিটির একটি সুবিধা আছে। গুণকের অঙ্কগুলি দিয়ে গুণ করার সময় প্রথম গুণফলটি গুণক অঙ্কের ঠিক নীচে বসে। এখানে গুণক 213 প্রথম অঙ্ক 2-এর গুণফলের একক সংখ্যাটি অর্থাৎ 4 সংখ্যাটি ঠিক-2-এর নীচে বসেছে। অনুরূপভাবে 1 ও 3-এর গুণফলের একক

সংখ্যাদ্বয় অর্থাৎ 2 ও 6 যথাক্রমে 1 ও 3-এর ঠিক নীচে বসেছে। এই পদ্ধতিতে গুণ অভ্যাস করলে শিশুদের ভুল হবার সম্ভাবনা কম। এটিই আধুনিক পদ্ধতি।

কোন সংখ্যাকে 0 দিয়ে গুণ।

কোন সংখ্যাকে 0 দিয়ে গুণ করা গুণের সংজ্ঞার দিক থেকে অর্থহীন। 2×0 অর্থাৎ '2 কে 0 বার যোগ করতে হবে'—একথার কোন মানে হয় না। কিন্তু 0×2 সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ। কারণ (কে ২বার যোগ করলে 0 হয়। অর্থাৎ $0\times2=0$.

আগেই দেখা গেছে গুণক 0 ছাড়া অন্য যে কোন সংখ্যা হলে, গুণক ও গুণ্য সংখ্যাদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলে গুণফলের কোন তারতম্য হয় না। যেমন $3\times4=4\times3=12$। এই নিয়মটিকে সামান্তীকরণের প্রয়োজনে আমরা ধরে নিতে পারি $2\times0=0\times2=0$.

৪। **ভাগঃ** ভাগকে বলা যেতে পারে গুণ-প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রক্রিয়া। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে একই সংখ্যা বারবার বিয়োগ করার ইহা একটি সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া। 10 কে 2 দিয়ে ভাগ করা মানে—10 থেকে 2 কতবার বিয়োগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ

```
10
 2…1 বার
 8
 2…2 বার
 6
 2…3 বার
 4
 2…4 বার
 2
 2…5 বার
```

সুতরাং 10 থেকে 2 বিয়োগ করা যেতে পারে 5 বার। ইহাকে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যায় $10\div2=5$

প্রথম শিক্ষার্থীদের নানারকম কাজ ও খেলার মাধ্যমে ভাগ শিক্ষা দিতে হবে। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দিলেই তারা ভাগের অর্থটি ঠিক বুঝতে পারবে। অর্থহীন নিয়মটি শিখলে তাদের কোন উপকার হবে না। দ্বিতীয় স্তরে, মূর্ত বস্তু, যেমন ছোট ছোট কাঠি, তেঁতুলবীচি, টাকা, পয়সা, ছবি প্রভৃতির সাহায্যে তাদের ভাগ সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। ভাগের অর্থ বুঝলেই তাদের ভাগ করার পদ্ধতি শেখানো যেতে পারে। যান্ত্রিকভাবে কোন কিছু শেখানো উচিত নয়।

প্রথমে ছোট সংখ্যা দিয়ে আরম্ভ করতে হবে এবং ভাগ যে পুনঃ পুনঃ বিয়োগ—এই ধারণাটিই তাদের কাছে স্পষ্ট করতে হবে। যেমন 20 জন ছাত্র আছে। খেলার জন্য 4 জনের দলে ভাগ করতে হবে। কত দল হবে?

```
 20
  4   1 দল
----
 16
  4…1 দল
----
 12
  4…1 দল      মোট 5 দল
----
  8
  4   1 দল
----
  4
  4…1 দল
----
 5 দল
```

এইভাবে শিশুরা শিখবে যে 4 জনের দল হল 5টি ; অর্থাৎ 20 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 5. এরপর তাদের ভাজক, ভাজ্য ও ভাগফল সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই তাদের ভাগশেষ সম্বন্ধে ধারণা হবে। তারা দেখতে পাবে যে কোন সংখ্যা দিয়ে সকল সংখ্যাকে নিঃশেষিতভাবে ভাগ করা যায় না। কিছু অবশিষ্ট থাকে। এইভাবে ভাজক ভাজ্য, ভাগফল ও ভাগ-শেষের ধারণা তারা সম্যকভাবে আয়ত্ত করলেই ভাগ-পদ্ধতি শেখানো যেতে পারে।

ভাগ করার পদ্ধতি :—

ভাগ করার দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে : (১) একটি সাধারণ নিয়ম ও (২) অপরটি উৎপাদকের সাহায্যে।

সাধারণ নিয়ম : অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ছাত্রেরা উপলব্ধি করতে পারে যে ভাগ গুণেরই বিপরীত প্রক্রিয়া। তারা গুণের নামতার সাহায্যেই ছোট ছোট ভাগ করতে পারে। যেমন $3\times4=12$; $12\div3=4$. ভাজক × ভাগফল = ভাজ্য (যদি ভাগশেষ না থাকে) – এ ধারণা দিতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। ভাগ-ক্রিয়া-পদ্ধতিটি উদাহরণের সাহায্যে তাদের শেখাতে হবে। যেমন—83 কে 5 দিয়ে ভাগ করতে হবে।

```
   16
  ----
5)83
  5
  ----
  33
  30
  ----
   3
```

ভাগফল ভাজ্যের উপরে লেখাই আধুনিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে —ভাগফলের প্রথম অঙ্কের অবস্থান দেখে ভাগফলটি কয় অঙ্কের সংখ্যা হবে বলা যায়। এখানে ভাগফলের প্রথম অঙ্ক 1 সংখ্যাটি 8-এর মাথায় বসেছে। সুতরাং ভাগফলটি 2-অঙ্কের সংখ্যা হবে বোঝা যাচ্ছে। এছাড়া আরো বলা যায় ভাগফলটি 10 ও 20-র মধ্যে থাকবে অর্থাৎ ভাগফলের মোটামুটি একটা ধারণা প্রথমেই করা যায়। আবার

ভাগফলে প্রায়ই 0 অঙ্কটি আসে। ছাত্রেরা এটি বসাতে ভুল করে। এই পদ্ধতিতে ঐরূপ ভুল হবার সম্ভাবনা কম। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

```
     406
  5)2034
    20
    ---
      34
      30
      --
       4
```

এখানে ভাজ্যের প্রথম অঙ্ক 2, 5 দ্বারা বিভাজ্য নয়। সুতরাং প্রথম দুটি অঙ্ক অর্থাৎ 20 কে 5 দিয়ে ভাগ করে গুণফল 4, 0-অঙ্কটির মাথায় বসল। 3 নামল। কিন্তু 3 কে 5 দিয়ে ভাগ করা যায় না। এখানে 3-এর মাথায় 0 সংখ্যাটি বসাতে ছাত্রদের ভুল হবে না। কারণ তারা জেনেছে যে, ভাজ্যের প্রত্যেকটি সংখ্যার মাথায় ভাগফলের একটি সংখ্যা থাকবে।

এক অঙ্কের ভাজক হলে ছাত্রদের ভাগের অঙ্ক কষতে কোন অসুবিধা হয় না। তারা গুণের নামতার সাহায্যেই এ কাজ করতে পারে। কিন্তু ভাজক দুই বা ততোধিক অঙ্কের হলে ভাগফল নির্ণয়ে ছাত্রেরা বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

$$78)\overline{5791}$$

এখানে ভাগফলের প্রথম অঙ্কটি পাওয়া যাবে, 579-র মধ্যে 78 কয়বার যায় জানা গেল। এর জন্য প্রথমে মোটামুটি একটি ভাগফল স্থির করা দরকার। পরে চেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে প্রকৃত ভাগফলটি নিরূপণ করা হবে। নিম্নলিখিত নিয়মটি অনুসরণ করে স্থূল ভাগফলটি পাওয়া যায়

ভাজকের এককের অঙ্কটি 5, 6, 7, 8, অথবা 9 হলে দশকের অঙ্কে 1 যোগ করতে হবে। এইরূপে প্রাপ্ত দশক সংখ্যাটি দিয়ে ভাজ্যকে ভাগ করলেই ভাগফলের প্রথম অঙ্কটি পাওয়া যাবে। ভাজকের একক অঙ্ক 5 অপেক্ষা ছোট হলে দশক অঙ্ক অপরিবর্তিত থাকবে।

এই নিয়মের দ্বারা শতকরা আশিটি ক্ষেত্রে প্রকৃত ভাগফল পাওয়া যায়।

উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ করার নিয়ম—এই নিয়মে ভাগফল বেশ সহজেই নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ভাগশেষ নির্ণয়ে যথেষ্ট জটিলতা দেখা যায়। ভাগশেষ নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটি নীচু শ্রেণীর ছাত্রদের ঠিক বোধগম্য হয় না। সুতরাং এই নিয়মটি নীচু শ্রেণীতে শেখানো সঙ্গত নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে নিয়মটি দেখানো হল।

উদাহরণ 1. $37571 \div 105$

এখন, $105 = 3 \times 5 \times 7$; সুতরাং ভাগটি নিম্নলিখিত উপায়ে করা যেতে পারে।

```
3 | 37571
5 | 12523............অবশিষ্ট 2
7 | 2504............অবশিষ্ট 3 ( 3টি 3-এর দল )
    357  .........অবশিষ্ট 5 ( 5টি 5×3 অর্থাৎ 15-এর দল )
```

ভাগশেষ $= 5 \times 15 + 3 \times 3 + 2 = 86$

ভাগফল $= 357$

এখানে প্রথম ভাগফলটি 12523টি 3-এর দল। ইহাকে 5 দ্বারা ভাগ করলে অবশিষ্ট 3 থাকে। কিন্তু 12523-এর প্রত্যেকটি 3-এর দল। অতএব অবশিষ্ট 3টিও প্রত্যেকটির 3-এর দল। অর্থাৎ প্রকৃত অবশিষ্ট $3 \times 3 = 9$. আবার দ্বিতীয় ভাগফলটি 2504টি 5-এর দলে 12523-কে বিভক্ত করেছে। কাজেই অবশিষ্ট 5 সংখ্যাটি 5টি $5 \times 3 = 15$-এর দল। অর্থাৎ প্রকৃত অবশিষ্ট$=5 \times 15 = 75$।

শিশুরা যখন বড় বড় যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগ করতে পারবে, যখন এগুলি তাদের বেশ দখলে আসবে, তখন অঙ্কগুলি মেলানোর নিয়মও তাদের শেখাতে হবে। নিয়মটির নাম হচ্ছে 9 বাদ দেওয়ার নিয়ম।

যোগ অঙ্ক ঠিক হয়েছে কিনা মেলাবার নিয়ম।—

উদাহরণ 1.

3728	2
5968	1
7857	0
4753	1
22306	4

প্রত্যেক লাইনের অঙ্ক-সংখ্যাগুলি পর পর যোগ করতে হবে যখনই যোগফল 9-এর বেশী হবে, তখনই তা থেকে 9 বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নিয়ে যোগ করতে হবে। যেমন প্রথম লাইনে $3+7=10$; 9 বাদ দিলে থাকে 1; আবার, $1+2+8 =11$; 9 বাদ দিলে থাকে 2। এইভাবে দ্বিতীয় লাইন থেকে 1, তৃতীয় লাইন থেকে 0, চতুর্থ লাইন থেকে 1 পাওয়া গেল। ঐ সংখ্যাগুলি যোগ করে যোগফল 4 হল। যোগফল 9 এর অধিক হলে 9 বাদ দিয়ে যোগফল লিখতে হবে। আবার অঙ্কটির যোগফল হয়েছে 22306। যোগফলের অঙ্কগুলির উপরি-উক্ত 9 বাদ দেওয়ার নিয়মে যোগ করে দেখা যাচ্ছে 4 হয়েছে। উভয় যোগফলই সমান হলে অঙ্কটি ঠিক হয়েছে ধরে নিতে হবে। এখানে উভয় যোগফলই 4। অতএব অঙ্কটিতে ভুল নেই।

বিয়োগের বেলায় বিয়োজন—বিয়োজ্য=বিয়োগফলে 9 বাদ দেওয়ার নিয়মে মেলাতে হবে।

5 3 6 2	7
3 8 7 5	5
1 4 8 7	2

প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের 9 বাদ দেওয়ার নিয়মে যোগফল যথাক্রমে 7 ও 5। 7—5 =2; আবার বিয়োগফল 1487-এর 9 বাদ দেওয়ার নিয়মে যোগফলও 2 হয়েছে। উত্তর ঠিক আছে।

গুণের ক্ষেত্রে, দেখতে হবে গুণ্য × গুণক = গুণফল, এই সূত্রটি 9 বাদ দেওয়া নিয়মে সিদ্ধ হচ্ছে কিনা। অনুরূপে ভাগের বেলায় দেখতে হবে ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ = ভাজ্য; সূত্রটি যেন সিদ্ধ হয় 9 বাদ দেওয়া নিয়মে।

গ. সা. গু. :

দুই বা ততোধিক সংখার গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ককে সংক্ষেপে গ. সা. গু. বলা হয়।

গ. সা. গু. নির্ণয় পদ্ধতি :

পদ্ধতি ১। প্রদত্ত সংখ্যাগুলির মৌলিক গুণনীয়কগুলি বের করে, ঐগুলির মধ্যে যেগুলি সাধারণ গুণনীয়ক, তাদের গুণফলই নির্ণেয় গ. সা. গু.।

উদাহরণ। 360, 405 ও 495-এর গ. সা. গু. নির্ণয়।

$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$

$405 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5$

$495 = 3 \times 3 \times 5 \times 11$

সংখ্যা তিনটির মৌলিক গুণনীয়কগুলির মধ্যে $3 \times 3 \times 5$ সাধারণ গুণনীয়ক

∴ নির্ণেয় গ. সা. গু. $= 3 \times 3 \times 5 = 45$.

পদ্ধতি ২। পুনঃ পুনঃ ভাগ ক্রিয়ার দ্বারা। দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে বড় সংখ্যাটিকে ছোট সংখ্যাটির দ্বারা ভাগ করে যে ভাগশেষ থাকে, তাহা দ্বারা প্রথম ভাজককে ভাগ করতে হবে। এখানে যে ভাগশেষ থাকবে, তাহা দ্বারা দ্বিতীয় ভাজককে ভাগ করতে হবে। যতক্ষণ ভাগশেষ থাকবে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ ভাগ করতে হবে। শেষ ভাজকটিই প্রদত্ত সংখ্যা দুটির গ. সা. গু.।

দুইয়ের অধিক সংখ্যা থাকলে, প্রথমে যে কোন দুটি সংখ্যার গ. সা. গু. নির্ণয় করে প্রাপ্ত গ. সা. গু. ও তৃতীয় সংখ্যার গ. সা. গু. নির্ণয় করতে হবে। এইভাবে পর পর সংখ্যা নিয়ে গ. সা. গু. নির্ণয় করতে হবে। শেষ গ. সা. গু.ই প্রদত্ত সংখ্যাগুলির গ. সা. গু.।

উদাহরণ। ১নং পদ্ধতির অঙ্ক।

```
360)405(1          45)495(11
    360               45
    ------            ---
     45)360(8          45
        360            45
        ---            ---
```

∴ নির্ণেয় গ. সা. গু. $= 45$

পুনঃ পুনঃ ভাগ ক্রিয়ার দ্বারা শেষ ভাজক কেন গ. সা. গু. হয় শিক্ষকের উচিত তার কারণ ছাত্রদের ঠিক মত বুঝিয়ে দেওয়া। সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করার জন্য কোন নিয়ম শেখান উচিত নয়। নিয়মের পিছনে যে যুক্তি আছে সেটা যেন তারা হৃদয়ঙ্গম করে। দ্রুততা ও নির্ভুলতার জন্য যান্ত্রিকভাবে কাজ করতে তখনই ছাত্রদের উৎসাহিত করা যাবে, যখন তারা নিয়মটির পিছনে কি যুক্তি আছে এবং নিয়মটি কি ভাবে কাজ করছে সেটা বুঝতে পারবে। উচ্চ শ্রেণীতে বীজগণিতের সাহায্যে নিয়মটির সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীতে ঐ ব্যাখ্যার কোন মূল্যই নেই। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের বোধশক্তির উপযোগী একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

দ্বিতীয় পদ্ধতির ব্যাখ্যা ঃ

আমরা জানি,

ভাজ্য = ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ

এখন ভাজকের গুণনীয়ক অবশ্যই ভাজক × ভাগফলের গুণনীয়ক হবে। আবার ঐ গুণনীয়কটি যদি ভাজ্যেরও (অর্থাৎ ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ-এর) গুণনীয়ক হয় তা হলে উহা দ্বারা

ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ

বিভাজ্য হবে। ভাজক × ভাগফল গুণনীয়কটি দ্বারা বিভাজ্য বলে, ভাগশেষও উহার দ্বারা বিভাজ্য হবে। অর্থাৎ গুণনীয়কটি ভাগশেষেরও গুণনীয়ক। অতএব ভাজক, ভাজ্য ও ভাগশেষের একই গুণনীয়ক থাকবে।

∴ ভাজক ও ভাজ্যের গ. সা. গু.

= ভাজক ও ভাগশেষের গ. সা. গু.

অনুরূপে = ১ম ভাগশেষ (= ২য় ভাজক ও ২য় ভাগশেষের গ. সা. গু.

= ২য় ভাগশেষ (= ৩য় ভাজক) ও ৩য় ভাগশেষের গ. সা. গু.

= … … …

= শেষ ভাগশেষ (= শেষ ভাজক) কারণ, পূর্ববর্তী ভাজক শেষ ভাগশেষ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষক ব্যাখ্যাটি শ্রেণীতে উপস্থাপন করবেন।

ল. সা. গু. ঃ

দুই বা ততোধিক সংখ্যার লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতককে সংক্ষেপে ল. সা. গু. বলে।

ল. সা. গু. নির্ণয় পদ্ধতি ঃ

পদ্ধতি ১। গ. সা. গু. র সাহায্যে ল. সা. গু. নির্ণয়।

দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে, প্রথমে উহাদের গ. সা. গু. নির্ণয় করে প্রাপ্ত গ. সা. গু. দ্বারা প্রদত্ত সংখ্যাদ্বয়ের একটিকে ভাগ করতে হবে এবং সেই ভাগফল ও প্রদত্ত অপরসংখ্যার গুণফলই নির্ণেয় ল. সা. গু.।

উদাহরণ। 42 ও 385-এর ল. সা. গু. নির্ণয়।

42 ও 385-এর গ. সা. গু. = 7 ;

$42 \div 7 = 6$

∴ নির্ণেয় ল. সা. গু. $= 385 \times 6 = 23\ 0$

আবার $385 \div 7 = 55$

∴ ল. সা. গু. $= 42 \times 55 = 23{;}0$.

এই পদ্ধতিতে দুটির অধিক সংখ্যার ল. সা. গু. নির্ণয় করতে হলে, প্রথমে যে কোন দুটি সংখ্যার নির্ণয় করে, প্রাপ্ত ল. সা. গু. ও ৩য় সংখ্যার ল. সা. গু. নির্ণয় করলে

তিনটি সংখ্যার ল. সা. গু. পাওয়া যাবে। আরো সংখ্যা থাকলে অনুরূপভাবে অগ্রসর হতে হবে। শেষ ল. সা. গু. হবে নির্ণেয় ল. সা. গু.।

পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা :

প্রদত্ত উদাহরণটি থেকে

$42 = 2 \times 3 \times 7$; $385 = 5 \times 7 \times 11$

$\therefore$ গ. সা. গু. $= 7$

১ম সংখ্যা $42 = 7 \times 2 \times 3$

= গ. সা. গু. × অন্যান্য গুণনীয়কগুলির গুণফল

২য় সংখ্যা $385 = 7 \times 5 \times 11$

= গ. সা. গু. × অন্যান্য গুণনীয়কগুলির গুণফল

$\therefore$ ল. সা. গু = গ. সা. গু. × (১ম সংখ্যার অন্যান্য গুণনীয়কগুলির গুণফল) × (২য় সংখ্যার অন্যান্য গুণনীয়কগুলির গুণফল)

= ১ম সংখ্যা × (২য় সংখ্যার অন্যান্য গুণনীয়কগুলির গুণফল)

অথবা = ২য় সংখ্যা × (১ম সংখ্যার অন্যান্য গুণনীয়কগুলির গুণফল)

শিক্ষক আরো কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আরোহী পদ্ধতিতে নিয়মটি প্রতিষ্ঠিত করবেন।

প্রতিষ্ঠিত নিয়ম থেকে আরো একটি নিয়ম পাওয়া যায়—

গ. সা. গু. × ল. সা. গু. = গ. সা. গু. × ১ম সংখ্যা × (২য় সংখ্যার অন্যান্য গুণনীয়কগুলির গুণফল)

= ১ম সংখ্যা × ২য় সংখ্যা

পদ্ধতি ২। সংখ্যাগুলির মৌলিক গুণনীয়কগুলি বের করতে হবে। সমস্ত রকমের গুণনীয়কগুলির (বৃহত্তম শক্তিসহ) গুণফলই নির্ণেয় ল. সা. গু.।

উদাহরণ। 18, 24 ও 27-এর ল. সা. গু নির্ণয়।

$18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$

$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 2^3 \times 3$

$27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$

এখানে 2 ও 3 এই দু রকমের গুণনীয়ক আছে। 2-এর বৃহত্তম শক্তি 2^3 এবং 3-এর বৃহত্তম শক্তি 3^3।

$\therefore$ নির্ণেয় ল. সা. গু. $= 2^3 \times 3^3 = 216$.

[ব্যাখ্যা। দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে ১ম পদ্ধতির অনুরূপ উপায়ে নিয়মটি প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। আরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখাতে হবে যে দু'এর অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রেও পদ্ধতিটি সত্য।]

পদ্ধতি ৩। সাধারণ পদ্ধতি বা হ্রস্ব ভাগ পদ্ধতি।

প্রদত্ত সংখ্যাগুলিকে একই সারিতে পর পর লেখা হয়। উহাদের যে কোন তুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ মৌলিক গুণনীয়ক (যদি থাকে) দ্বারা ঐ সংখ্যাগুলিকে ভাগ করে ভাগফলগুলিকে উহাদের ঠিক নীচে নীচে পরের সারিতে বসানো হয়। যে সংখ্যাগুলি বিভাজ্য নয়, সেগুলিকে নীচের সারিতে যথাস্থানে রাখা হয়। দ্বিতীয় সারি থেকে অনুরূপভাবে তৃতীয় সারি তৈরী হবে। এইভাবে ভাগ করতে করতে যখন কোন সারির সংখ্যাগুলি থেকে কোন তুটি সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক পাওয়া যাবে না, তখন শেষ সারির সংখ্যাগুলির ও সমস্ত ভাজকগুলির ক্রমিক গুণফলই প্রদত্ত সংখ্যাগুলির ল. সা. গু. হবে।

উদাহরণ। পূর্ব পদ্ধতিতে প্রদত্ত উদাহরণ।

2 | 18, 24, 27
3 | 9, 12, 27
3 | 3, 4, 9
1, 4, 3

∴ নির্ণেয় ল সা. গু. $= 2 \times 3 \times 3 \times 4 \times 3 = 216.$

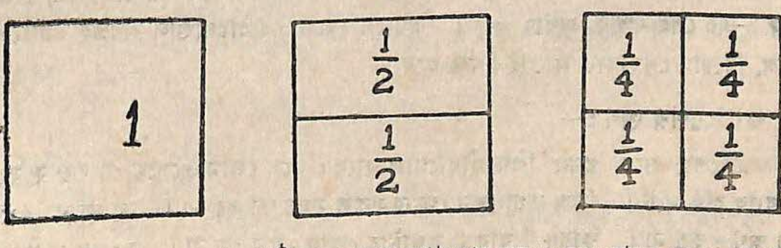
[ব্যাখ্যা। তুটি সংখ্যা হলে, এই পদ্ধতি ১ম পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ। আরোহী পদ্ধতিতে তু'এর অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।]

৫। ভগ্নাংশ :—

ভগ্নাংশের ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। মিশর ও ব্যাবিলনবাসীরা ইহার ব্যবহার জানতেন। কিন্তু বর্তমান ভগ্নাংশ লেখার পদ্ধতিটি হিন্দুদের আবিষ্কার।

গৃহ পরিবেশেই শিশু প্রথম ভগ্নাংশের ধারণা পায়। একটি কলা বা একটি সন্দেশ মা যখন তু'ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেন, তখনই তাদের ভগ্নাংশের জ্ঞান জন্মায়।

শ্রেণীকক্ষেও ভগ্নাংশের প্রথম পাঠ মূর্ত বস্তুর সাহায্যে দিতে হবে—যেমন মাটির তৈয়ারী সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি সমান ভাগ করে। তারপর ছবির ভিতর দিয়েও ভগ্নাংশের ধারণা দেওয়া দরকার। যেমন—



শিশুদের ভগ্নাংশের ধারণা ঠিকমত হলে ভগ্নাংশের লব ও হর কাকে বলে বোঝাতে হবে। একটি এক ফুট দৈর্ঘের কাগজ নিয়ে তাকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তার প্রতি অংশ $\frac{1}{2}$ ফুট দৈর্ঘ্যের হবে। এখন শেখাতে হবে যে অর্ধ অংশটির দৈর্ঘ্য লিখতে হলে উপরে 1 এবং নীচে 2 লিখে, তাদের মাঝে '—' বার চিহ্ন দিতে হবে এইভাবে $\frac{1}{2}$।

উপরের সংখ্যাটি ভগ্নাংশের লব ও নীচের সংখ্যাটিকে হর বলা হয়। শিক্ষণে 'জানা থেকে অজানা'র নীতিটি অনুসরণ করতে হবে। চিত্রের সাহায্যে শেখাতে হবে $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{3}{6}$ ইত্যাদি।

পরবর্তী ধাপে ভগ্নাংশ কত রকম আছে তা শেখাতে হবে, যেমন—

১। **প্রকৃত ভগ্নাংশ**—যখন লব হরের চেয়ে ছোট।

২। **অপ্রকৃত ভগ্নাংশ**—যখন লব হরের চেয়ে বড়।

৩। **মিশ্র ভগ্নাংশ**—একটি পূর্ণ সংখ্যা ও প্রকৃত ভগ্নাংশের সমষ্টি। যেমন $3\frac{3}{5}$।

শিক্ষণ সহায়ক (Teaching aid) হিসাবে একটি আদর্শ মাপক গ্রহণ করা উচিত। উহা ফুট-রুল অথবা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কাগজও হতে পারে।

ভগ্নাংশ শেখাবার সময় এমন ভগ্নাংশই নিতে হবে, যার বাস্তব মূল্য শিশুর কাছে আছে—যার সমাজে ব্যবহার আছে। $\frac{23}{81}$-র মত ভগ্নাংশের বাস্তবে বিশেষ ব্যবহার নেই। সুতরাং ঐরূপ ভগ্নাংশ পরিত্যাগ করতে হবে।

ভগ্নাংশের যথাযথ ধারণা হলে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কাগজের সাহায্যে শিশুদের দেখানো যেতে পারে যে, ভগ্নাংশের লবের 1 বৃদ্ধি হলে ভগ্নাংশটির মানের বৃদ্ধি হয় এবং হরের 1 বৃদ্ধি হলে ভগ্নাংশটির মানের হ্রাস ঘটে।

পরবর্তী ধাপে দেখানো যেতে পারে যে, একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ (যেমন, $\frac{9}{8}$) একটি পূর্ণসংখ্যা ও প্রকৃত ভগ্নাংশের সমষ্টি ($1+\frac{1}{8}$)।

পরবর্তী ধাপে ক্রমে ক্রমে ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শেখাতে হবে। ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ শিক্ষণে প্রথমে একই হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ নিতে হবে। যথা, $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}+\frac{1}{4}+\frac{2}{4}$, $\frac{2}{3}-\frac{1}{3}$ ইত্যাদি। পরের ধাপে ভিন্ন হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ শেখাতে হবে। যথা $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

ভগ্নাংশ কেবলমাত্র একটি জিনিসের অংশই হবে তা নয়; উহা একদল জিনিসেরও অংশ হতে পারে। যেমন—12টি জিনিসের $\frac{1}{6}$ হচ্ছে 2টি, $\frac{1}{4}$ হচ্ছে 3টি।

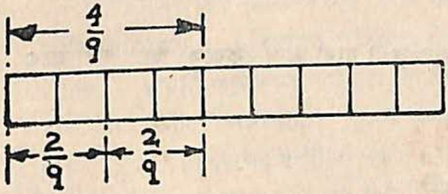
ভগ্নাংশকে একটি সংখ্যার সঙ্গে আর একটি সংখ্যার সম্বন্ধ হিসাবেও প্রকাশ করা যায়। যেমন, $2\div4=2:4=1:2=\frac{1}{2}$ অর্থাৎ 2 এর সঙ্গে 4-এর যা সম্পর্ক, 1-এর সঙ্গে 2-এর সেই সম্পর্ক, অর্থাৎ $=\frac{1}{2}$। ভগ্নাংশ সম্বন্ধে এই ধারণাগুলি অবশ্যই ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ শেখাবার আগেই দিতে হবে।

ভগ্নাংশের গুণ :—

ভগ্নাংশের গুণে প্রথম শিক্ষার্থীর গোল বাধে। সে জেনে এসেছে যে গুণের ফলে সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে সকল সময় তা হয় না। তা ছাড়া $\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}$ এর অর্থও হয় না। কারণ $\frac{3}{4}$ বার $\frac{2}{3}$ কথাটার কোন মানে হয় না। সেইজন্য ভগ্নাংশের গুণকে শেখাতে হলে নিম্নলিখিত 6টি গুণের নীতি শেখানো আগে দরকার।

১। ভগ্নাংশের লবকে কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে সমগ্র ভগ্নাংশটি ঐ সংখ্যা দ্বারা গুণিত হবে।

মনে করা যাক, ভগ্নাংশটি $\frac{2}{9}$ এবং লবের গুণক 2। তাহলে ভগ্নাংশটি $\frac{2\times2}{9}=\frac{4}{9}$ হবে।



একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য কাগজ নিয়ে, তাকে 9টি সমান অংশে ভাগ করা হল।

চিত্র – ১

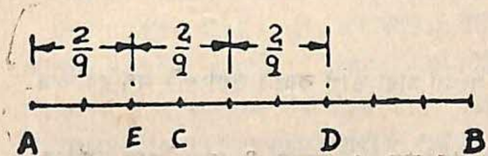
এখন দেখা যাচ্ছে $\frac{2\times2}{9}=\frac{2}{9}+\frac{2}{9}=\frac{4}{9}$

স্থতরাং $\frac{2}{9}$ ভগ্নাংশটিকে 2 দ্বারা গুণ করলে $\frac{4}{9}$ হয়। কাজেই $\frac{2}{9}$ ভগ্নাংশের লবকে 2 দ্বারা গুণ করলে ভগ্নাংশ $\frac{2}{9}$ কে 2 দ্বারা গুণ করার সমান হবে।

২। কোন ভগ্নাংশের হরকে কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে সমগ্র ভগ্নাংশটি এই সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত হয়।

মনে করি, ভগ্নাংশটি $\frac{2}{3}$। ইহার হরকে 3 দ্বারা গুণ করলে ভগ্নাংশটি $\frac{2}{9}$ হবে।

A B দৈর্ঘ্যের কাগজকে তিনটি সমান অংশ AC, CD ও DB করা হল।



এখানে AB-কে 1 ধরলে

$AC=\frac{1}{3}$, $AD=\frac{2}{3}$

চিত্র – 2

AB-কে আবার 9টি সমান ভাগে ভাগ করা হল। তা হলে $AE=\frac{2}{9}$.

দ্বিতীয় বিভাজনে ADর মধ্যে 6টি অংশ আছে এবং AEর মধ্যে 2টি অংশ আছে। স্থতরাং AE=ADর $\frac{1}{3}$.

অতএব চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে $\frac{2}{9}$ হচ্ছে $\frac{2}{3}$ এর $\frac{1}{3}$.

কাজেই $\frac{2}{3\times3}=\frac{2}{3}$ এর $\frac{1}{3}$

৩। ভগ্নাংশের লব ও হরকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে ভগ্নাংশটি অপরিবর্তিত থাকে।

মনে করা যাক, ভগ্নাংশটি $\frac{2}{3}$। ইহার লব ও হরকে 3 দ্বারা গুণ করলে ভগ্নাংশটি $\frac{6}{9}$ হবে।

চিত্র 2 থেকে দেখা যায় $AD=\frac{2}{3}$ ও $\frac{6}{9}$.

স্থতরাং $\frac{2}{3}=\frac{6}{9}$.

৪। ভগ্নাংশের লবকে কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভগ্নাংশটি ঐ সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত হবে।

মনে করা যাক, ভগ্নাংশটি $\frac{2}{3}$। ইহার লবকে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশটি হবে $\frac{\frac{2}{3}}{3}$।

এখন 2 নং চিত্রে $\frac{2}{3}=AD$ এবং $\frac{\frac{2}{3}}{3}=AE$

কিন্তু $AE=\frac{2}{9}$

$\therefore\ \frac{\frac{2}{3}}{3}=\frac{2}{9}.$

৫। ভগ্নাংশের হরকে কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশটি ঐ সংখ্যা দ্বারা গুণিত হবে।

মনে করা যাক ভগ্নাংশটি $\frac{2}{9}$। ইহার হরকে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশটি $\frac{2}{3}$ হবে।

2 নং চিত্রে $\frac{2}{9}=AE$ এবং $\frac{2}{3}=AD$

আবার $\frac{2}{9}\times 3=AD.$

$$\therefore\ \frac{2}{9\div 3}=\frac{2}{9}\times 3.$$

৬। ভগ্নাংশর লব ও হরকে একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশটি অপরিবর্তিত থাকে।

মনে করা যাক, ভগ্নাংশটি $\frac{2}{5}$। ইহার লব ও হরকে 3 দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশটি $\frac{2\div 3}{5\div 3}$ হবে।

এখন $\frac{2\div 3}{5\div 3}=\left(\frac{2\div 3}{5}\right)\times 3$ (৫ম নীতি)

$=\left(\frac{2}{5}\div 3\right)\times 3$ (৪র্থ নীতি)

$=\frac{2}{5}$

উল্লিখিত 6টি নীতির সাহায্যে সহজেই দেখানো যায় যে, দুটি ভগ্নাংশের গুণফল উহাদের লবগুলির গুণফল ও হরগুলির গুণফল দ্বারা গঠিত ভগ্নাংশের সমান।

ভগ্নাংশের ভাগ ঃ

2 নং চিত্রে দেখা যায় যে,

$AD=3\times AE$ অর্থাৎ $\frac{2}{3}=3\times\frac{2}{9}.$

সুতরাং ভগ্নাংশের ভাগ গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া।

৬। দশমিক ভগ্নাংশ :—

ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে দশমিক ভগ্নাংশ সাধারণ ভগ্নাংশের অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। যুক্তিসম্মত পাঠক্রমে ইহার স্থান সাধারণ ভগ্নাংশে আগেই হওয়া উচিত। মনোবিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রমে ইতিহাসের ক্রমই অনুসরণ করা বিধেয়।

1585 খ্রীষ্টাব্দে Stevenus নামক ওলন্দাজ গণিতজ্ঞ এই পদ্ধতির প্রথম ব্যবহার করেন। সংখ্যালিখনের দশমিক পদ্ধতির মূল আবিষ্কার হিন্দুদের। আরবদের দ্বারা ইহা পাশ্চাত্ত্যে অনুপ্রবেশ লাভ করে। এইজন্য ইহা আরব পদ্ধতি নামে খ্যাত। দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যার ধারণার বিস্তৃতি। দশমিক পদ্ধতি অনুসারে যে কোন সংখ্যা বামদিকে এক স্থান সরে গেলে তার স্থানীয় মান 10 গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংখ্যাটি ডানদিকে একস্থান সরে এলে তার স্থানীয় মান $\frac{1}{10}$ ভাগ হ্রাস পাবে। এই মূল নীতিটি মনে রাখলেই দশমিক ভগ্নাংশ বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে না।

Stevenus প্রথমে দশমাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ প্রভৃতিকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। স্বাভাবিক সংখ্যাগুলি থেকে দশমিক ভগ্নাংশগুলিকে পৃথক করার জন্য তিনি প্রথমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্থানগুলিকে বৃত্তে অন্তর্লিখিত করে লেখেন। যেমন (1), (2), (3), (4) ইত্যাদি। (1) অর্থে প্রথম অর্থাৎ দশাংশ, (2) অর্থে দ্বিতীয় অর্থাৎ শতাংশ ইত্যাদি। পরে তিনি দাঁড়ি-রেখার সাহায্য গ্রহণ করেন। (1) এর স্থলে । দাঁড়ি। (2) এর স্থলে ॥ দাঁড়ি, (3) এর স্থলে ।॥ দাঁড়ি ইত্যাদি। যেমন, 92·1502 স্থলে লিখিতেন $92{\cdot}1'5''0'''2''''$। এ ব্যবস্থাও অসুবিধাজনক বিবেচিত হয়। পরে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলি থেকে একটি মাত্র দাঁড়িরেখার সাহায্যে ভগ্নাংশগুলিকে পৃথক করা হল। যেমন, 92/1502। কিন্তু এটিও খুব ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। দাঁড়িরেখাটি একটু ছোট হলেই 1 সংখ্যা বলে ভুল হতে পারে। Napierই প্রথম দাঁড়ি রেখার পরিবর্তে বিন্দু ব্যবহার করেন। কিন্তু বিন্দুর প্রচলন অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে হয় নি।

দশমিক ভগ্নাংশ নিম্নলিখিতভাবে দশমিক চার্টের সাহায্যে শেখালে ছাত্রেরা সহজে বুঝতে পারবে।

দশমিক চার্ট

	সহস্রক	শতক	দশক	একক	দশাংশ $\frac{1}{10}$	শতাংশ $\frac{1}{100}$	সহস্রাংশ $\frac{1}{1000}$
27			2	7			
27 × 10		2	7	0			
27 × 100	2	7	0	0			
27 ÷ 10				2	7		
27 ÷ 100					2	7	
27 ÷ 1000					0	2	7

সংখ্যার স্থানীয়মান তত্ত্ব অনুযায়ী যে কোন সংখ্যাকে 10 দিয়ে গুণ করলে, বামদিকে এক ঘর সরে যায় এবং 10 দিয়ে ভাগ করলে, সেটি ডানদিকে এক ঘর সরে যায়। এখন 270কে 10 দিয়ে গুণ করলে 2700 হয় অর্থাৎ সংখ্যাটি বামদিকে এক ঘর সরে যায়। আবার 2700কে 10 দিয়ে ভাগ করলে 270 হয় অর্থাৎ সংখ্যাটি ডানদিকে এক ঘর সরে যায়। ঐরূপ 270কে 10 দিয়ে ভাগ দিলে সংখ্যাটি ডানদিকে এক ঘর সরে গিয়ে 27 হয়। সুতরাং 27কে 10 দিয়ে ভাগ করলে, সংখ্যাটি ডানদিকে এক ঘর সরে যাওয়া উচিত ; অর্থাৎ 2 সংখ্যাটি এককের ঘরে এবং 7 সংখ্যাটি দশাংশের ঘরে বসবে। গণিতে এই সংখ্যাটি দশমিক বিন্দুর সাহায্যে লেখা হয় 2·7। অনুরূপভাবে 2·7কে 10 দিয়ে ভাগ করলে ·27 পাওয়া যাবে এবং ·27কে 10 দিয়ে ভাগ করলে ·027 হবে।

দশমিক ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশরূপে প্রথমে না বুঝিয়ে উহাকে দশমিক সংখ্যার বিস্তৃতিরূপে ধারণা দিলে দশমিক ভগ্নাংশ ছাত্রদের কাছে বিশেষ জটিল বলে মনে হবে না।

দশমিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ : দশমিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগে কোন জটিলতা নেই। দশমিক বিন্দুর নীচে দশমিক বিন্দুস্থাপন করে সাধারণ যোগ ও বিয়োগের মত যোগ ও বিয়োগ ক্রিয়া করতে হবে।

দশমিক ভগ্নাংশের গুণ :—

1. **সাধারণ পদ্ধতি**—এই পদ্ধতির তিনটি ধাপ আছে।

প্রথম ধাপ—দশমিক ভগ্নাংশগুলিকে ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপ—লব্ধ ভগ্নাংশগুলিকে ভগ্নাংশের নিয়মে গুণ করা হয়।

তৃতীয় ধাপ—পুনরায় দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করা হয়।

উদাহরণ 1. $72{\cdot}314 \times {\cdot}32$

$$= \frac{72314}{1000} \times \frac{32}{100} \quad (\text{প্রথম ধাপ})$$

$$= \frac{2314048}{100000} \quad (\text{দ্বিতীয় ধাপ})$$

$$= 23{\cdot}14048 \quad (\text{তৃতীয় ধাপ})$$

ধাপ তিনটি অনুসরণ করে ছাত্রেরা কয়েকটি অঙ্ক করার পর শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় নিম্নলিখিত নিয়মটি তাদের শেখাবেন।

নিয়ম : দশমিক বিন্দুগুলি বাদ দিয়ে সাধারণ গুণের মত গুণ করতে হবে। গুণ্য ও গুণকে দশমিক বিন্দুর পর যতগুলি সংখ্যা আছে, তাদের যোগ করে গুণফলে এককের স্থান থেকে বামদিকে ততগুলি সংখ্যা বাদ দিয়ে দশমিক বিন্দুটি বসাতে হবে।

2. **আদর্শ আকার পদ্ধতি** (Standard Form Method)—

এই পদ্ধতিতে দশমিক বিন্দুর স্থান প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে গুণকের দশমিক

ভগ্নাংশটিকে 1 থেকে 10 এর মধ্যে একটি সংখ্যায় রূপান্তরিত করা হয়। গুণকের দশমিক বিন্দু যতগুলি স্থান পরিবর্তন করে, গুণ্যের দশমিক বিন্দুটিও ততগুলি স্থান পরিবর্তন করে বিপরীত ক্রমে। একটি উদাহরণের সাহায্যে পদ্ধতিটি বোঝানো হবে।

উদাহরণ 1. 72·314 × ·32.

এখানে গুণক ·32 সংখ্যাটি 1 সংখ্যা অপেক্ষা ছোট। ইহাকে 1 থেকে 10 এর মধ্যে রূপান্তরিত করতে হলে দশমিক বিন্দুটি ডানদিকে 3 সংখ্যাটির পর বসাতে হবে। ইহাতে বিন্দুটি ডানদিকে একটি স্থান পরে সরে যাচ্ছে। ফলে গুণক সংখ্যাটি 10 গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গুণফল ঠিক রাখতে হলে গুণ্যকে 10 দিয়ে ভাগ করতে হবে। সুতরাং গুণ্যের দশমিক বিন্দুটি বামদিকে এক স্থান আগে বসবে। এই পদ্ধতিতে গুণক হবে 3·2 এবং গুণ্য হবে 7 2314। গুণ করার সময় গুণ্যের দশমিক বিন্দুর ঠিক নীচে একই স্তম্ভে গুণকের দশমিক বিন্দুটি বসবে। এখন সাধারণ গুণের নিয়মে গুণ করে দশমিক বিন্দুর স্তম্ভে গুণফলের দশমিক বিন্দু বসালেই উত্তর মিলবে।

```
  7·2314
  3·2
---------
 21·6942
  1·44628
----------
 23·14048
```

পদ্ধতিটির সুবিধা এই যে, সমস্ত গুণন প্রক্রিয়ায় দশমিক বিন্দুটির স্থান অপরিবর্তিত থাকে এবং গুণফলে দশমিক বিন্দুর স্থান নিরূপণ করতে হয় না। সংক্ষিপ্ত দশমিক ভগ্নাংশের গুণে (contracted method) ইহা ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে দশমিক বিন্দুর প্রাথমিক পুনঃ সংস্থাপনের সময় ছাত্রদের ভুল হতে পারে।

3. একক অনুসরণ পদ্ধতি (Tracking the Unit Method) :

এই পদ্ধতিটি উদাহরণের সাহায্যে ভালো বোঝা যাবে।

উদাহরণ 1. 23·612 × 42·1

```
  23·612
  42·1
----------
 944·48    ...... 4 দ্বারা গুণ
  47·224   ...... 2  "   "
   2·3612  ...... 1  "   "
----------
 994·0692
```

এখানে গুণকের প্রথম গুণক অঙ্ক 4 দশক সংখ্যা অর্থাৎ একক থেকে বামদিকে এক স্থান সরে আছে। গুণ্যকে 4 দ্বারা গুণের গুণফলটিও তাই বামদিকে একস্থান সরে বসেছে। দশমিক বিন্দুর অবস্থান অপরিবর্তিত আছে।

উদাহরণ 2. 72·314 × ·32

```
          72·314
            ·32
       ----------
          21·6942     ...... 3 দ্বারা গুণ
           1·44628    ...... 2   "   "
       ----------
          23·14048
```

এখানে গুণকের প্রথম গুণক অঙ্ক 3 দশাংশ সংখ্যা অর্থাৎ একক থেকে ডানদিকে এক স্থান সরে আছে। গুণ্যকে 3 দ্বারা গুণের গুণফলটিও তাই ডানদিকে এক স্থান সরে বসেছে। দশমিক বিন্দুর অবস্থান অপরিবর্তিত আছে।

পদ্ধতিটির সুবিধা এই যে দশমিকের স্থান পরিবর্তন করতে হয় না।

দশমিক ভগ্নাংশের ভাগ ঃ—

পদ্ধতি 1. গুণের বিপরীত ক্রিয়া ভাগ। সুতরাং গুণের সময় গুণফলে যেভাবে দশমিক বিন্দু বসনো হয়েছে ভাগের সময় বিপরীতভাবে বসাতে হবে। গুণের সময় সাধারণ নিয়মে দশমিক বিন্দু তুলে দিয়ে সাধারণ গুণ করা হয় এবং গুণ্য ও গুণকের দশমিক বিন্দুর পর যতগুলি সংখ্যা আছে তার যোগফলের সমান সংখ্যা গুণফলে ডানদিক থেকে গুণে বাদ দিয়ে দশমিক বিন্দুটি বসে। ভাগের সময়ও দশমিক বিন্দু তুলে দিয়ে সাধারণ ভাগ করে ভাজ্যের দশমিক বিন্দুর পর যতগুলি সংখ্যা আছে তা থেকে ভাজকের দশমিক বিন্দুর পর যতগুলি সংখ্যা আছে তাকে বাদ দিয়ে বিয়োগফলের সমান সংখ্যা ভাগফলে ডানদিক থেকে গুণে বাদ দিয়ে দশমিক বিন্দুটি বসে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে নিয়মটি প্রতিষ্ঠিত করবেন শিক্ষকমহাশয়।

উদাহরণ 1. 27·3465 ÷ ·45

$$=\frac{273465}{10000}\times\frac{100}{45}$$

$$=\frac{273465}{45}\times\frac{100}{10000}$$

$$=6077\times\frac{1}{100}$$

$$=60{\cdot}77$$

এখানে ভাজ্যে দশমিক বিন্দুর পর 4টি সংখ্যা আছে এবং ভাজকে আছে 2টি; ভাগফলে 2টি (4 − 2) সংখ্যা বাদ দিয়ে দশমিক বিন্দু বসেছে।

যখন ভাজ্যে দশমিক বিন্দুর পর যতগুলি সংখ্যা আছে ভাজকে তা অপেক্ষা বেশী থাকবে, তখন ভাজকের দশমিক বিন্দুর পরে যতগুলি সংখ্যা বেশী আছে, ভাজে ততগুলি 0 শূন্য বসিয়ে নিতে হবে। দশমিক বিন্দু উঠে যাবে। যেমন—

$$31{\cdot}5 \div {\cdot}45$$

$$=\frac{315}{10}\times\frac{100}{45}$$

$$=\frac{315}{45}\times 10=\frac{3150}{45}$$

পদ্ধতি 2. ভাজককে পূর্ণসংখ্যায় পরিবর্তন করা।

ভাজককে পূর্ণসংখ্যায় পরিবর্তিত করতে দশমিক বিন্দুকে যে কয়টি ঘর সরাতে হবে ভাজ্যের দশমিক বিন্দুটিও সেই কয় ঘর সরাতে হবে। তারপর ভাগ করতে হবে। ভাগক্রিয়ায় ভাজ্যের দশমিক বিন্দু যখন এসে পড়বে ভাগফলে তখনই দশমিক বিন্দু বসবে।

উদাহরণ 1. $27{\cdot}3465 \div 45$

$$= \frac{27{\cdot}3465}{{\cdot}45}$$

$$= \frac{27{\cdot}3465 \times 100}{45}$$

$$= \frac{2734{\cdot}65}{45}$$

```
       60·77
  45) 2734·65 (
      270
      ---
        346
        315
        ---
         315
         315
         ---
```

পদ্ধতি 3. আদর্শ আকার পদ্ধতি (Standard form Method) :

এই পদ্ধতিতে দশমিক বিন্দুর স্থান প্রয়োজন মত পরিবর্তন করে ভাজককে 1 থেকে 10 এর মধ্যে একটি সংখ্যায় রূপান্তরিত করা হয়। ভাজকের পরিবর্তন অনুযায়ী ভাজ্যের দশমিক স্থান পরিবর্তন করতে হবে। এখন সাধারণ ভাগের নিয়মে ভাগ করতে হবে। ভাগফলের প্রথম অঙ্ক ভাজ্যের এমন স্থানে উপর বসবে যাতে দশমিক বিন্দু ভাজ্যের দশমিক বিন্দুর উপর পড়ে।

উদাহরণ। $27{\cdot}3465 \div {\cdot}45$

$$= \frac{27{\cdot}3465}{{\cdot}45} = \frac{273{\cdot}465}{4{\cdot}5}$$

```
          60·77
  4·5)  273·465 (
        270
        ---
          346
          315
          ---
           315
           315
           ---
```

আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ—

শিক্ষার্থীরা সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করতে গিয়ে এমন কতকগুলি ভগ্নাংশের সঙ্গে নিজেরাই পরিচিত হবে যেগুলি সসীম দশমিক ভগ্নাংশ নয়। সেগুলির দশমিক ভগ্নাংশে এক বা একাধিক সংখ্যা বার বার আসে এবং কোথাও ছেদ পড়ে না। যেমন—

$\frac{1}{3} = \cdot 3333 \ldots\ldots$, $\frac{1}{7} = \cdot 14285714285714 \ldots\ldots$,

$\frac{1}{9} = \cdot 11111 \ldots\ldots$. $\frac{1}{11} = \cdot 090909 \ldots\ldots$,

$\frac{1}{13} = \cdot 07692307692307 \ldots\ldots$,

এরূপ ক্ষেত্রে দশমিক ভগ্নাংশের সংখ্যাগুলি পুনঃ পুনঃ না লিখে, যেগুলি পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হচ্ছে তাদের মাথায় একটি করে বিন্দু প্রতীক দেওয়া যেতে পারে। এই নতন বিন্দু প্রতীকটির অর্থ হবে—যে এক বা একাধিক সংখ্যার মাথায় বিন্দুটি থাকবে সেটির বা সেগুলির পুনরাবৃত্তি হবে। যেমন,

$\cdot\dot{3} = \cdot 3333\ldots$, $\cdot 1\dot{2}\dot{3} = \cdot 1232323\ldots$

$\cdot\dot{0}7692\dot{3} = \cdot 076923076923076923\ldots$

এখন $\frac{1}{3} = \cdot 3\frac{1}{3} = \cdot 33\frac{1}{3} = \cdot 333\frac{1}{3} = \cdot 3333\ldots = \dot{3}$

আবার $\cdot 3\frac{1}{3} = \dfrac{3\frac{1}{3}}{10} = \dfrac{\frac{10}{3}}{10} = \frac{1}{3} = \frac{3}{9}$. $\therefore\ \cdot\dot{3} = \frac{3}{9} \ldots\ldots (1)$

অনুরূপে, $\frac{1}{9} = \cdot 1\frac{1}{9} = \cdot 11\frac{1}{9} = \cdot 111\frac{1}{9} = 1111\ldots\ldots = \cdot\dot{1}$

আবার, $\cdot 1\frac{1}{9} = \dfrac{\frac{10}{9}}{10} = \frac{1}{9}$. $\therefore\ \cdot\dot{1} = \frac{1}{9}$. $\ldots\ldots (2)$

আবার $\frac{23}{99}$ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করলে দেখা যাবে ইহা $\cdot\dot{2}\dot{3}$ আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশের সমান। অর্থাৎ

$$\frac{23}{99} = \cdot 23\frac{23}{99} = \cdot 2323\frac{23}{99} = \cdot 232323\ldots\ldots = \cdot\dot{2}\dot{3}$$

কিন্তু $\cdot 23\frac{23}{99} = \dfrac{23\frac{23}{99}}{100} = \dfrac{2300}{9900} = \dfrac{23}{99}$ $\therefore\ \cdot\dot{2}\dot{3} = \dfrac{23}{99}$ $\ldots\ldots (3)$

(1), (2) ও (3) থেকে দেখতে পাওয়া গেল যে কোন আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করতে হলে যতগুলি দশমিক সংখ্যার উপর আবৃত্ত দশমিকের বিন্দু থাকবে, ভগ্নাংশের হরে ততগুলি 9 বসাতে হবে।

আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশে এমন দু-একটি সংখ্যা থাকতে পারে যাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। যেমন—$\cdot 2\dot{8}\dot{4}$, $\cdot 15\dot{3}\dot{7}$ ইত্যাদি।

এখন, $\cdot 2\dot{3}\dot{4} = \dfrac{2\cdot\dot{3}\dot{4}}{10} = \dfrac{2\frac{34}{99}}{10} = \dfrac{232}{990} = \dfrac{234-2}{990}$.

আবার, $\cdot 15\dot{3}\dot{7} = \dfrac{15\cdot\dot{3}\dot{7}}{100} = \dfrac{15\frac{37}{99}}{100} = \dfrac{1522}{9900} = \dfrac{1537-15}{9900}$

এইরূপ আরো কয়েকটি অঙ্ক কষলে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারবে যে এই জাতীয় আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশে পরিণত করতে হলে ভগ্নাংশের হার আবৃত্ত সংখ্যা কয়টির প্রত্যেকটির জন্য একটি করে 9 বসবে এবং যে সংখ্যাগুলির উপর আবৃত্ত প্রতীক বিন্দুটি নেই সেগুলির প্রত্যেকটির জন্য একটি করে 0 বসবে। সমস্ত সংখ্যাটি থেকে আবৃত্ত প্রতীক-বর্জিত সংখ্যাগুলি বাদ দিয়ে লবে বসবে।

মেট্রিক পদ্ধতি (**Metric System**) :

পরিমাপ ও মুদ্রায় দশমিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রচলন করে মেট্রিক পদ্ধতি। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফরাসী দেশে ইহার প্রথম প্রচলন হয়। একটি পরিমাপ পদ্ধতি এইং দৈর্ঘ্যের একক নির্ণয় করার জন্য 1790 খৃষ্টাব্দে ফরাসী সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন স্থির করেন যে, মেরিডিয়নের (meridian) এক পাদের (quadrant) কোটি ভাগের এক ভাগ হবে দৈর্ঘ্যের একক। ডানকার্ক ও বার্সিলোনার অন্তর্বর্তী একটি স্থানের দৈর্ঘ্যনির্ণয়ের দ্বারা এই পরিমাপ স্থির করা হয়। এই দৈর্ঘ্যটি এক মিটার বলা হয়। পরবর্তী কালে দেখা যায় যে, এই পরিমাপটি সঠিক নয়। বর্তমানে প্যারী সহরে রক্ষিত একটি আদর্শ মাপের দণ্ডের দৈর্ঘ্যকে এক মিটার ধরা হয়।

ভারতে 1957 সালের 1লা এপ্রিল থেকে দশমিক মুদ্রা চালু হয়েছে। দশমিক মুদ্রায় টাকার মান ও নাম অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু পয়সার মান বদল হয়েছে। আগে টাকাকে 64 পয়সায় ভাগ করা হত। নতুন ব্যবস্থায় 100 নয়া পয়সায় (বর্তমানে পয়সা বা পয়সে) ভাগ করা হয়েছে। 1955 সালের সেপ্টেম্বর মাসে লোকসভায় আইন পাস করে ভারত সরকার মুদ্রা সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 1956 সাল থেকেই দশমিক ওজন কিছু কিছু চালু হয় এবং 1960 সালের 1লা অক্টোবর থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে দশমিক ওজন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়। পূর্বে ওজন করা হত মণ, সের, ছটাকে। নতুন বিধানে কুইন্টাল, কিলোগ্রাম, গ্রাম ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। ওজনের ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার করা হয়েছে। আগেকার মণ, সের, ছটাক প্রভৃতির মান বা নাম কিছুই নতুন ওজনে স্থান পায়নি। প্রথম প্রথম দুই রকম মুদ্রা ও পরিমাপ পাশাপাশি চালু রাখা হয়েছিল। সরকার প্রকাশিত পরিবর্তন তালিকার (Conversion Table) সাহায্যে নতুন ও পুরাতন পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য করা হত। এতে স্বাভাবিকভাবেই খুব অসুবিধা হত। কারণ পুরাতন 64 পয়সা = 100 নয়া পয়সা, অর্থাৎ 1 পয়সা = $\frac{25}{16}$ নয়া পয়সা। কিন্তু নয়া পয়সার ভগ্নাংশ তো নেই। ফলে কখনও বেশী এবং কখনও কম নয়া পয়সায় পুরাতন মুদ্রার পরিবর্তন করতে হত।

মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপে মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তনে অনেক সুবিধা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও দৈনন্দিন জীবনের হিসাব-নিকাশ এই পদ্ধতি অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ পদ্ধতিটির গাণিতিক দিকটি শুধু মাত্র দশমিক ভগ্নাংশের অঙ্কের

উপর নির্ভরশীল। পদ্ধতিটি শেখা যেমন সহজ, ব্যবহার করাও তেমনি সহজ। পদ্ধতিটি প্রবর্তন হওয়ার ফলে সারা দেশে একই রকম ওজন ও পরিমাপ ব্যবহৃত হচ্ছে। পৃথিবীর বহু দেশ এই পদ্ধতি গ্রহণ করায় বর্তমানে মুদ্রা ও ওজন পরিমাপের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি হিসাবে ইহা ক্রমশ স্থান গ্রহণ করছে।

দশমিক পদ্ধতি শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মেট্রিক পদ্ধতি শেখানো উপযুক্ত। কারণ মেট্রিক পদ্ধতিও দশমিক পদ্ধতি। অতিরিক্তের মধ্যে আছে বিভিন্ন এককের নামগুলি শেখা। এইগুলি ছাত্রদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেখাতে হবে।

ঐকিক নিয়ম:

কয়েকটি জিনিসের দাম, ওজন ইত্যাদি দেওয়া থাকলে একটি বা অন্য কয়েকটি জিনিসের দাম, ওজন প্রভৃতি যে পদ্ধতিতে বার করা হয় তাকে ঐকিক নিয়ম বলে। ঐকিক নিয়ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়াই শেখানো উচিত। সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়েই দেখাতে হবে যে এই জাতীয় সমস্যাগুলি চার জাতীয় হয়—

(১) গুন ক্রিয়া নির্ভর সমস্যা

(২) ভাগ ক্রিয়া নির্ভর সমস্যা

(৩) গুন ও ভাগ ক্রিয়া সমন্বিত সমস্যা

(৪) গুন ও ভাগ ক্রিয়া সমন্বিত ব্যস্ত সমস্যা

(পাঠটীকা দ্রঃ)

অনুপাত ও সমানুপাত (Ratio and Proportion):

একটি সংখ্যার আর একটি সংখ্যার সঙ্গে যে সম্বন্ধ বা একটি বস্তুর কিছু পরিমাণের সঙ্গে সেই বস্তুর বা সমজাতীয় বস্তুর সম বা অসম পরিমাণের যে সম্বন্ধ তাকে **অনুপাত** বলে। যেমন 5,7-এর সঙ্গে যে সম্বন্ধ করে বা 5টি কলা 7টি কলার সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাকে সংখ্যা দুটির বা কলার পরিমাণ দুটির অনুপাত বলে। দুটি ভিন্ন বস্তুর পরিমাণ সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং দুটি ভিন্ন বস্তুর অনুপাত হয় না। যেমন, 5টি কলা ও 7টি আমের অনুপাত হয় না। একটি সংখ্যা আর একটি সংখ্যার বা কোন বস্তুর একটি পরিমাণ সেই বস্তুর বা সমজাতীয় বস্তুর আর একটি পরিমাণের কত গুন বা কত অংশ—তা যে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই সংখ্যাকেই প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়ের অনুপাত বলা হয়। যেমন, 8 টাকার সঙ্গে 4 টাকার অনুপাত 2। আবার 2টি আমের সঙ্গে 8টি আমের অনুপাত $\frac{1}{4}$ ও 50 পয়সার সঙ্গে 3·50 টাকার অনুপাত $\frac{1}{7}$। মনে রাখতে হবে যে, **অনুপাত একটি সংখ্যা,—বস্তু নয়।**

5 এর সঙ্গে 7 এর অনুপাত সাধারণতঃ 5 : 7 লেখা হয়। : চিহ্নটি অনুপাতের প্রতীক। 6, 3-এর কতগুন বার করতে আমরা 6-কে 3 দিয়ে ভাগ করি। সুতরাং $6 : 3 = \frac{6}{3}$, আবার 3, 6-এর কত অংশ বার করতেও 3-কে 6 দিয়ে ভাগ করতে হয়। অতএব $3 : 6 = \frac{3}{6}$। ভগ্নাংশে ভাগ চিহ্নের (÷) বিন্দু দুটি বাদ দিয়ে শুধু 'বার'

চিহ্নটি (—) ব্যবহার করা হয়। আর অনুপাতে 'বার' চিহ্নটি বাদ দিয়ে বিন্দু চিহ্ন দুটি (:) রাখা হয়।

দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে হলে তাদের একই এককে নিয়ে যেতে হয়। কাজেই অনুপাত নির্ণয়ে বস্তু দুটি এক বা একজাতীয় হওয়া দরকার। যেমন, 2 টাকা ও 45 পয়সার অনুপাত হবে $\frac{2\times 100}{45}$ বা $\frac{40}{9}$ ভগ্নাংশটির সমান।

ভগ্নাংশের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে কোন ভগ্নাংশের লব ও হরকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে ভগ্নাংশটির মান অপরিবর্তিত থাকে। যেমন,—$\frac{5}{7}=\frac{10}{14}=\frac{15}{21}=\frac{20}{28}$ ইত্যাদি। সুতরাং, দুটি সমজাতীয় বস্তুর উভয়কেই একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে, অনুপাতটি অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন, 2 টাকা : 45 পয়সা অনুপাতটি 4 টাকা : 90 পয়সা বা 6 টাকা : 1·45 টাকা অনুপাতের সমান। অনুরূপে অনুপাতের বস্তু দুটিকে একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেও অনুপাতটি অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন, 3 টাকা : 12 পয়সা অনুপাতটি $\frac{3}{2}$ টাকা : 6 পয়সা বা $\frac{3}{4}$ টাকা : 3 পয়সা অনুপাতের সমান। এখন শিক্ষার্থীদের সমানুপাত সম্বন্ধে ধারণা দিলে তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না।

যখন দুটি অনুপাত সমান হয়, তখন তাকে **সমানুপাত** বলে। এখন স্পষ্টতঃই $\frac{3}{5}=\frac{9}{15}$। তাহলে বলা যেতে পারে 3-এর সঙ্গে 5-এর যে অনুপাত, 9-এর সঙ্গে 15-র সেই অনুপাত। এই সমানুপাতকে প্রকাশ করা হয় এইভাবে—3 এর সঙ্গে 5-এর যে সম্বন্ধ, 9-এর সাথে 15-এর সেই সম্বন্ধ এবং গণিতের ভাষায় উহাকেই লেখা হয়।

3 : 5 :: 9 : 15

সমানুপাত সম্বন্ধে আরো পরিষ্কার ধারণা দেবার জন্য একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক—

	1 মিটার	কাপড়ের	দাম	5 টা.	
তা হলে	2	"	"	" 10	"
	3	"	"	" 15	"
	4	"	"	" 20	"
	5	"	"	" 25	"
	10	"	"	" 50	"
	15	"	"	" 75	"
	20	"	"	" 100	"

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যে অনুপাতে কাপড়ের পরিমাণ বাড়ে, সেই অনুপাতে উহার দামও বাড়ে। সুতরাং যে কোনও দুটি কাপড়ের পরিমাণের অনুপাত উহাদের দামের অনুপাতের সমান। কাপড় দুটির পরিমাণ যদি 4 মিটার ও 10 মিটার করা

হয়, উহাদের দাম হবে যথাক্রমে 20 টাকা ও 50 টাকা। কিন্তু $\frac{4}{10}$ ও $\frac{20}{50}$ ভগ্নাংশ দুটি সমান। অতএব 4 : 10 :: 20 : 50

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক—

	1 জন লোক একটি জমি বেড়া দেয় 64 দিনে							
তা হলে	2	"	"	সেই	"	"	" 32	"
	4	"	"	"	"	"	" 16	"
	8	"	"	"	"	"	" 8	"
	16	"	"	"	"	"	" 4	"

এখানে জনসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ে দিনসংখ্যা সেই অনুপাতে কমে। যে কোন দুটি ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকসংখ্যার অনুপাত কাজ সম্পন্ন করার দিনসংখ্যার অনুপাতের বিপরীত। একটি ক্ষেত্রে যদি 2 জন নিযুক্ত হয় এবং আর একটি ক্ষেত্রে 8 জন নিযুক্ত হয়, কর্ম-সম্পাদনের দিন-সংখ্যা হবে যথাক্রমে 32 ও 8। কিন্তু $\frac{2}{8}$ ও $\frac{8}{32}$ ভগ্নাংশ দুটি সমান। অতএব 2 : 8 :: 8 : 32।

প্রথম উদাহরণের সমানুপাতকে **সরল সমানুপাত** (Direct Proportion) এবং দ্বিতীয় উদাহরণের সমানুপাতকে **বিপরীত সমানুপাত** (Inverse Proportion) বলে।

সমানুপাতের নিয়ম প্রয়োগে কত সহজে সমস্যার সমাধান করা যায় তা কয়েকটি অঙ্ক দিয়ে দেখতে হবে। যেমন, 2 কে. জি. চায়ের দাম যদি 22·60 টাকা হয়, তবে 79·10 টাকায় কত কে. জি. চা পাওয়া যাবে।

মনে করি, 79·10 টাকায় x কে. জি. চা পাওয়া যাবে। তাহলে,

চা	দাম
x	79·10
2	22·60

অথবা, $\frac{x}{2}=\frac{79\cdot10}{22\cdot60}$

বা, $x=\frac{79\cdot10\times2}{22\cdot60}=7$ কে. জি.

শতকরা হিসাব (Percentage) :

শতকরা মানে প্রতি শতে। 'শতকরা হিসাব' কথার অর্থ হল 'প্রতি শতের জন্য' (for every hundred)। শতকরার ধারণাটি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা অবলম্বন করেই শেখানো উচিত।

উদাহরণ। তুমি 170 টাকার বই কেনার জন্য বইয়ের দোকানে গেলে। দোকানী অর্ডারটি পাবার জন্য তোমাকে কিছু ছাড় দিতে রাজী হল। মনে করা যাক, সে প্রতি 100 টাকায় 10 টাকা বাদ দিল।

এই শতে 10 টাকা ছেড়ে দেওয়া শতকরার উদাহরণ এবং ঐ হিসাবে 170 টাকায় যে টাকা বাদ যাবে তাহাই শতকরা হিসাব।

শতকরার চিহ্ন %। যেমন 4%, প্রতি শতে 4 ; $\frac{3}{4}$ %, প্রতি শতে $\frac{3}{4}$; 150% প্রতিশতে 150 ; 100 % প্রতি শাতে 100। 100 % বলতে সম্পূর্ণ জিনিসটি বোঝায়।

শতকরা হিসাব স্থরু করা উচিত অনুপাত ও সমানুপাতের সাহায্যে। যেমন, 300র 4 % বলতে আমরা এমন একটি সংখ্যা বুঝি, 300র সঙ্গে যার অনুপাত, 100র সঙ্গে 4 এর অনুপাতের সমান। অর্থাৎ $300 : x :: 100 : 4$

বা $\dfrac{x}{300}=\dfrac{4}{100}$

অতএব 300র 4 % $=\dfrac{4}{100}\times 300$

অনুরূপে, 500র 7 % $=\dfrac{7}{100}\times 500$

150 এর 250% $=\dfrac{250}{100}\times 150$

200র $\frac{1}{5}$% $=\dfrac{\frac{1}{5}}{100}\times 200$

400র 100% $=\dfrac{100}{100}\times 400$

এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে

M-এর x % $=\dfrac{x}{100}\times M$

স্পষ্টতঃ x % এবং $\dfrac{x}{100}$ ভগ্নাংশটি সমান। %চিহ্নটি ভাগ চিহ্নেরই রূপান্তর— এই ধারণাটি শিক্ষক দেবেন। এতে শতকরা ও ভগ্নাংশের মধ্যে নিকট সম্পর্কটি পরিষ্কার হবে।

ভগ্নাংশে ছাত্ররা শিখেছে যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দুটি ভগ্নাশের তুলনা, যোগ বা বিয়োগ করতে হলে ভগ্নাংশ দুটিকে এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে, যাতে তাদের হরগুলি একই মানের হয়। এই শিক্ষা থেকেই তারা সহজে বুঝতে পারবে যে, হরটির মান 100 করে ভগ্নাংশগুলিকে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করার কি স্থবিধা। যেমন,

$$\frac{5}{6}=\frac{\frac{5}{6}\times 100}{100}=\frac{83\frac{2}{3}}{100}=83\tfrac{2}{3}\ \%$$

$$\frac{11}{13}=\frac{\frac{11}{13}\times 100}{100}=\frac{84\frac{8}{13}}{100}=84\tfrac{8}{13}\ \%$$

এখানে $\frac{11}{13}$ যে $\frac{5}{6}$ অপেক্ষা বড় সেটা বেশ পরিষ্কার।

দ্বিতীয় বৎসরের শেষে,

$$\text{সবৃদ্ধিমূল} = \left\{300\left(1+\frac{6}{100}\right)+300\left(1+\frac{6}{100}\right)\left(\frac{6\times1}{100}\right)\right\} \text{ টাকা}$$

$$= 300\left(1+\frac{6}{100}\right)\left(1+\frac{6}{100}\right) \text{ টাকা}$$

$$= 300\left(1+\frac{6}{100}\right)^2 \text{ টাকা}$$

অনুরূপে তৃতীয় বৎসরের শেষে

$$\text{সবৃদ্ধিমূল} = 300\left(1+\frac{6}{100}\right)^3 \text{ টাকা}$$

আরোহী পদ্ধতিতে N-বৎসরের অন্তে

$$\text{সবৃদ্ধিমূল} = 300\left(1+\frac{6}{100}\right)^n$$

যদি আসল টাকা P হয় এবং সুদের হার বাৎসরিক r% হয় এবং সবৃদ্ধিমূল A হয়, তা হলে $A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$

$$\text{এবং } C.I. = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n - P$$

$$= P\left\{\left(1+\frac{r}{100}\right)^n - 1\right\}$$

ক্ষেত্রফল ও আয়তন (Area and volume) :

ক্ষেত্রফল (Area) : প্রচলিত পদ্ধতি প্রথা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শেখানো হয়। এতে ছাত্রদের ধারণা হয় যে আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রফল হয়। বিষম আকারের তলের যে ক্ষেত্রফল হতে পারে তা তাদের ধারণা হয় না। যদিও সুরুতে আয়তক্ষেত্রে নিয়ে পরে অন্যবিধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শেখানো যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি মনে হয়; কিন্তুআমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষণে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হবে মনোবিজ্ঞানসম্মত। যে মূল ধারণা আমরা দিতে চাই সেটা যাতে ছাত্ররা নিজেদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সমস্যার মাধ্যমে আবিষ্কার করে সেদিকে নজর দেওয়াই হবে আমাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী।

শিশুরা নানা আকারের তল দেখে। প্রত্যেক আকারের তলের যে পরিমাপ আছে —এই ধারণাটি দেওয়া আগে দরকার। ক্ষেত্রফল বলতে তাদের বুঝতে হবে যে তাহা একটি তলের পরিমাপ—সে তলের আকার যাহাই হ'ক না কেন। দুটি ভিন্ন আকারের তলের মধ্যে কোনটি বড় ও কোনটি ছোট পরিমাপের দ্বারাই প্রথম ধারণাটি দেওয়া

উচিত। তল দুটির মাপের তুলনা করতে গিয়ে তারা একটা বাস্তব সমস্যা দেখতে পারে এবং বুঝতে পারবে যে তল দুটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করে, অংশগুলি গণনা করে কোনটি বড় এবং কোনটি ছোট স্থির করা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি ম্যাপে একটি হ্রদ ও একটি বন দেখিয়ে, উহাদের মধ্যে কোনটি বেশী ক্ষেত্র জুড়ে আছে তা তাদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এখানে যদি উপরিপাতের দ্বারা তুলনা করা সম্ভব না হয় (অঙ্কনের সাহায্যে) তাহলে ইহার একমাত্র সমাধান করা যাবে বর্গাকৃতি ছবি কাটা কাগজে (squared paper) উহাদের অঙ্কন করে এবং প্রত্যেকটিকে কতগুলি বর্গ আছে তা গণনা করে। ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে এই ক্ষুদ্রাকৃতি বর্গ গণনাই যে মূল ধারণা এটাই আমরা ভুলে যাই। আধুনিক শিক্ষায় এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া দরকার। এই ধারণা থেকেই তারা বুঝবে একক গ্রহণের উপযোগিতা এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে উপযুক্ত একক গ্রহণের সার্থকতা।

বাস্তব পরিমাপের অসংখ্য সুযোগ শ্রেণী কক্ষেই শিক্ষক পাবেন। যেমন, শ্রেণীকক্ষের মেঝের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা, ব্ল্যাকবোর্ডের ক্ষেত্রফল গণনা করা ; শ্রেণী কক্ষেই এমন একটি স্থান আবিষ্কার করা যার ক্ষেত্রফল হবে এক বর্গ মিটার, ইত্যাদি। ক্ষেত্রফল সম্বন্ধে ধারণাটি পরিষ্কার হলে, আয়তক্ষেত্র নির্ণয়ের নিয়মটি শিখতে ছাত্রদের অসুবিধা হবে না।

ধারণাটি ছাত্রদের মনে ঠিকমত গেঁথে গেলে জ্যামিতিতে ক্ষেত্রফল সম্বন্ধে যে সমস্ত উপপাদ্য আছে সেগুলিও উপযুক্ত সময়ে তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না।

আয়তন (Volume)ঃ ক্ষেত্রফল সম্বন্ধে যা বলেছি, আয়তন সম্পর্কেও একই কথা বলতে চাই। প্রথমে ছাত্রদের বাস্তব উদাহরণ সাহায্যে আয়তনের ধারণা দিতে হবে, যেমন ভাবে ক্ষেত্রফলের ধারণা দেওয়া হয়েছে। ধারণাটি সুস্পষ্ট হলে, আয়তঘনের আয়তন বার করার নিয়মটি শেখানো হবে।

বর্গমূল ঃ

বর্গমূল বোঝাতে হলে প্রথমে বর্গফল সম্বন্ধে ছাত্রদের ভালো ধারণা দিতে হবে। **কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে, গুণফলকে সংখ্যাটির বর্গফল বলে। মূল সংখ্যাকে গুণফলের বর্গমূল বলে।** যেমন, 6-এর বর্গফল $=6\times6=36$; সুতরাং 36-এর বর্গমূল 6। সংখ্যার ডান দিকে একটু উপরে 2 লিখে সংখ্যাটির বর্গসংখ্যা প্রকাশ করতে হয়। যেমন 7-এর বর্গসংখ্যা 7^2। আবার সংখ্যার আগে '$\sqrt{}$' চিহ্ন দিয়ে অথবা সংখ্যার ডানদিকে একটু উপরে $\frac{1}{2}$ লিখে সংখ্যাটির বর্গমূল প্রকাশ করা হয়।

যেমন, 9-এর বর্গমূল $\sqrt{9}$ বা $9^{\frac{1}{2}}$।

যেমন শিক্ষার্থীকে উৎপাদকের সাহায্যে বর্গমূল শেখাতে হবে। যেমন,

$$\therefore\ 225=3\times3\times5\times5=3^2\times5^2$$

$$\therefore\ \sqrt{225}=\sqrt{3^2\times5^2}=\sqrt{3^2}\times\sqrt{5^2}=3\times5=15.$$

আবার, $324 = 2\times2\times3\times3\times3\times3 = 2^2\times3^2\times3^2$

$\therefore \sqrt{324} = \sqrt{2^2\times3^2\times3^2} = \sqrt{2^2}\times\sqrt{3^2}\times\sqrt{3^2}$

$= 2\times3\times3 = 18$

অর্থাৎ কোন সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করতে হলে, প্রথমে সংখ্যাটিকে এক বা একাধিক সংখ্যার গুণফলরূপে প্রকাশ করতে হবে। তারপর ঐ সংখ্যাগুলির পৃথক পৃথক ভাবে বর্গমূল নিয়ে গুণ করলেই মূল সংখ্যার বর্গমূল পাওয়া যাবে।

ভগ্নাংশের বর্গমূল বার করবার সময় ভগ্নাংশের লব ও হরের পৃথকভাবে বর্গমূল বার করতে হবে। মিশ্র ভগ্নাংশকে প্রথমে অমিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করে নিতে হবে। যেমন,

$$\sqrt{1\frac{17}{64}} = \sqrt{\frac{81}{64}} = \sqrt{\frac{9^2}{8^2}} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$$

বর্গমূল বার করার আর একটি নিয়ম শেখানো যেতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে যে সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে তার একক থেকে বামদিকে 2টি করে অঙ্ক জোড়া দিয়ে নিতে হয় এবং দশমিক বিন্দুর পর অঙ্ক সংখ্যা থাকলে, এককের পর থেকে ডান দিকে 2টি করে অঙ্ক জোড়া দিতে হয়। শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝেছে যে 1 বা 2 অঙ্কের সংখ্যার বর্গমূল 1 অঙ্কের সংখ্যা হয়; 3 বা 4 অঙ্কের সংখ্যার বর্গমূল 2 অঙ্কের সংখ্যা হয়; 5 বা 6 অঙ্কের সংখ্যার বর্গমূল 3 অঙ্কের সংখ্যা হয়। সুতরাং এটা তারা বুঝতে পারবে যে দশমিক বিন্দুর আগে বা পরে যত জোড়া অঙ্ক থাকবে বর্গমূলও ততগুলি অঙ্কের একটি সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। উদাহরণের সাহায্যে নিয়মটি শেখাতে হবে। মনে করা যাক, 1095·874816 সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে।

	3	3	·1	0	4
	10	95	·87	48	16
	9				
63	1	95			
	1	89			
661		6	87		
		6	61		
66204			26	48	16
			26	48	16

নির্ণেয় বর্গমূল = 33·104.

অধ্যাপক P. Nunn জ্যামিতির সাহায্যে এই পদ্ধতিটির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সমস্যা। 21·16র বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে।

১নং চিত্রে ক্ষেত্রফল AQ = 16 বর্গ সে. মি. এবং ক্ষেত্রফল AP = 25 বর্গ সে মি.। মনে করি, ACর ক্ষেত্রফল 21·16 বর্গ সে. মি.। এখানে AX = 4 সে. মি.

এবং AY=5 সে. মি.। অতএব AB 4 ও 5 সে. মি. এর মধ্যে থাকবে। ১নং চিত্র থেকে দেখা যায় যে $R+S+T=21\cdot16-16=5\cdot16$ বর্গ সে. মি.।

আমাদের সমস্যা XB দৈর্ঘ্যটি নিরূপণ করা।

এখন $XQ=QL=4$ সে. মি.

$\therefore$ 5·16 বর্গ সে. মি. $=R+T+S$

$=XB.XZ$ (২নং চিত্র)

$=XB\,(XQ+QL+LZ)$

$=XB\,(8+LZ)$

অথবা; $XB=\dfrac{5\cdot16}{8+LZ}$ সে. মি

$\dfrac{5\cdot16}{8}$ সে. মি.

$<6\cdot5$ সে. মি.

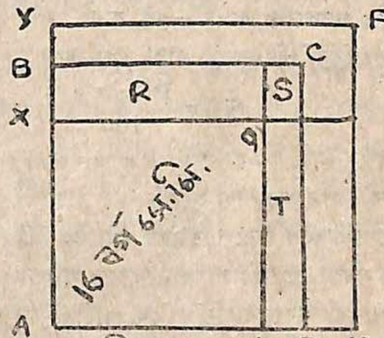
মনে করি, $XB=\cdot6$ সে. মি.

এখন, $8\cdot6\times\cdot6$ সে. মি.

$=5\cdot16$ বর্গ সে. মি.

$=AC$

$\therefore\ \sqrt{21\cdot16}=4\cdot6$



চিত্র ১



চিত্র-২

ধাপগুলি নীচে দেওয়া হল

```
        4+·6
     ----------
  4 | 21 16
    | 16
     ----------
8+·6| 5·16
    | 5·16
```

আরো কতকগুলি অনুরূপ সমস্যা নিয়ে ছাত্রদের কাছে ধাপগুলি বোঝানো যাবে।

পাটীগণিতে বীজগণিতের প্রয়োগঃ—

শিশু অল্প বয়সেই 'গোপালের' বদলে 'গো' লিখলে, 'পশ্চিম বঙ্গেম' বদলে পঃ বঃ বা 'পয়সার' বদলে 'পঃ' লিখলে বুঝতে পারে। বর্ণকে সংখ্যার প্রতিনিধিরূপে ব্যবহার করলেও সে সহজেই বুঝতে পারে। এতে অনেক সমস্যার সমাধান করার সুবিধা

প্রমাণ উপলব্ধি করার মানসিক প্রস্তুতির কাজ এতে হবে। যে সমস্ত সমস্যা বাস্তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের সামান্যীকরণ, সেগুলির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—দৈর্ঘ্যের একক সংখ্যা ও প্রস্থের একক সংখ্যার গুণফল ক্ষেত্রফলের বর্গ একক সংখ্যার সমান,—এই সূত্রটির বিশেষ বিশেষ পরিমাপের জ্যামিতিক চিত্র অবলম্বন করে একটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। উপরিপাতের (Superposition) দ্বারা জ্যামিতিক সূত্রের ধারণাও দেওয়া যেতে পারে পাটীগণিতের শিক্ষার ভিতর দিয়ে। যেমন, একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু ও অন্তর্ভুক্ত কোণ আর একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু ও অন্তর্ভুক্ত কোণের সমান হলে ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হবে—এই উপপাদ্য উপরিপাতের সাহায্যে শিশুদের দেখানো যেতে পারে। শুধুমাত্র দেখতে হবে যে, যে বিষয়গুলি পাটীগণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলি যেন পাটীগণিতের বিষয়বস্তু ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং তাদের সত্যতা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। আক্ষরিক পাটীগণিত (literal arithmetic) ও মূর্ত জ্যামিতি (mensuration) পাটীগণিতের অঙ্গীভূত হওয়া দরকার।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের অবহিত করবেন :

ক। **সম্ভাব্য উত্তর (Estimate) :** কোন অঙ্কের উত্তর সম্বন্ধে আগে থেকে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারলে মারাত্মক ভুলের হাত থেকে ছাত্রেরা নিষ্কৃতি পেতে পারে। সম্ভব হলে প্রথমেই এটা করা দরকার। যেমন, 472×326 গুণফল নির্ণয়ে আমরা অনুমান করতে পারি যে গুণফলটি 500×300 অর্থাৎ 150000-এর কাছাকাছি হবে। আরো বলা যেতে পারে যে, উত্তরটি 500×330 অর্থাৎ 165000-এর কম হবে এবং 470×300 অর্থাৎ 141000-এর বেশী হবে। এ থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে, উত্তরটি 6-অঙ্কের একটি সংখ্যা হবে এবং বামদিক থেকে শেষ অঙ্ক 3টি 141 ও 165-র মধ্যে থাকবে। এই তথ্যটি জানা থাকলে ছাত্রের গুণফলে মারাত্মক ভুল হবে না। নম্বর দেবার সময় যে তারতম্যের নীতি অনুসরণ করা হয়, সে দিক থেকে যে ছাত্রের উত্তরে ভুল হবে কিন্তু উত্তরটি 150000-এর কাছাকাছি থাকবে তার অন্ততঃ 10-এর মধ্যে 5 পাওয়া উচিত ও আর যার উত্তরে অন্যান্য অঙ্কগুলি ঠিক থেকেও বামদিক থেকে শেষের অঙ্ক দুটি 14 থেকে 16-এর মধ্যে থাকবে না তার 2 বা 0 নম্বর পাওয়া উচিত। সুতরাং, সম্ভাব্য উত্তরটি অনুমান করার কৌশলটি শিক্ষক ছাত্রদের শেখাবেন। তবে নজর রাখতে হবে যে, কৌশলটি প্রয়োগ করা যেন অনায়াসসাধ্য হয়; যতদূর সম্ভব মৌখিক হলেই ভালো হয়।

খ। **মিল করা (Check) :** গণিত চিন্তাধারা ও গণনায় নির্ভুলতার শিক্ষা দেয়। সমস্যার নির্ভুল সমাধানই গণিতের লক্ষ্য। কাজেই সমাধানটি ঠিক হয়েছে কিনা মেলানোর দরকার। আগেই আমরা সম্ভাব্য উত্তর অনুমান করা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ঐ কৌশলটি উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা তার একটা আভাস দেয়। কিন্তু উত্তর সঠিক বা নির্ভুল হয়েছে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। উত্তর

ঠিক হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার অনেক উপকারিতা আছে। উত্তরে ভুল হলে স্বভাবতঃই ছাত্রের মধ্যে একটা আত্ম-জিজ্ঞাসা জাগে – ভুলটি কোথায় হলো ? এই ভুল নির্ণয়ের মাধ্যমেই আরো ভালো করে সমস্যাটি উপলব্ধি করে। নিজের ভুলটি সে আবিষ্কার করে, সংশোধনের জন্য কখন কখন উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এবং ফলে তার দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি বাড়ে। নিজে পরীক্ষা করে উত্তর ঠিক হয়েছে বুঝতে পারলে ছাত্রের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গণিতের পাঠ্যপুস্তকে উত্তরমালা দেওয়া থাকে। ছাত্রেরা সাধারণতঃ তার সঙ্গেই নিজেদের উত্তরটি মিলিয়ে দেখে। এ অভ্যাস তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবেরই ইঙ্গিত বহন করে। তা ছাড়া বই-এর উত্তরে যদি মুদ্রণ-প্রমাদ থাকে (যা প্রায়ই দেখা যায়), তাহলে তাদের নিজেদের ভুলটি নির্ণয়ের জন্য অনাবশ্যক সময় নষ্ট ও হয়রান হতে হয়। কিন্তু উত্তরটি ভুল বা ঠিক হয়েছে—এ বিষয়ে যদি নিজেরা যাচাই করে তারা নিঃসন্দেহ হতে পারে, তাহলে তাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয় না।

ছাত্রদের নির্ভুলভাবে অঙ্ক করতে উৎসাহিত করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। তিনি দেখবেন যেন নির্ভুল উত্তর করার জন্য তাদের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে। এই কাজে তিনি সফল হবেন যদি তিনি তাদের মধ্যে উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা মেলাবার অভ্যাসটি তৈয়ারী করে দিতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রেই কৌশলের সাহায্যে উত্তর মেলানো যায়। আবার পরীক্ষা করেও জানা যায় উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা। পরীক্ষা বা কৌশলে মেলানো সম্ভব না হলে অঙ্কটি পুনরায় দেখতে হবে—কোথাও ভুল হয়েছে কিনা।

যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ মেলানোর কৌশলটি আমরা উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনাকালে দেখিয়েছি। পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই।

গ। রাফ কাজ (**Rough work**) :—অনেক সময় ছাত্রেরা আগে 'রাফ' কাজের দ্বারা অঙ্ক কষে। পরে সেটি পাকাপাকি ভাবে করে। ছাত্রদের এইভাবে রাফ কাজ করতে শিক্ষকের নিরুৎসাহিত করা উচিত। 'রাফ' কথাটির মধ্যে একটি তাচ্ছিল্য, একটা অমর্যাদার ভাব প্রকাশ পায়। ছাত্রেরাও রাফ কাজকে ঐভাবেই গ্রহণ করে। রাফ কাজ তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে করে না এবং ইহার দ্বারা তাদের অসম্পূর্ণ বাক্য রচনা করার অভ্যাস হয়। রাফ কাজে অস্পষ্টভাবে সংখ্যাগুলি লেখার ফলে পরিষ্কার করে অঙ্কটি আবার কপি করার সময় ভুল হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া কাজটি দু'বার করতে হয়—এতে সময় ও শক্তির অযথা অপব্যয় হয়। কপি করার সময় ভুল করলে, সে ভুলটি ধরা খুব কঠিন হয়।

সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন ধাপে অনেক সময় কিছু কিছু হিসাব করার দরকার হয়। এই হিসাবটি আলাদাভাবে অবশ্যই করতে হয়। এর জন্য যে পাতায় অঙ্কটি কষা হবে সেই পাতারই ডানদিকের মার্জিনটি ব্যবহার করা উচিত। অঙ্কের খাতায় ডানদিকে 1" বা $1\frac{1}{2}$" মার্জিন রাখার শিক্ষা ছাত্রদের দিতে হবে। এই মার্জিনে হিসাব-সংক্রান্ত কাজ পরিষ্কারভাবে—সমগ্র সমস্যাটি সমাধানের অঙ্গ হিসাবেই করার

অভ্যাস গঠন করাতে হবে। মার্জিনের কাজকে যেন ছাত্ররা রাফ কাজ না মনে করে, সেদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে। মার্জিনের কাজ সমগ্র কাজের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এতে কাজটি পরিচ্ছন্ন হবে, সময়ও বাঁচবে এবং ভুল হবার সম্ভাবনা কম হবে।

ঘ। যাথার্থ্যের মাত্রা ও আসন্ন মান (Degree of Accuracy and Approximate value)—যদিও পাটীগণিত একটি সঠিক বিজ্ঞান (exact science), তবুও সকল সময় সঠিক মান নির্ণয় করা নানা কারণে সম্ভব হয় না। আমরা গণনার দ্বারা যে সব সংখ্যা পাই সেগুলি সঠিক। আবার গণনার ফলও সকল সময়ে সঠিক বলা যায় না—যেমন লোক গণনায় (census) যে হিসাব দেওয়া হয় সেটিকে বলা হয় সম্ভাব্য সংখ্যা। ছাত্ররা অঙ্ক করার সময় এমন সব মান পায় যেগুলি অনেক সময় সঠিক হয় না। যেমন $\frac{2}{3}$ ভগ্নাংশটিকে বা $\sqrt{2}$ কে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করলে যে মান পাওয়া যায় তা কখনও সঠিক হয় না। আবার সকল সময় সঠিক মান নির্ণয় করা দরকারও হয় না। কোন জিনিসের এক ডজনের দাম টা 25·50 হলে একটির সঠিক দাম হয় টা 2·37$\frac{1}{2}$। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পয়সার ভগ্নাংশ হয় না। সুতরাং জিনিসটির একটির দাম টা 2·37 বা টা 2·38 ধরতে হয়। এই সব কারণে আমরা পাটীগণিতে আসন্ন মান বের করার শিক্ষা দিই। এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা কিন্তু এক বা একাধিক দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ বা কয়েকটি সার্থক (significant) সংখ্যা পর্যন্ত শুদ্ধ মান বের করতে শেখানোতেই সীমাবদ্ধ থাকে। যে সব তথ্য অবলম্বন করে এইরূপ আসন্ন মান নির্ণয়ের প্রয়োজন উপস্থিত হয় সেগুলির ক্ষেত্রে উপযুক্ত যাথার্থ্যের মাত্রা কি হবে তা সঠিক অনুধাবন করতে শিক্ষা দিই না। সুতরাং আসন্ন মান নির্ণয়ের শিক্ষার কোন মূল্যই থাকে না। ছাত্রদের যাথার্থ্যের মাত্রার মৌলিক জ্ঞানটিই যদি না থাকে, তা হলে একটা নির্দিষ্ট সার্থক সংখ্যা পর্যন্ত শুদ্ধ আসন্ন মানে উত্তর লেখার যোগ্যতা অর্জনের কোন মূল্যই নেই। পরীক্ষা খাতায় দেখা যায় যে ছাত্রেরা $\pi=\frac{22}{7}$ ধরে, বিনা দ্বিধায় উত্তর লেখে 4 দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ। যাথার্থ্যের মাত্রা ও আসন্ন মানের যথাযথ তাৎপর্য বুঝতে না পারাই এর কারণ।

পরিমাপ, যত সূক্ষ্মই হোক, কখনও সঠিক হয় না—এই মৌলিক ধারণাটিই আগে ছাত্রদের দিতে হবে। যতক্ষণ না ছাত্ররা এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করছে এবং যে কোন পরিমাপ সম্বন্ধে (তাদের পড়া বা নিজেদের মাপা) তারা ঐ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করছে ততক্ষণ আসন্ন মান নির্ণয়ের শিক্ষার কোন মূল্যই নেই তাদের কাছে। এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন সময় সাপেক্ষ। প্রতিটি পরিমাপের ক্ষেত্রে ছাত্রদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। যে কোন দৈর্ঘ্যের সরলরেখাকে মাপলেই ছাত্ররা দেখতে পাবে যে স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্যটির সঠিক মাপ পাওয়া যায় না। স্কেলে যে বিভাগগুলি থাকে তার কোনটির সঙ্গে একেবারে মিলে যায় না। ওজনের সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। বিজ্ঞানের ছাত্ররা দেখে পরীক্ষাগারে কোন তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি নির্ণয়ে তাদের পরস্পরের উত্তরে কিছুটা পার্থক্য থেকে যায়। তামার

আপেক্ষিক তাপ কারো পরীক্ষায় 0·0912 আবার কারো পরীক্ষায় 0·0897। যাথার্থ্যের মাত্রা নির্ণয়ের এই জাতীয় বাস্তব কাজ ছাত্ররা তাদের বিদ্যালয়েই পেয়ে যাবে।

কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, শুধু যাথার্থ্যের মাত্রা অনুযায়ী পরিমাপ করার যোগ্যতা অর্জনই যথেষ্ট নয়। ছাত্রদের বুঝতে হবে তাদের পরিমাপে ভুলের প্রকৃতি কিরূপ হচ্ছে এবং প্রকৃত মাপের ঊর্ধ্ব ও অধঃ সীমাগুলি কি কি। এ বিষয়ে ধীরে ধীরে তাদের শিক্ষা দিতে হবে এবং দেখতে হবে যেন তারা যে কোন পরিমাপের ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে আলোকপাত করে।

যে মৌলিক ধারণাগুলির কথা বলা হল সেগুলিই হবে পরবর্তী কাজের ভিত্তি। ছাত্ররা এগুলি আয়ত্ত না করতে পারলে তাদের আসন্ন মান শেখানো অর্থহীন।

যাথার্থ্যের মাত্রা সম্বন্ধে উল্লিখিত নীতি দুটি ছাত্রদের আয়ত্ত হলে তাদের শিক্ষা দিতে হবে যে, কোন পরিমাপের যাথার্থ্যের মাত্রা কি হবে তা নির্ভর করে—কি উদ্দেশ্যে ঐ মান ব্যবহার করা হবে তার ওপর। পদার্থ বিজ্ঞানে ·01 সে. মি. হয়ত নগণ্য নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানে আবার হাজার কিলোমিটারেরও গুরুত্ব কম।

যখন আমরা সঠিক মানের বদলে আসন্ন মান গ্রহণ করি, তখন স্পষ্টতই কিছু ভুল হয়। এখানে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই যে, ভুলের মান যেন ব্যবহৃত সর্বনিম্ন এককের অর্ধেকের কম হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে আসন্ন মানটি (i) শুদ্ধ n অঙ্কবিশিষ্ট দশমিকে (correct to n Places of decimals) অথবা (ii) শুদ্ধ n সংখ্যক সার্থক রাশিতে (correct to n significant figures) প্রকাশ করা হয়ে থাকে। (একটি সংখ্যার দশমিক বিন্দুর অবস্থান বোঝাতে যে শূন্য অঙ্কগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি বাদে বাকী সব কটি অঙ্কই সার্থক রাশি)। উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নলিখিত দরকারী নিয়মটি অনুসরণ করা হয়ে থাকে—

নিয়ম। যে রাশিগুলিকে বাদ দেওয়া হচ্ছে তাদের প্রথমটি যদি 5 অথবা 5 এর অধিক হয়, তা হলে যে রাশিগুলিকে রাখা হয়েছে তাদের সর্বশেষটির সঙ্গে এক যোগ করতে হবে।

উদাহরণ।—

279·83573 = 279·8357	4 দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ
= 279·836	3 „ „ „ „
= 279·84	2 „ „ „ „
= 279·8	1 „ „ „ „
= 280	নিকটতম পূর্ণ সংখ্যায় শুদ্ধ
23758 = 23800	3 সার্থক রাশি পর্যন্ত শুদ্ধ
3·044 = 3·04	3 „ „ „ „
·05085 = ·0509	3 „ „ „ „
·0008045 = ·000805	3 „ „ „ „

46·4 সংখ্যাটি 1 দশমিক স্থান এবং 3 সার্থক রাশি পর্যন্ত শুদ্ধ এবং ইহার শুদ্ধ মান 46·35 ও 46·45 এর মধ্যে থাকবে।

পরিসংখ্যান (Statistics) :

ইংরাজী Statistics শব্দটি 'State' শব্দ থেকে উদ্ভূত। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে লোকগণনা, আয়-ব্যয় সম্পত্তির হিসাব বা তাদের বিশ্লেষণ করার একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্যই পরিসংখ্যান-পদ্ধতির উৎপত্তি। পরে রাষ্ট্র পরিচালনা ও সমাজের ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই ইহার ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে বাদ দিলে এখনকার জটিল সমাজ ও রাষ্ট্র অচল হয়ে যায়। আজ ব্যবসায়-বাণিজ্য, জীবনবীমা, সমাজ-বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা প্রভৃতি ইহার উপর একান্ত নির্ভরশীল। মানুষের আগ্রহ, ইচ্ছা বা বিশেষ ঝোঁক সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ ও বিশ্লেষণের জন্য ঔপন্যাসিক, অভিনেতা বা গায়কও আজকাল পরিসংখ্যানবিদের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

পরিসংখ্যান বিজ্ঞান নয়। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। পরিসংখ্যান-পদ্ধতিই সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতির ভিত্তিমূল। সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে তাই পরিসংখ্যানের কিছুটা জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার জটিলতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান জটিলতা নিত্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে। পরিসংখ্যান-পদ্ধতি ঐগুলির সমাধান করে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করছে।

পরিসংখ্যানে প্রথমতঃ ঘটনাসমূহকে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ সংখ্যাগুলিকে ঠিকমত ব্যবহারের উপযোগী করার নীতি বা পদ্ধতি স্থির করা হয়। ঘটনা নির্দেশক সংখ্যা সংগ্রহ উপস্থাপন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাই হচ্ছে **পরিসংখ্যান**। পরিসংখ্যানে সংগৃহীত ঘটনাগুলিকে প্রথমে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যাগুলিকে data বা কাঁচা তথ্য বলা হয়। এই data নির্দিষ্ট আকারে উপস্থাপিত করতে না পারলে উহাদের বিশ্লেষণ করা, ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। কাজেই তাদের পর্যায়ক্রমে সাজানো, সুসংবদ্ধ করা, বিভিন্ন ভাবে তুলনা করা দরকার। এই কাজের জন্য সাধারণতঃ তাদের তালিকাভুক্ত বা লেখচিত্রে প্রকাশ করা হয়। বিশ্লেষণ করার জন্য data-কে প্রয়োজনীয় ও যুক্তিপূর্ণ বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করতে হয়। কি কি বিভাগ সম্ভব তা আগে থেকে ঠিক করেই data সংগ্রহ করতে হয়. পরে ঐ বিভক্ত অবস্থাতে তাদের গণনা কার্য করা হয়। চিত্রে প্রকাশ করার আগেই ঐ বিভাগ সম্পন্ন হওয়া দরকার। তা না করলে চিত্রটি অর্থহীন হয়ে পড়বে ; ইহার কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। পরিসংখ্যানের শেষ কাজ হচ্ছে উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত data-র ব্যাখ্যা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। পরীক্ষিত এলাকার মধ্যে সিদ্ধান্তটি যেন সীমাবদ্ধ থাকে। মনে রাখতে হবে যে, পরিসংখ্যান-লব্ধ সিদ্ধান্ত নিখুঁত নির্ভুল বা অপরিবর্তনীয় নয়। যা হওয়া সম্ভব তারই একটা ধারণা দেয় পরিসংখ্যান। পরিসংখ্যান-পদ্ধতি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করে মাত্র। কাজেই পরিসংখ্যানগত ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল বা অবশ্যম্ভাবী নয়। ইহা সম্ভাবনার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

তবে ঠিকমত data সংগৃহীত হলে পরিসংখ্যানের ভবিষ্যদ্বাণীতে যে ভুল হবে, তা সীমিত।

যে সব বিষয়ে তথ্যের সংখ্যা খুব বেশী, সেগুলি সম্বন্ধে কোন ধারণা করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসুবিধাজনক হয়। পরিসংখ্যান-পদ্ধতি এই অসুবিধা দূর করে সঠিক পথ নির্দেশ করে। আধুনিক সভ্য সমাজ-ব্যবস্থায় বৃহৎ সংখ্যা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। আধুনিক সমাজের সমস্যা-সমাধানে ও চাহিদাপূরণে তাই পরিসংখ্যান-পদ্ধতি ও পরিসংখ্যানের ধারণা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলির সম্বন্ধে একটিমাত্র পর্যবেক্ষণে বা একটিমাত্র পরিমাপে কিছু জানা যায় না। নিয়ত পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি ইহার অন্তর্গত। যেমন, কোন মানুষের আচরণ সম্বন্ধে ধারণা না করতে হলে তাকে বার বার পর্যবেক্ষণ করতে হবে—একটিমাত্র পর্যবেক্ষণের দ্বারা কোন ফল হবে না। বর্তমান যুগে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেইজন্য আমাদের জানতে হয় সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রকৃতি সম্বন্ধে (গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন বিষম ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র)। আমরা জানতে চাই এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর পার্থক্য কি?—এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির মিল বা অমিল কোথায়? আমরা একব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির তুলনামূলক বিচার করতে চাই। একই বয়সের, জাতির বা শ্রেণীর আদর্শমানের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির বৈষম্য নির্ণয় করতে চাই। এইরূপ অসংখ্য সমস্যা আছে যেগুলির সমাধান করা বর্তমান জটিল সমাজে একান্ত প্রয়োজনীয়। পরিসংখ্যান পদ্ধতি এই জাতীয় সমস্যার সমাধানে আমাদের সাহায্য করে। এই কারণে আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রমে পরিসংখ্যান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু পরিসংখ্যানের মূলনীতি বা তত্ত্ব উপলব্ধি করা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে বিবেচিত হয়। এগুলির শিক্ষালাভ তাদের মানসিক বয়সের উপযোগী নয়। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ঐগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। কেবলমাত্র পরিসংখ্যানের সহজ অংশগুলি পাঠ্যসূচীতে গৃহীত হয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জীবন-জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলিকে অবলম্বন করেই পরিসংখ্যানের প্রয়োগ তাদের শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পরিসংখ্যান শেখানো কখন শুরু করা হবে এবং কি ভাবেই বা তা হবে? পরিসংখ্যান-পদ্ধতিতে যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ, দশমিক ভগ্নাংশ ও বর্গমূলের বিস্তৃত ও ব্যাপক ব্যবহার হয়। ঐগুলিই ইহার সংখ্যাসংক্রান্ত হিসাবের ভিত্তিমূল। সুতরাং পাটীগণিতের ঐ অধ্যায়গুলি শিশুরা ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারলেই অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীতেই পরিসংখ্যান-শিক্ষণ সুরু করা যেতে পারে। কিন্তু পরিসংখ্যানের কাঁচা তথ্য (data) শ্রেণীবদ্ধ করে ঠিকমত উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করতে হলে লেখচিত্র সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান থাকা দরকার। কাজেই, বীজগণিতের লেখচিত্র শেষ না করে পরিসংখ্যান-শিক্ষণ সুরু করার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া পরিসংখ্যানের সাহায্যে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হয়, সেগুলি ঠিকমত উপলব্ধি

করার মত মানসিক বয়স সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের হয় না। এই সমস্ত কারণে নবম শ্রেণীর আগে পরিসংখ্যান-শিক্ষণ সুরু করা প্রশস্ত নয়। পরিসংখ্যানে যাবতীয় গাণিতিক কাজ (বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত) পাটীগণিতের বিষয়ীভূত। সুতরাং ইহাকে পাটীগণিতের ফলিত রূপ হিসাবেই গণ্য করা উচিত। এতে সুবিধাও যথেষ্ট। প্রথমতঃ, পাটীগণিতে অধীত বিষয়গুলির ভালো করে চর্চা হয়। দ্বিতীয়তঃ পরিসংখ্যানে খুব বড় বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হয় বলে ছাত্রদের ধৈর্যের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে এবং পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করার অভ্যাস গঠিত হয়। তৃতীয়তঃ, পরিসংখ্যান শেখার মধ্য দিয়ে তারা দ্রুততা ও নির্ভুলতার সঙ্গে সংখ্যাবাচক হিসাবে দক্ষ হয়ে ওঠে।

পরিসংখ্যান-শিক্ষণ কি ভাবে শুরু করা হবে সে বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা করা যাক। প্রথমেই ছাত্রদের নিকট এমন দু' একটি সমস্যার উপস্থাপন করতে হবে—যেগুলির সমাধানে তাদের আগ্রহ জাগাবে এবং যাদের মাধ্যমে পরিসংখ্যান-পদ্ধতির মূল নীতির একটু আভাস তারা পাবে। যেমন.—**সমস্যা**। ১৯৬০ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রায় সওয়া লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রতি বৎসরই কম-বেশী ঐরূপ সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা হার হিসাব করে কি এবারের ছাত্র-ছাত্রীর যোগ্যতার standard বুঝা যাবে? তাদের যোগ্যতা বেড়েছে না কমেছে?

ছোট ছোট দৃষ্টান্তের সাহায্যে ছাত্রদের সহজেই দেখানো যেতে পারে যে, শতকরা পাসের হার এক থাকলেও যোগ্যতা ভিন্ন হতে পারে। যোগ্যতা নিরূপণ করতে হলে যোগ্যতার একটি আদর্শ মান থাকা দরকার। এই আদর্শ মান হচ্ছে গড়। কারণ জগতের সবকিছুরই মাঝের দিকে থাকার একটা ঝোঁক আছে। প্রতি বৎসর ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা প্রাপ্ত নম্বরের গড় নিরূপণ করলেই তাদের যোগ্যতার তুলনা করা যেতে পারে। এখন সোয়া লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর নম্বরের গড় নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নয়। গড় নিরূপণকে কেন্দ্র করেই পরিসংখ্যান-পদ্ধতি-শিক্ষণ সুরু করা যেতে পারে। এখন শেখানো যেতে পারে কি করে frequency distribution করতে হয়। অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় আপনি এসে পড়বে এবং সেগুলি যথাসময়ে শেখানো যেতে পারে। পরিসংখ্যান-পদ্ধতি-শিক্ষণে এইভাবে যুক্তিসম্মতভাবে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বীজগণিত-শিক্ষণ

[Teaching of Algebra]

ভাস্কর (আনুমানিক 1100 খ্রীঃ) গণিতকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন—ব্যক্ত গণিত অর্থাৎ পাটীগণিত এবং অব্যক্ত গণিত বা বীজগণিত। বীজগণিত নামকরণ ভাস্করেরই। বীজগণিত মানে বীজের গণনা বা মূলের (root) গণনা অর্থাৎ অব্যক্ত রাশির গণনা যে শাস্ত্র করে। তিনি লিখেছেন—

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তং সংজ্ঞম্।
ব্যক্তং পাটীগণিতমব্যক্তং বীজগণিতম্॥"

আধুনিক বীজগণিতের ভিত্তি স্থাপন করেন আর্যভট্ট (496 খ্রীঃ)। তারপর ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রভৃতি ইহার যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেন। গ্রীক গণিতজ্ঞ Diophantus (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক) বীজগণিতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর Arithmetica পুস্তকে।

প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দুরাই বীজগণিতের বহুল চর্চা করেন। অনেকের মতে এ বিষয়ে হিন্দুরাই পথপ্রদর্শক ছিলেন। পাটীগণিতে হিন্দুরা গ্রীকদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ছিলেন—ইহা সর্বজনস্বীকৃত। বীজগণিতেও হিন্দুরাই অগ্রবর্তী ছিলেন—এরূপ মত বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বীজগণিতের ইংরাজী প্রতিশব্দ Algebra শব্দটি আরবী 'Al-jebr' 'al-muqubulah' শব্দটি থেকে উদ্ভূত। Al-kho-Warizmi (825 খ্রীঃ) নামে একজন আরবীয় গণিতজ্ঞ উল্লিখিত শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। 'Al-jebr' শব্দটির অর্থ হল সমীকরণে কোন রাশির পার্শ্ব পরিবর্তন-ক্রিয়ায় চিহ্ন-পরিবর্তন এবং 'Al-muqub-lah'-র অর্থ সমান রাশি সমীকরণের উভয় পার্শ্ব থেকে বাদ দেওয়া। 1600 খ্রীঃ পর্যন্ত ইংরাজীতে আরবী শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তীকালে সংক্ষেপে লেখা হয় Algebra।

হিন্দুগণিতে বহু পূর্ব থেকেই সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দুরা বড় বড় সংখ্যা নিয়ে নানারকম সমস্যার সমাধান করতেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) ও বলবিজ্ঞান (Mechanics) সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনে বীজগণিতের উৎপত্তি। পূর্বকালে বীজগণিত বলতে বোঝাত—নিয়ম অনুসারে গণনা করা, আর কতকগুলি সমস্যার সমাধান; তখন বীজগণিতে বিমূর্ত সংখ্যা ও প্রতীকের ব্যবহার ছিল না। এগুলি ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে।

প্রথমে নিয়ম ও সমস্যাগুলি সম্পূর্ণ ভাষাতেই লেখা হত বীজগণিতের ক্রমবিকাশে

এই স্তরটিকে বলা হয় Rhetoric Algebra। পরবর্তী স্তরে ধীরে ধীরে বীজগণিতের সমস্যায় কিছু সংক্ষিপ্ত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এই স্তরের নাম Syncopated Algebra। তৃতীয় স্তরে প্রতীক-চিহ্নের প্রচলন হয়। এই সর্বশেষে স্তরকেই বলা হয় Symbolic Algebra বা Algebra। একটি উদাহরণের সাহায্যে স্তরগুলি বোঝানো যেতে পারে।

উদাহরণ—

2টি গরুর দামের সঙ্গে 3টি ছাগলের দাম যোগ করলে হয় 975 টাকা (Rhetoric Algebra).

2টি গরু + 3টি ছাগল = 975 টাকা (Syncopated Algebra).

$2x+3y=975$ (Symbolic Algebra).

একদিক থেকে দেখতে গেলে পাটীগণিত ও বীজগণিতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিশেষ নেই। উভয়কেই সংখ্যা বা পরিমাণ গণিত বলা যেতে পারে। যখন নির্দিষ্ট সংখ্যা না নিয়ে সংখ্যাসংক্রান্ত এমন সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়, যা সমস্ত সংখ্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তখনই পাটীগণিতের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বীজগণিতে a, b, x প্রভৃতি বর্ণ সংখ্যার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। এইজন্য বীজগণিতকে **আক্ষরিক পাটীগণিতও** (Literal Arithmetic) বলা হয়।

অতীতকালে বীজগণিতকে পাটীগণিতের বিস্তৃতিরূপেই দেখা হত। প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দু গণিতে বীজগণিত-সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তকই পাটীগণিত নামে অভিহিত হয়েছে।

বীজগণিতের ফলগুলি সম্পূর্ণ সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয়। সেইজন্য ইহাকে **সাধারণীকৃত বা সামান্যীকৃত পাটীগণিত** (Generalised Arithmetic) বলে। একটি উদাহরণের সাহায্য নিলে বিষয়টি ভালো করে বোঝা যাবে। নীচের তালিকাটির সাহায্যে গজকে ইঞ্চিতে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

1 গজ = 36 ইঞ্চি

2 গজ = 2 × 36 ইঞ্চি

3 গজ = 3 × 36 ইঞ্চি

4 গজ = 4 × 36 ইঞ্চি

এইভাবে তালিকাটি অনুসরণ করলে, বুঝতে কষ্ট হবে না যে x গজ, $x\times 36$ ইঞ্চির সমান। $x\times 36$-কে $36x$ লেখা হয়, গুণচিহ্নটি উহ্য থাকে।

তাহলে প্রাপ্ত ফল

x গজ = $36x$ ইঞ্চি

তালিকাটির একটি সাধারণীকৃত বা সামান্যীকৃত আকার। এখানে x-এর মান 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি লিখে সম্পূর্ণ তালিকাটি পাওয়া যেতে পারে।

পাটীগণিতকে যেমন **সংখ্যাগণিত** (Calculus of Numbers) বলা হয়, বীজগণিতকে সেরূপ **অপেক্ষক গণিত** (Calculus of Functions) বলা হয়।

অপেক্ষক বলতে পরস্পর নির্ভর একাধিক চল রাশির মধ্যে একটি সম্বন্ধ বোঝায় যাতে একটি চলরাশির কোন নির্দিষ্ট মান ধরলে বাকীগুলির অনুরূপ মানগুলি নির্ণয় করা যায়। অপেক্ষকের ধারণা $y=f(x)$ প্রতীকটির দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখানে x-কে বলা হয় স্বাধীন চল ও y-কে বলা হয় অধীন চল বা অপেক্ষক। $y=2x$ ধরলে [এখানে $f(x)=2y$] y-কে বলা হয় x-এর অপেক্ষক। কারণ y-এর মান x-এর মানের উপর নির্ভর করে। x-এর মান 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি ধরলে, y-এর মান 2, 4, 6, 8 ইত্যাদি হবে। বীজগণিতে অপেক্ষকের এইভাবে মান নির্ণয় করা যায় বলে ইহাকে **অপেক্ষক গণিত** বলা হয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বীজগণিতের প্রতীকের দান অমূল্য। বীজগণিতের প্রতীক সকল ক্ষেত্রে সংখ্যারই প্রতিনিধিত্ব করে এমন নয়। প্রতীকের ব্যবহার ছাড়া নির্ভুলভাবে ও সংক্ষেপে কিছু প্রকাশ করা যায় না। আবার সমস্যার সঠিক বিশ্লেষণ করতেও প্রতীকের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। বিশ্লেষণ সহজ করা এবং সংক্ষেপে ফলাফল প্রকাশ করাই প্রতীকের প্রধান কাজ। সমস্ত বিজ্ঞান এমন কি কলাশাস্ত্রগুলিও আজকাল প্রতীকের ব্যবহার করছে। এখন আন্তর্দেশীয় বহু কাজেই প্রতীকের ব্যবহার প্রচলিত। সকল ক্ষেত্রে প্রতীকগুলি অবশ্যই এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু সমস্ত প্রতীকমূলক ভাষার উদ্দেশ্য এক। ভাষা সততই দুর্বল। বিবৃতির দ্বারা সম্পূর্ণ মনের ভাবটি কখনই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভাষা যা প্রকাশ করতে পারে না বা অনেক বাক্যজাল বিস্তার করে প্রকাশ করে, প্রতীকের সাহায্যে তাকে সহজে ও সংক্ষেপে সাবলীলভাবে ব্যক্ত করা যায়। যেমন,

$$(a+x)^n = a^n + na^{n-1}x + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}x^2 + \cdots\cdots + x^n.$$

এই দ্বিপদ উপপাদ্যের ধারণাটি প্রতীক ছাড়া কখনই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। ধারণাটি ভাষায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়।

বীজগণিতের প্রতীক শুধু সংখ্যারই প্রতিনিধিত্ব করে না—ইহা ভাবপ্রকাশের একটি সহজ পথ বা উপায়ও বটে। ইহাকে বিবৃত প্রকাশের short-hand বলা যেতে পারে।

বীজগণিতের সাহায্যে যন্ত্রের মত গণনা ও সমস্যা সমাধান করা যায়। আবার ইহার মধ্যে সৃজনীশক্তিও আছে। বীজগণিতই সংখ্যার ধারণার বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। ঋণাত্মক সংখ্যা, অমূলদ সংখ্যা (irrational number) ও কাল্পনিক সংখ্যার (imaginary numbers) জন্ম ও ধারণা বীজগণিতই দিয়েছে।

বীজগণিতের চিহ্নের ক্রমবিকাশ ঃ—

১। যোগ ও বিয়োগ-চিহ্ন ঃ—

খ্রীঃ পূঃ প্রায় 1600 বছর পূর্বে লিখিত Ahmes Papyrus-এ যোগ ও বিয়োগকে যথাক্রমে দু'পায়ে সামনের দিকে চলার ভঙ্গী ও পিছনের দিকে চলার ভঙ্গীর ছবির দ্বারা দেখানো হয়েছে। যেমন ⌒ ও 7।

গ্রীকেরা ও হিন্দুরা পাশাপাশি সংখ্যা লিখে যোগ-ক্রিয়া বোঝাতেন, যেমন বর্তমানে আমরা মিশ্র ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে লিখে থাকি। যথা $2+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$। হিন্দুরা সংখ্যার উপরে ছোট বৃত্ত, ফুটকি অথবা সংখ্যাকে বৃত্তে অন্তর্লিখিত করে বিয়োগ বোঝাতেন।

বর্তমানে ব্যবহৃত যোগ ও বিয়োগ চিহ্নের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, ইতালীর ব্যবসায়ীরা ওজনে বেশী হলে + চিহ্ন ও কম হলে – চিহ্ন দিতেন। তবে এই চিহ্নের ব্যবহার ব্যবসায়ীদের মধ্যেই অনেকদিন সীমাবদ্ধ ছিল এবং উহারা যথাক্রমে ওজনে বেশী ও কম বোঝাত। ঐ সময়েই ইতালীয়রা বীজগণিতে যোগ বোঝাতে plus (surplus-এর সংক্ষেপ) ও বিয়োগ বোঝাতে minus লিখতেন। পরবর্তীকালে plus ও minus-কে সংক্ষেপে যথাক্রমে p ও m অক্ষরের মধ্য দিয়ে একটি রেখা টেনে লেখা হত।

Hoeche নামক একজন ওলন্দাজ 1514 খ্রীষ্টাব্দে '+' ও '–' চিহ্ন দুটি বীজগণিতে প্রথম ব্যবহার করেন। পরে Stifel জার্মানীতে এবং Robert Recorde ইংল্যাণ্ডে ঐগুলির প্রবর্তন করেন।

২। গুণ-চিহ্ন :—

গুন-চিহ্নের বিকাশ ধীরে ধীরে হয়। পাটীগণিতে বর্তমান চিহ্নটির অনুরূপ কিছু কিছু ব্যবহার ছিল। 1631 খ্রীষ্টাব্দে William Oughtred নামক একজন ইংরাজ যাজক প্রথম চিহ্নটি বীজগণিতে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রতীকটি তখন বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। কারণ, বীজগণিতে ব্যবহৃত x অক্ষর বলে চিহ্নটিকে ভুল করার সম্ভাবনা ছিল। × চিহ্নর বদলে ডট্ (ফুটকি) চিহ্ন ব্যবহারের অন্যতম পথিকৃত ছিলেন Leibnitz।

৩। ভাগ-চিহ্ন :

বর্তমানে ব্যবহৃত ভাগের চিহ্নটি পূর্বে ইউরোপে বিয়োগ চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হত। আরবেরা ভাগচিহ্নকে তিন ভাবে লিখতেন। যথা 6—3, 6/3, $\frac{6}{3}$। Oughtred দুটি সংখ্যার অনুপাত বোঝাতে প্রথম কোলন (:) চিহ্নের প্রবর্তন করেন 1667 খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমানে ব্যবহৃত ভাগ-চিহ্নটি সম্ভবতঃ অনুপাত ও বিয়োগ-চিহ্নের সমন্বয়ে গঠিত। 1668 খ্রীষ্টাব্দে John Pell ইংল্যাণ্ডে ইহার প্রথম প্রবর্তন করেন।

৪। সমান-চিহ্ন :—

1557 সালে Robert Recorde প্রথম এই চিহ্নটির প্রবর্তন করেন। কিন্তু Newton-এর পূর্বকাল পর্যন্ত ইহার বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় না।

৫। শক্তি (Power) :—

ইটালীর Bombelli $\underset{\smile}{1}$ কে অজ্ঞাত রাশিরূপে ব্যবহার করতেন এবং তার বর্গ, তৃতীয় শক্তি, চতুর্থ শক্তি প্রভৃতির স্থলে $\underset{\smile}{2}$, $\underset{\smile}{3}$, $\underset{\smile}{4}$ ইত্যাদি লিখতেন। বর্তমান

পদ্ধতির উদ্ভাবক Decartes। তবে তাঁর সূচক ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ছিল। ঋণাত্মক ও ভগ্নাংশিক সূচকের ব্যাখ্যা দেন John Wallis। a-র যে কোন শক্তির নির্দেশ করার জন্য a^n-এর প্রবর্তন করেন Newton.

৬। মূল-চিহ্ন :—

1525 খ্রীষ্টাব্দে Rudolff প্রথম √ চিহ্নটি ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনি কোন সূচক ব্যবহার করেন নি। ভাস্কর বর্তমানে ব্যবহৃত চিহ্নের অনুরূপ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। সূচকযুক্ত মূল চিহ্ন লেখার বর্তমান পদ্ধতি Newton-এর অবদান।

Vinculum চিহ্ন Vieta 1591 খ্রীষ্টাব্দে, bracket চিহ্ন Givard 1629 খ্রীষ্টাব্দে এবং > ও < চিহ্ন Harriot 1631 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন।

বীজগণিত শিক্ষণের লক্ষ্য ঃ

গণিত-শিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যগুলি ছাড়াও বীজগণিতের নিম্নলিখিত চারটি বিশেষ লক্ষ্যের কথা Y. W. A. Young বলেছেন ঃ—

১। পাটীগণিতের তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার বিস্তৃতি ও উহার ভিত্তি সুদৃঢ় করা (To establish more carefully and to extend the theoretical processes of arithmetic.)

২। অভ্যাস ও গণনায় কার্যকর উন্নত কৌশলের উদ্ভাবনের দ্বারা ছাত্রের গণনার দক্ষতা বৃদ্ধি করা (To strengthen the pupils' power in computation, by much practice as well as by the development of devices useful in computation.)

৩। সমীকরণ-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করা এবং পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থ-বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে উহাকে প্রয়োগ করা (To develop the equation and to apply it in the solution of problems of a wide range of interest, including large classes of problems often treated in arithmetic, as well as problems related to geometry, to physics and other natural sciences.)

৪। উচ্চতর গণিত ও বিভিন্ন ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষায় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ইহার মধ্যে সন্নিবেশ করা (To furnish such material within its domain as may be needed in the later study of mathematics and of the various physical sciences.)

১। পাটীগণিতের ভিত্তি দৃঢ় করায় বীজগণিতের ব্যবহার ঃ—

অনেক ক্ষেত্রেই বীজগণিতকে পাটীগণিতের সামান্যীকরণ বলা যায়। বীজগণিত যেখানে সুরু হচ্ছে, পাটীগণিতের সেখানেই শেষ হচ্ছে এ ধারণা করা ভুল।

বীজগণিতের কাজের অংশ হিসাবে পাটীগণিতের শিক্ষাকে চালু রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আধুনিক বীজগণিতে ব্যবহৃত বর্ণগুলিকে সংখ্যার প্রতীক মনে করলে ভুল হবে। তারা প্রয়োজনমত সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। প্রাথমিক স্তরে বীজগণিতের যাবতীয় ক্রিয়া (operations) সংখ্যার সাহায্যেই শেখানো উচিত। ক্রমে ক্রমে সংখ্যার প্রতিভূ হিসাবে বর্ণ ব্যবহার করতে হবে। কিছুকাল পরে, ধীরে ধীরে বর্ণ-প্রতীকগুলির সাংখ্যমান বিবর্জিত প্রকৃতি ও ঐগুলি সম্বলিত যাবতীয় ক্রিয়া ছাত্রের আয়ত্তে আসবে। কিন্তু প্রতীকগুলি যে সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে— এটি ভুলে গেলে চলবে না। কাজেই ঐগুলির বদলে সংখ্যা বসিয়ে বীজগাণিতিক সম্বন্ধগুলি মিলিয়ে দেখা দরকার।

প্রাথমিক স্তরে বর্ণগুলির বদলে সংখ্যা বসিয়ে বীজগাণিতিক রাশিমালার মান নির্ণয় করা একান্ত দরকার। পরবর্তী স্তরে সমীকরণ-সমাধানে প্রক্রিয়াটি নিয়োগ করা উচিত। যেমন, নীচের তালিকার শূন্যস্থানগুলি পূরণ করতে বলা যেতে পারে।

$$S = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

s	u	g	t
—	5	32	6
100	2	32	—
150	—	32	2
64·6	·3	—	2
—	—3	32	4

বর্ণগুলিকে সংখ্যাগতভাবে ব্যবহার করলে কতকগুলি ভুলও সংশোধিত হতে পারে। নিম্নলিখিত ভুলগুলি ছাত্রেরা সচরাচর করে থাকে। বর্ণের বদলে সংখ্যা বসালেই ছাত্রেরা নিজেদের ভুলগুলি ধরতে পারবে ও সংশোধন করবে।

১। $n(n+2)+3(n+4)=(n+3)(n+4)$

২। $\dfrac{2x^2+3x-4}{2x^2+19x+2}=\dfrac{3x-4}{19x+2}$

৩। $\dfrac{8a^2.4c^2}{2}=4a^2.2c^2=8a^2c^2$

২। অভ্যাস ও সূত্রের সাহায্যে গণনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা ঃ—

সূত্র হচ্ছে বীজগাণিতিক বাক্য। বাক্যটির সর্বদাই একটা অর্থ থাকা উচিত। বীজগাণিতিক রাশিমালার রূপান্তর করার সময় ছাত্রেরা প্রায়ই মারাত্মক ভুল করে বসে। এর কারণ রাশিমালা ও তার রূপান্তর—উভয়েরই অর্থ ছাত্রদের নিকট পরিস্ফুট নয়। ঐগুলির ভাষা তারা ঠিক বোঝে না। যেমন, প্রায়ই দেখা যায় ছাত্রেরা $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a+b}$ লিখে বসে ; যদিও তারা $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}=\frac{1}{8}$ কখনও লিখবে না। এরূপ স্থলে বর্ণের বদলে নির্দিষ্ট সংখ্যা বসিয়ে দেখলে ছাত্রদের প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হবে। তা ছাড়া অমনোযোগজনিত বা যান্ত্রিক ভুল সংশোধনের জন্যও এ ব্যবস্থার যথেষ্ট মূল্য আছে। অসতর্কতার ফলে যদি কোন ছাত্র $(2a+3b)^2=4a^2+6ab+9b^2$ লেখে, সে $a=1; b=1$ বসিয়ে অভেদটির যাথার্থ্য পরীক্ষা করলেই নিজের ভুল ধরতে পারবে।

বর্ণের বদলে সংখ্যা বসিয়ে মিল করার অভ্যাসের আরো মূল্য আছে। ইহার মাধ্যমে পাটীগণিতের ক্রিয়াগুলির প্রসঙ্গক্রমে পুনরীক্ষণ (review) হয়। বীজগণিতে সংখ্যামূলক দৃষ্টান্তের সংখ্যা প্রচুর রাখতে হবে। এগুলি যেন নানারকমের এবং কিছুটা কঠিন হয়। এর উদ্দেশ্য হবে গণনার অভ্যাস বজায় রাখা এবং গণনায় নানারকম সুযোগ বৃদ্ধি করা।

বীজগাণিতিক সূত্র অনেক ক্ষেত্রে পাটীগণিতের সমস্যা সমাধানে 'short cut' পথের সন্ধান দেয়। যেমন, $a(b-c)=ab-ac$ সূত্রের সাহায্যে 73×49 গুণটি তাড়াতাড়ি করা যায়, অথবা $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ সূত্রটি প্রয়োগ করে 46×54 গুণটি বা

$$\frac{32487\times 32487-29756\times 29756}{62243}$$ সরলটি সহজে এবং দ্রুত করা যায়।

দুটি সংখ্যার দশক অঙ্কদ্বয় সমান এবং একক অঙ্কদ্বয়ের যোগফল 10 হলে, তাদের গুণন ক্রিয়ার সহজ যান্ত্রিক পদ্ধতিটির পশ্চাতে নিম্নলিখিত বীজগাণিতিক সূত্রটি রয়েছে।

$$(10a+b)(10a+\overline{10-b})=10^2a(a+1)+b(10-b)$$

উদাহরণ।
$$\begin{array}{r} 83 \\ 87 \\ \hline 7221 \end{array}$$

প্রক্রিয়া। $3\times 7=21$
$8\times 9=72$

অনুরূপভাবে দ্রুত গণনার জন্য আরো অনেক নিয়ম দেখানো যেতে পারে বীজগাণিতের সূত্রের সাহায্যে। গণনার সময় এই জাতীয় কৌশলগুলি ছাত্রদের দ্রুত দেখতে হবে। গণনায় কখন কোন কৌশলটি অবলম্বন করতে হবে তা আগে থেকে বলা যায় না। কাজেই বীজগণিতের সূত্রের সংখ্যামূলক দিকটি দেখার অভ্যাস তাদের করিয়ে দিতে হবে।

৩। বীজগণিতের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু—সমীকরণ :—

এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে বীজগণিতের কেন্দ্রস্থলে আছে সমীকরণ ও তার প্রয়োগ। অধ্যাপক Young বলেছেন, "It is that that puts flesh and blood upon the dry bones of the skeleton of algebraic routine"—ইহা বীজগাণিতিক রুটিনের কঙ্কালের শুকনো হাড়ে রক্তমাংস প্রদান করে। এইজন্যই তিনি বলেছেন যে, নিয়ম, সূত্র প্রভৃতি রুটিন মাফিক কাজ আগেই শেখাবার দরকার নেই। বীজগণিত শেখাতে হবে সমীকরণের মাধ্যমে। সমীকরণের সমাধানে যখন যেটুকু নিয়মের কাজের প্রয়োজন হবে—সেটুকুই তখন শেখাতে হবে। সমীকরণ ও সমস্যার সমাধানের জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হবে না সেগুলি প্রথম থেকেই শেখাবার দরকার নেই। পরবর্তী কোন কাজে দরকার লাগবে বলে আগে থেকে শিখিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করা সমীচীন নয়। যা পরে দরকার লাগবে তাকে পরে প্রয়োজনের সময় শেখানো উচিত। বীজগণিতের প্রক্রিয়াগুলি শেখানোই বীজগণিত শেখানোর লক্ষ্য নয়। প্রক্রিয়াগুলি বীজগাণতের যা মূল কাজ অর্থাৎ সমস্যা সমাধান করার কাজে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রমাত্র।

বিদ্যালয়ে বীজগণিত শেখানোর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমীকরণ শেখানো। ছাত্রদের কাছে যে সমস্ত সমস্যার মূল্য আছে এবং যেগুলিতে তারা আগ্রহশীল, সেগুলির সমাধান সমীকরণের সাহায্যেই করা সম্ভব। এই সমস্যাগুলি পাটীগণিতের হতে পারে, বীজগণিতের হতে পারে, জ্যামিতির হতে পারে, ভৌত বিজ্ঞানসমূহের হতে পারে অথবা তাদের বাস্তব জীবনের হতে পারে। বীজগণিতের চিহ্ন, প্রক্রিয়া, প্রতীক ইত্যাদি সব কিছুই মুখ্যতঃ সমীকরণের সমাধানকে অবলম্বন করে সৃষ্ট হয়েছে। সহজ, সরল সমীকরণগুলিতে বীজগাণিতিক প্রয়োগকৌশল সামান্যই কাজে লাগে অথচ ঐগুলির প্রয়োগে অনেক চিত্তাকর্ষক সমস্যার সমাধান করা যায়। কাজেই সমীকরণের মাধ্যমেই বীজগণিত শেখানো উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগও করতে হবে।

সমীকরণ ও অভেদের (identity) মধ্যে পার্থক্যটি জানা সবিশেষ দরকার। অভেদ একটি ঘটনা বিবৃত করে এবং সমীকরণ বিবৃত করে একটি সমস্যার। $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ অভেদটি এমন একটি সম্বন্ধের কথা বলে যা a ও b-র সাংখ্যমান নিরপেক্ষ।

$x^2+3x=4$ সমীকরণটি একটি সমস্যার কথা বলে ইহা প্রশ্ন করে, "এমন কি সংখ্যা আছে যার বর্গের সঙ্গে সংখ্যাটির 3 গুণ যোগ করলে 4 হবে"।

বীজগণিতে পাঠক্রম সংগঠনের নীতি ঃ—

পাঠক্রম সংগঠনের সময় দেখতে হবে বীজগণিত শেখানোর লক্ষ্যগুলি যেন ঠিকমত রূপায়িত হয়। এর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার :—

১। **অপ্রয়োজনীয় বিমূর্ত ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক বিষয়গুলি বাদ দিতে হবে।** চার নিয়মের জ্ঞান ও সেগুলি ব্যবহার দক্ষতা অবশ্যই থাকা দরকার। সেগুলি শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই যান্ত্রিক ভাবে করা উচিত নয়।

২। **তত্ত্বগত আলোচনা যতদূর সম্ভব কমাতে হবে।** অনেক তত্ত্বের আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করার মত মানসিক বয়স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হয় না। যথা, ঋণাত্মক বা ভগ্নাংশিক সূচক বিশিষ্ট সূচক সূত্র। এগুলি পাঠক্রম থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

৩। **যুক্তি ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন বিষয়গুলির উপর জোর দিতে হবে।** যান্ত্রিকভাবে বীজগণিত শেখানো উচিত নয় কিংবা সমস্যা সমাধানের যন্ত্ররূপে বীজগণিতকে মনে করলে চলবে না। বিষয়গুলির সন্নিবেশ এমন ভাবে করতে হবে যাতে ছাত্রদের চিন্তা, যুক্তি ও বিচার করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৪। **প্রয়োগমূলক বিষয়গুলির উপর বেশী জোর দিতে হবে।** বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেগুলির প্রয়োগ ও ব্যবহারিক মূল্য বেশী সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বহু বিষয়ে বীজগণিত প্রয়োগ করা হয়। জ্যামিতি, পদার্থ বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে বীজগণিতের যে বিষয়বস্তুগুলির অধিক ব্যবহার আছে সেগুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৫। **উচ্চগণিতে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বাদ দিতে হবে।**

৬। **যে সমস্ত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির অধিক ব্যবহার হয় সেগুলিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।**

বীজগণিত কখন এবং কিভাবে সুরু করতে হয় ঃ—

বীজগণিত স্থরু করার কোন নির্দিষ্ট বয়স বা স্তর নেই। পাটীগণিত শেষ হলে তবে বীজগণিত আরম্ভ করতে হবে এমন ধারণা করা ভুল। পাটীগণিতের মধ্য দিয়েই বীজগণিত শিক্ষণ স্থরু করতে হবে। বীজগণিতকে পাটীগণিতের বিস্তৃতি হিসাবেই শিক্ষা দিতে হবে। কোঠারী কমিশনের মতে প্রাথমিক স্তরে (Class I to VIII) পাটীগণিত ও বীজগণিত একসঙ্গে একই বিষয় রূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত। নিয়মমাফিক (formal) বীজগণিত বলে কিছু শেখানো উচিত নয়। এই স্তরে দিক নির্দেশক সংখ্যা, সমীকরণ, লেখচিত্র এবং অপেক্ষক সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। বীজগণিতের বর্ণগুলিকে সংখ্যা হিসাবেই গণ্য করতে হবে এবং সংখ্যার

সামান্যীকরণরূপেই পাটীগণিতের সংখ্যার ধারণা বিস্তৃত করতে হবে। আবার বীজগণিতের সূত্রগুলিতে বর্ণগুলির বদলে সাংখ্যমান বসিয়ে উহাদের মধ্যেকার সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পাটীগণিত ও বীজগণিতের মধ্যে কোথাও সীমারেখা টানা কখনই উচিত হবে না। ছাত্রদের মানসিক বয়স অনুযায়ী বীজগণিতের শিক্ষা পাটীগণিতের মাধ্যমেই করতে হবে। বীজগণিতকে পাটীগণিতের ভিত্তি দৃঢ় করার জন্যই ব্যবহার করতে হবে এবং সূত্রগুলিকে গণনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করার কাজে নিয়োগ করতে হবে। এটি অভ্যাস সাপেক্ষ। অভ্যাসের দ্বারাই ঐরূপ দক্ষতা আসবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বীজগণিত-শিক্ষণ কিভাবে সুরু করা যাবে ? এ বিষয়ে তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। **প্রথম চার নিয়মের পদ্ধতি (Four Rules Method)**

২। **সমস্যা পদ্ধতি (Problem Method)**

৩। **সূত্র গঠনের পদ্ধতি (Eormula Method)**

১। চার নিয়মের পদ্ধতি (Four Rules Method) :—

সাধারণতঃ আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বীজগণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সম্বন্ধে প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বীজগণিত সুরু করার পদ্ধতি হিসাবে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ ইহাকে উপযুক্ত বলে মনে করেন না। আমরা পদ্ধতিটির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি এখন আলোচনা করছি।

সুবিধা :–

১। ছাত্রেরা 'জানা থেকে অজানা'—প্রবচন অনুসারে শিক্ষালাভ করে। তারা আগে যা শিখেছে এটি তার বিস্তৃত রূপ। সুতরাং তাদের বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না।

২। পাটীগণিতে যে প্যাটার্ন অনুসরণ করা হয়, এখানেও তাই করা হয়। ছাত্রদের জানা পথেই পদক্ষেপ করা হয়। ইহাকে প্রচলিত পদ্ধতিও (Traditional Method) বলে।

অসুবিধা :–

১। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা বীজগণিতকে একটি নীরস বিষয় বলে মনে করে। তাদের বুদ্ধির কোনরূপ নিয়োগ হয় না।

২। পদ্ধতিটি যান্ত্রিক এবং চিত্তাকর্ষক নয়।

৩। বীজগণিতের ঐতিহাসিক অগ্রগতির সঙ্গে পদ্ধতিটির মিল নেই।

৪। ছাত্রদের যুক্তি, বিচার ও চিন্তা করার ক্ষমতার কোন উন্নতি হয় না।

৫। ছাত্রদের সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটে না। তারা অন্ধভাবে নিয়মগুলি অনুসরণ করে।

৬। অপেক্ষকের ধারণা বীজগণিতের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্তু পদ্ধতিটি এ সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করে না।

তবে পদ্ধতিটি একেবারে বর্জনীয় নয়। London Mathematical Association-এর মতে "a certain amount of teaching of the four rules is inevitable in the early stages."

২। **সমস্যা-পদ্ধতি (Problem Method) :—**

আধুনিক শিক্ষাবিদ্দের মতে প্রচলিত চার নিয়মের পদ্ধতির বদলে সমস্যা-পদ্ধতির সাহায্যে বীজগণিত-শিক্ষণ স্থুরু করা উচিত। পাটীগণিতের অনুরূপ সরল সমস্যার সমাধানের ভিতর দিয়ে এই পদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করে। পাটীগণিতের সমস্যার শুধু এইটুকু পার্থক্য থাকে যে সমস্যাটিতে একটি অজানা রাশি 'x' প্রবর্তন করা হয় এবং সমগ্র সমস্যাটিকে একটি সমীকরণের ভাষায় প্রকাশ করা হয়। যেমন, $x+7=11$. পাটীগণিতের ভাষায় বলতে হয় 7-এর সঙ্গে কত যোগ করলে 11 হয়? অনুরূপে 15 থেকে কত বাদ দিলে 10 হয়? সমস্যাটি বীজগণিতে সমীকরণের ভাষায় লেখা যেতে পারে $15-x=10$। বীজগণিতের সমস্যায় x-এর মান নির্ণয় করলেই সমস্যার সমাধান হয়। বীজগণিতের সমস্যার ভিতর দিয়েই চার নিয়ম শেখানো যেতে পারে।

যেমন, $2+3=x$, $8-3=x$, $7\times 3=x$ এবং $20\div 4=x$। সমীকরণের মাধ্যমে অপেক্ষকেরও ধারণা দেওয়া যাবে। যেমন, $y=4x$, x-এর মান 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি বসিয়ে y-এর মানের পরিবর্তনগুলি দেখানো যেতে পারে। এইভাবে y-এর মান x-এর মানের উপর নির্ভরশীল—এই ধারণা ছাত্রদের হবে। এখন পদ্ধতিটির স্থবিধা ও অস্থবিধাগুলি আলোচনা করা যাক।

স্থবিধা :—

১। ছাত্রেরা সকল সময় একটি সমস্যা দেখতে পায়—তারা তার সমাধান করতে আগ্রহী হয়।

২। শিশুদের ধাঁধার উত্তর দেওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। পদ্ধতিটি তাদের ঐ প্রবণতাকে তৃপ্ত করে। স্থতরাং তারা স্বাভাবিকভাবেই পদ্ধতিটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে।

৩। তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

৪। এই পদ্ধতিতে যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করতে হয় না বলে শিশুদের বুদ্ধির ব্যবহার হয়। এতে তাদের চিন্তা, যুক্তি ও বিচার করার ক্ষমতা বাড়ে।

৫। পদ্ধতিটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও উপকারী। কাজেই শিশুদের পদ্ধতিটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মায়।

৬। পদ্ধতিটি শিশু-কেন্দ্রিক বলে ইহা বিশেষভাবে উপযুক্ত।

৭। সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়েই বীজগণিতের উৎপত্তি। স্থতরাং পদ্ধতিটি বীজগণিতের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

অসুবিধা :—

১। শিক্ষক নিজে ভালোভাবে প্রস্তুত না থাকলে এই পদ্ধতিতে চার নিয়ম শেখানো শক্ত হয়ে পড়ে।

২। পদ্ধতিটির সাহায্যে সূত্রগঠন শেখানো ও অপেক্ষক সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া অসুবিধাজনক। সমস্যা-পদ্ধতিতে 'x'-কে অজ্ঞাত রাশি হিসাবেই ধরতে ছাত্রেরা শেখে। কিন্তু সূত্রে বা অপেক্ষকে 'x' চল রাশি। 'x' সম্বন্ধে এই নতুন ধারণাটি দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

৩। সূত্রগঠন-পদ্ধতি (Formula Method) :

এই পদ্ধতিতে প্রতীকের সাহায্যে সংখ্যাসংক্রান্ত এমন কতকগুলি সম্বন্ধ স্থাপন করা হয় যেগুলি সমগ্র সংখ্যাদলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন $(x+2)^2=x^2+4x+4$, সূত্রে n-বর্ণটি যে কোন সংখ্যা 1, 2, 5, 7 ইত্যাদির প্রতীক। x-এর সকল মানের ক্ষেত্রেই সম্বন্ধই বজায় থাকে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, x একটি চল রাশি—অজ্ঞাত রাশি নয়। সূত্রগঠন পদ্ধতিতে সূত্র গঠন ক'রে সূত্রকে সমস্যাসমাধানে প্রয়োগ করা হয়। পদ্ধতিটির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করা হল।

সুবিধা :—

১। বীজগণিতের মূলসূত্র সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়।

২। সাধারণ সূত্র প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশের মাধ্যমে প্রতীকের ভাষা আয়ত্ত হয়।

৩। সামান্যীকরণের শিক্ষা হয়।

৪। পদ্ধতিটি শিশুকে বিভিন্ন ঘটনা বা নিয়মকে সূত্রাকারে প্রকাশ করতে আগ্রহী করে।

অসুবিধা :—

১। পদ্ধতিটি শিশুকেন্দ্রিক নয়। শিশুরা প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই শেখে। এই পদ্ধতিতে আগে নিয়মগুলি শিখতে হয়। পরে তাদের প্রয়োগ হয়।

২। সূত্রগুলি যথাযথ প্রয়োগ করার শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অভ্যাস দরকার। ছাত্রদের কাজেই খুব পরিশ্রম করতে হয়।

৩। পদ্ধতিটি শিক্ষকের শেখানোর দিক থেকে বেশ সহজ ও উপযোগী। কিন্তু ছাত্রের কাছে পদ্ধতিটি বেশ জটিল মনে হয়।

৪। পদ্ধতিটি ব্যবহারের জন্য শিক্ষকের পক্ষে সঠিক নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয় না। ছাত্রও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, সে কিভাবে পদ্ধতিটি ব্যবহার করবে।

বীজগণিত শিক্ষণে সমস্যা-পদ্ধতি ও সূত্রগঠন পদ্ধতির মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে—এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। London

Mathematical Association-এর মতে "It may be said definitely that it is a mistake to lay emphasis on either problems or formulae to the exclusion of the other," পদ্ধতি দুটির সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করলে উল্লিখিত বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে।

সমস্যা-পদ্ধতি ও সূত্রগঠন পদ্ধতির তুলনা ঃ

১। দুটি পদ্ধতিতেই মূলত সমস্যাসমাধানকে ভিত্তি করা হয়। ফলে ছাত্রেরা বীজগণিত শিখতে আগ্রহী হয়।

২। উভয় পদ্ধতির কাজ সমীকরণকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। বীজগণিতের ঐতিহাসিক অগ্রগতির সঙ্গে ইহা সঙ্গতিপূর্ণ।

৩। উভয় পদ্ধতিতেই ছাত্রদের চিন্তা, যুক্তি ও বিচার করার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

৪। উভয় পদ্ধতিতেই প্রয়োজন মত প্রথম নিয়ম চারটি শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ নিয়মগুলি আগে যান্ত্রিকভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয় না।

৫। সমস্যা-পদ্ধতিতে কোন পূর্বজ্ঞান প্রয়োজন হয় না। সমাধানের ভিতর দিয়েই প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জিত হয়। সূত্রগঠন-পদ্ধতিতে বেশ কিছুটা পূর্বজ্ঞান না থাকলে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা যায় না।

৬। সূত্রগঠন পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা গতানুগতিকতা ও যান্ত্রিকতা বর্তমান।। সমস্যা-পদ্ধতি ঐগুলি থেকে মুক্ত।

৭। সূত্রগঠন-পদ্ধতিতে সমস্যা-পদ্ধতি অপেক্ষা প্রতীকের ব্যবহার বেশী।

৮। সূত্রগঠন-পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত বলে, ইহার সাহায্যে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু সমস্যা-পদ্ধতিতে বিলম্ব ঘটে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, একটি পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অপরটি গ্রহণ করা উচিত হবে না। উভয় পদ্ধতিই সমস্যা সমাধানকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়। ছাত্রেরা অনেক সময় পদ্ধতি না বুঝে সমাধানের ধাপগুলি মুখস্থ করে যান্ত্রিকভাবে সমস্যার সমাধান করে। এই ত্রুটি দূরীকরণে London Mathematical Association-এর নির্দেশ—

"Equation should, with beginners, arise either from problems or from the use of formulae when one of the letters in the formulae is unknown."

বীজগণিত-শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ

১। দিক-নির্দেশক সংখ্যা (Directed Numbers) ঃ—

পাটীগণিতে শিশু 0 শূন্য সংখ্যাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং জেনেছে যে সংখ্যা মাত্র বস্তুনির্দেশক। আবার সংখ্যা লিখনে শূন্যের একটি স্থান আছে। সে জানে সংখ্যা মাত্র বস্তুনির্দেশক। আবার

দু'রকম সংখ্যা সম্বন্ধে তার ধারণা হয়েছে—পরিমাণবাচক ও পূরণবাচক। সে শিখেছে যে একই সংখ্যাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং স্থান অনুযায়ী তার মানও পরিবর্তিত হয়।

বীজগণিতে 0 শূন্য সংখ্যার প্রতীক নয়। 0 শূন্যকে মূল উৎপত্তি বিন্দু ধরা হয়। সংখ্যাগুলি দিক-নির্দেশক। একদিক ধনাত্মক হলে বিপরীত দিককে ঋণাত্মক বলা হয়। আবার সংখ্যা বস্তুবাচক হবেই এমন কোন মানে নেই। ইহা গুণবাচকও হতে পারে। যেমন, আয় (ধনাত্মক), ব্যয় (ঋণাত্মক)। এইজন্য বীজগণিতে সংখ্যাকে গুণবাচক সংখ্যাও বলে।

বীজগণিতের সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা দেবার জন্য প্রথমে পাটীগণিতের এমন একটি সরল অঙ্কের সাহায্য নিতে হবে যার উত্তরফল হবে ঋণাত্মক। এতে শিশুদের মনে এই নতুন ধরনের সংখ্যা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ সৃষ্ট হবে। তারা বীজগণিত শিখতে আগ্রহী হবে।

দিক্-নির্দেশক বা চিহ্নিত সংখ্যার ধারণা প্রথমে উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে হবে। যেমন উপরের দিক—ধনাত্মক, নীচের দিক—ঋণাত্মক। উত্তর দিক—ধনাত্মক, দক্ষিণ দিক—ঋণাত্মক ; আয়—ধনাত্মক, ব্যয়—ঋণাত্মক ; পরের সময়—ধনাত্মক, আগের সময়—ঋণাত্মক ইত্যাদি। তারপরে একটি স্কেলের সাহায্যে দিক-নির্দেশক সংখ্যার ধারণা দেওয়া দরকার। স্কেলে মূল বিন্দু থাকবে ও তার দুদিকে বিভিন্ন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করা যাবে। এই ভাবে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার ধারণা দেওয়া যেতে পারে স্কেলে অবস্থিত সমদূরবর্তী দু'দিকের বিভিন্ন বিন্দুর দ্বারা। নীচের চিত্রের মত একটি স্কেল তৈয়ারী করা যেতে পারে।—

−9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 −0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

স্কেলের 0 শূন্য বিন্দুর ডান দিকের বিন্দুগুলিকে ধনাত্মক ও বাম দিকের বিন্দুগুলিকে ঋণাত্মক সংখ্যা ধরা হয়ে থাকে। চার নিয়ম শেখাবার সময় চিহ্নিত সংখ্যাগুলি ব্রাকেটে লেখাই প্রশস্ত।

যোগ ঃ—

স্কেল ও নিম্নলিখিত চার্টের সাহায্যে যোগ শেখানো যেতে পারে।—

	যোগ অঙ্ক	গণনার আরম্ভ বিন্দু	স্কেলের কতগুলি বিন্দু যোগ করতে হবে	দিক	স্কেলে প্রাপ্ত সংখ্যা
(1)	$(+5)+(+3)$	$+3$	$+5$	ডান	$+8$
(2)	$(+5)+(-3)$	-3	$+5$	ডান	$+2$
(3)	$(-5)+(+3)$	$+3$	-5	বাম	-2
(4)	$(-5)+(-3)$	-3	-5	বাম	-8

এই অঙ্কগুলি ও প্রয়োজন হলে আরো কয়েকটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে যোগের দুটি নিয়ম আবিষ্কার করা যাবে :—

যোগের নিয়ম :—

১। সংখ্যা দুটি একই চিহ্নবিশিষ্ট হলে, সংখ্যা দুটি যোগ করে, যোগফলে সংখ্যা দুটির যা চিহ্ন আছে তাই বসাতে হবে।

২। সংখ্যা দুটি বিপরীত চিহ্নযুক্ত হলে, বড় সংখ্যাটি থেকে ছোট সংখ্যাটি বিয়োগ দিতে হবে এবং বিয়োগফলে বড় সংখ্যাটির চিহ্ন বসাতে হবে।

বিয়োগ :—

পাটীগণিতে বিয়োগ মানে বাদ দেওয়া। কিন্তু বীজগণিতে বিয়োগ হচ্ছে যোগের বিপরীত ক্রিয়া। বীজগণিতে $(+5)-(+3)$ মানে $+3$-এর সঙ্গে কত যোগ করলে $+5$ হবে ?

	বিয়োগ অঙ্ক	গণনার আরম্ভ বিন্দু	নতুন অবস্থান	দিক	কতগুলি বিন্দু গুণতে হয়েছে
(1)	$(+5)-(+3)$	$+3$	$+5$	ডান	$+2$
(2)	$(+5)-(-3)$	-3	$+5$	ডান	$+8$
(3)	$(-5)-(+3)$	$+3$	-5	বাম	-8
(4)	$(-5)-(-3)$	-3	-5	বাম	-2

নিয়ম :—

বিয়োজ্যের চিহ্ন পরিবর্তন করে বিয়োজনের সঙ্গে যোগ করতে হবে।

গুণ :—

বীজগণিতে গুণের ক্ষেত্রে যে চিহ্নের নিয়ম (*Rule of Signs*) তার কোন প্রমাণ দেওয়া এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। প্রকৃত পক্ষে এর কোন প্রমাণ হয় না। তবে যতদূর সম্ভব গুণক্রিয়ায় চিহ্নের নিয়মগুলির যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

ক। **যুক্তিসম্মত পদ্ধতি :—**

গুণের সংজ্ঞা অনুযায়ী

$(+3)\times(+2)=+3$ দু'বার বা $+2$ তিনবার $=+6\cdots(1)$

$(+3)\times(-2)=-2$ তিনবার $=-6\cdots(2)$

$(-3)\times(+2)=-3$ দু'বার $=-6\cdots(3)$

এই তিনটি গুণের অঙ্ক থেকে দেখা যাচ্ছে যে (1)-এর উৎপাদকদ্বয়ের যে কোন একটির চিহ্ন পরিবর্তন করলে গুণফলের চিহ্নও পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ (1)-এর একটি উৎপাদকের $(+2)$ চিহ্ন পরিবর্তন করার ফল হচ্ছে গুণফল $(+6)$-এর চিহ্ন পরিবর্তিত হয়ে (-6) হবে। একই যুক্তি অনুসরণ করে বলা যেতে পারে (2)-এর

একটি উৎপাদক (+3)-এর চিহ্ন পরিবর্তন করে (−3) লেখার ফল হবে গুণফল (−6)-এর চিহ্ন পরিবর্তন করা ; অর্থাৎ $(-3)\times(-2)=+6$.

খ। **বিয়োগের নিয়মের সাহায্যে ঃ—**

বিয়োগের নিয়মে আমরা দেখেছি

$$-(+5)=+(-5)=-5$$

$$\therefore\quad (-8)\times(+5)=-(+8)\times(+5)=-(+40)=-40$$

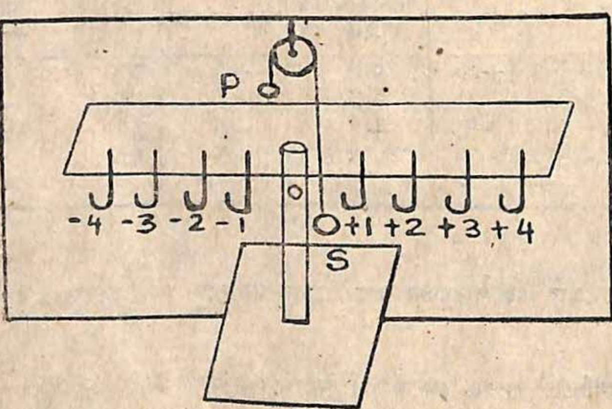
আবার $(+8)\times(-5)=+(8\times-5)=+(-40)=-40$

পুনরায় $-(-5)=+5$ (বিয়োগের নিয়ম থেকে)

$$\therefore\quad (-8)\times(-5)=-(+8)\times(-5)=-(-40)=+40$$

গ। **শিক্ষণ সহায়কের সাহায্যে ঃ—**

নিম্নলিখিত যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে গুণের চিহ্নের বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।



বর্ণনা ঃ—একটি কাঠের পাটাতনের ওপর একটি দণ্ড উল্লম্বভাবে স্থাপিত। দণ্ডটির মাথায় একটি কার্ড-বোর্ডের স্কেলকে মধ্য বিন্দু O-তে একটি পিন দিয়ে এমনভাবে আটকানো আছে যাতে স্কেলটি সামান্য চাপেই নীচু বা ওপর দিকে নড়তে পারে। স্কেলের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিকে বিভিন্ন দূরত্বে হুক আটকানো আছে। O বিন্দুর ঠিক ওপরেই একটি পুলি আছে। পুলির ওপর দিয়ে একটি সুতো ঝুলছে। সুতোর দু পাশে দুটো আংটা P ও S বাঁধা আছে। P আংটাটি হুকে লাগিয়ে S আংটায় কোন ওজন ঝুলিয়ে দিলে স্কেলে ওপর দিকে চাপ হবে। আর শুধু হুকে ওজন ঝুলিয়ে দিলেই চাপ হবে নীচের দিকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুলি ও সুতোর ব্যবহার হবে না।

প্রচলিত রীতি অনুসারে, স্কেলে ওপর দিকে চাপকে ধনাত্মক চাপ এবং নীচের দিকের চাপকে ঋণাত্মক চাপ বলা হবে। ধনাত্মক চাপ সৃষ্টি করতে হলে ওজন দিতে হবে 'S'-এ

এবং ঋণাত্মক চাপ সৃষ্টি করতে হলে ওজন দিতে হবে হুকে। আর ওপর নীচে চাপের ফলে স্কেলটি যখন ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে ঘুরবে, তখন উহাকে ধনাত্মক দিক বলা হবে এবং যখন ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে সেই দিকেই ঘুরবে, তখন উহাকে ঋণাত্মক দিক ধরা হবে।

এই যন্ত্রটির সাহায্যে দুটি সংখ্যার গুণফলের চিহ্ন কি হবে তা' বোঝা যাবে। উহাদের গুণফলের মান নির্ণীত হবে না।

আমরা নিম্নলিখিত চার্টের সাহায্যে চারটি গুণনক্রিয়া দেখাব। স্কেল ঘোরার চিহ্ন হবে গুণের চিহ্ন।

	গুণ অঙ্ক	ওজন	চাপের চিহ্ন	ওজন কোথায় দিতে হবে	কোন হুক ব্যবহার করা হবে	স্কেল ঘোরার চিহ্ন
(1)	$(+3)\times(+2)$	2 গ্রাম	ধনাত্মক	S	$+3$	ধনাত্মক
(2)	$(+3)\times(-2)$	ঐ	ঋণাত্মক	হুক	$+3$	ঋণাত্মক
(3)	$(-3)\times(+2)$	ঐ	ধনাত্মক	S	-3	ঋণাত্মক
(4)	$(-3)\times(-2)$	ঐ	ঋণাত্মক	হুক	-3	ধনাত্মক

নিয়ম :—

যখন উৎপাদক দুটির চিহ্ন একই হবে, সংখ্যা দুটি গুণ করে, গুণফলের চিহ্ন ধনাত্মক করতে হবে। উৎপাদক দুটির চিহ্ন বিপরীত হলে, গুণফলের চিহ্ন ঋণাত্মক হবে।

ভাগ :—

ভাগ গুণেরই বিপরীত ক্রিয়া। চিহ্ন-সংক্রান্ত গুণের নিয়ম ভাগের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য হবে।

২। সূত্র (Formulae) :—

সূত্র বীজগণিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সূত্রের সাহায্যে বড় তথ্যকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা যায়। সূত্র-শিক্ষণের সময় দেখতে হবে, ছাত্রেরা যেন অন্ধভাবে সূত্রগুলি না মুখস্থ করে এবং যান্ত্রিকভাবে উহাদের ব্যবহার না করে। সূত্র শেখাবার সময় শিক্ষক যেন সূত্রটিকে একেবারে ছাত্রদের কাছে না উপস্থাপিত করেন। তিনি নানাভাবে চেষ্টা করবেন যাতে ছাত্রেরাই উহা আবিষ্কার করতে পারে। ছাত্রদের সূত্র আবিষ্কারে তিনি প্রয়োজন মত সাহায্য করবেন মাত্র। এতে তারা সূত্রগুলি বুঝতে পারবে। তারা আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বিষয়টি শিখবে, সূত্র শেখানোর পর তাদের প্রয়োগ কি করে করতে হবে—নানা উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষক তা দেখাবেন এবং সূত্রের বাস্তব উপযোগিতা সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত

করবেন এবং সূত্রগুলি ব্যবহারে তাদের উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজন মত জ্যামিতিক চিত্র বা মডেলের সাহায্যে শিক্ষক মহাশয় সূত্র বোঝাবেন। (পাঠটীকা দ্রষ্টব্য)

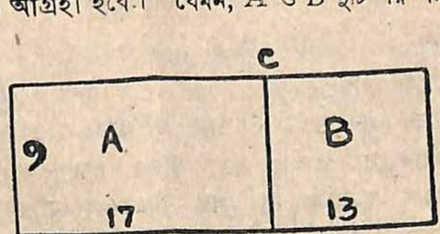
৩। উৎপাদক নির্ণয় (Factorisation) :—

পাটীগণিতে ছাত্রদের উৎপাদক সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়েছে। উৎপাদকের কিছু কিছু ব্যবহারও তারা করেছে। বীজগণিতে উৎপাদক নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বীজগণিতে উৎপাদক নির্ণয় অধ্যায়টি ছাত্রেরা ঠিক মত আয়ত্ত করতে পারে না। বীজগণিতের উৎপাদককে তারা পাটীগণিতের উৎপাদক থেকে স্বতন্ত্র চোখে দেখে। পাটীগণিতের ধারণার বিস্তৃতি হিসাবেই তাদের উৎপাদক নির্ণয় শেখানো উচিত। সাংখ্য উৎপাদকবিশিষ্ট অঙ্ক থেকে সুরু করে ধীরে ধীরে ধারণার বিস্তৃতি আনতে হবে। ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে পাটীগণিতের উৎপাদক ও বীজগণিতের উৎপাদকের মধ্যে আকারের কোন তফাত নেই। বীজগণিতের উৎপাদক নির্ণয়ে সূত্রের প্রয়োগ যথেষ্ট সাহায্য করে। এর ফলে সূত্রগুলিও ছাত্রদের বেশ আয়ত্তে আসে। উৎপাদক বিশ্লেষণে নকশা, চিত্র, মডেল ইত্যাদি খুব সহায়তা করে।

উৎপাদক-বিশ্লেষণ সুরু করা যেতে পারে নিম্নলিখিতভাবে :

গুণ	ভাগ	উৎপাদক
$5\times7=?$	$35\div5=?$	$35=?\times?$
$7\times11=?$	$77\div7=?$	$77=?\times?$
$a\times b=?$	$ab\div a=?$	$ab=?\times?$
$x(x+a)=?$	$(x^2+ax)\div x=?$	$x^2+ax=?\times?$

মূর্ত উদাহরণ বা চিত্রের সাহায্যে প্রথমে উৎপাদক বিশ্লেষণ শেখানো উচিত। এতে ছাত্ররা বিষয়টির প্রতি আগ্রহী হবে। যেমন, A ও B দুটি পরস্পর সংলগ্ন ক্ষেত্রে একই



প্রস্থ 9 মি এবং দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 17 মি ও 13 মি। উহাদের CD রেখা দ্বারা পৃথক করা আছে।

এখন $A=9\times17$ বর্গ মি

এবং $B=9\times13$ বর্গ মি

$\therefore$ A ও B ক্ষেত্রের সমষ্টি

$$=(9\times17+9\times13) \text{ বর্গ মি}$$

এখন CD রেখাটি তুলে দিলে, সমগ্র A ও B ক্ষেত্র

$$=9(17+13) \text{ বর্গ মি.}$$

$$\therefore\ 9\times17+9\times13=9(17+13)$$

তা হলে $a\times b+a\times c=a(b+c)$

অনুরূপ ভাবে চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়

$ab-ac=a(b-c)$

$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

ax^2+bx+c বিশেষ বিশেষ উদাহরণের সাহায্যে শেখাতে হবে। যেমন x^2+5x+6। (পাঠটীকা দ্রষ্টব্য)

8। **ভগ্নাংশ (Fractions) :—**

পাটীগণিতের ভগ্নাংশের যোগ বা বিয়োগ করা সম্ভব যখন তাদের হরগুলি সমান হয়—এটি ছাত্রেরা জানে। বীজগাণতের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি থাটে। যেমন,

$$\frac{3}{7}+\frac{2}{7}=\frac{3+2}{7}=\frac{5}{7}$$

এখানে, 7-এর বদলে y লিখলে, আমরা পাই

$$\frac{3}{y}+\frac{2}{y}=\frac{3+2}{y}=\frac{5}{y}$$

এখন, 3-এর বদলে p, and 2-এর বদলে q লিখলে দেখা যাবে

$$\frac{p}{y}+\frac{q}{y}=\frac{p+q}{y}$$

অনুরূপে, $\frac{p}{y}-\frac{q}{y}=\frac{p-q}{y}$.

$$\frac{3}{5},\ \frac{3\times2}{5\times2},\ \frac{3\times7}{5\times7},\ \frac{3\times p}{5\times p}$$

ভগ্নাংশগুলি সমতুল্য (equivalent); কারণ প্রত্যেকটির মান $\frac{3}{5}$।

অনুরূপে,

$$\frac{x+2}{x+7},\ \frac{2(x+2)}{2(x+7)},\ \frac{3(x+2)}{3(x+7)},\ \frac{p(x+2)}{p(x+7)},\ \frac{(x-5)(x+2)}{(x-5)(x+7)}.$$

ভগ্নাংশগুলি সমতুল্য।

পাটীগণিতে ভিন্ন হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ বা বিয়োগ করা যেতে পারে, যখন তাদের এক হর-বিশিষ্ট সমতুল্য ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায়। বীজগণিতের ভগ্নাংশেও এই নিয়মটি খাটে। যেমন,

$$\frac{3}{5}-\frac{2}{9}=\frac{3.9}{5.9}-\frac{2.5}{9.5}=\frac{27}{45}-\frac{10}{45}=\frac{27-10}{45}=\frac{17}{45}.$$

অনুরূপে,

$$\frac{3}{x}-\frac{2}{y}=\frac{3.y}{x.y}-\frac{2x}{y.x}=\frac{3y-2x}{xy}.$$

$\frac{p+q}{y}$ জাতীয় বিভিন্ন হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ ছাত্রেরা প্রায়ই দুটি ভুল করে :—

১। ভগ্নাংশগুলি যখন সমতুল্য ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয় তখন লবের প্রত্যেক পদকে গুণ না করা।

২। ভগ্নাংশগুলি যখন সমতুল্য ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয় তখন লবের প্রত্যেক পদে গুণের চিহ্নের নিয়ম অনুসরণ করা।

অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দেখেছি যে, ছাত্রদের ঐ ভুলগুলি অনেক কমে যায় যদি $\frac{p+q}{y}$ ভগ্নাংশটিকে $\frac{1}{y}(p+q)$ আকারে লেখা হয়।

৫। সমীকরণ (Equations) :—

সমীকরণ বীজগণিতের কেন্দ্রীয় বিষয়। এ সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখন বিভিন্ন সমীকরণ শেখানোর কিছু পথ নির্দেশ করা হবে।

ক। সরল সমীকরণ (Simple Equations) :—

সমীকরণ শেখাতে ভারসাম্য নিয়ম (Balance Method) খুব কার্যকরী। সমীকরণ শেখানোর আগে সমীকরণ ও অভেদের মধ্যে পার্থক্যটি শিক্ষক ছাত্রদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

(i) মনে করা যাক, একটি দাঁড়িপাল্লায় কোন বস্তুর ওজন বার করতে হবে। বাম পাল্লায় বস্তুটি রেখে ডান পাল্লায় 100 গ্রাম বাটখারা চাপিয়ে দেখা গেল ডান পাল্লা একটু ঝুঁকে পড়েছে। উভয় দিকের ওজন সমান করার জন্য বাম পাল্লায় মোট 8 গ্রাম বাটখারা চাপাতে হল। এখন বস্তুটির ওজন যদি x গ্রাম হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে—

$$x+8=100 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(1)$$

একটি অজ্ঞাত রাশিবিশিষ্ট কতকগুলি রাশির মধ্যকার উল্লিখিত রূপ সম্বন্ধকে সরল সমীকরণ বলে।

এখন দাঁড়িপাল্লার উভয় পাল্লা থেকে 8 গ্রাম বাদ দিলে ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং বস্তুটির সঠিক ওজন পাওয়া যাবে। সমীকরণের ভাষায় এই কাজটি সম্বন্ধে বলা যায় যে (1) সমীকরণের উভয় দিক থেকে যদি 8 বাদ দেওয়া হয়, তা হলে

$$(x+8)-8=100-8.$$

বা, $x=92.$

$\therefore$ বস্তুটির ওজন 92 গ্রাম।

যদি বাম পাল্লায় $(x+p)$ গ্রাম ডান পাল্লায় q গ্রামের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখে, তা হলে ঘটনাটি নীচের সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা যাবে—

$$x+p=q \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(2)$$

উভয় দিক থেকে p বাদ দিলে

$$(x+p)-p=q-p$$

বা, $x=q-p \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(3)$

এক্ষেত্রে বস্তুটির ওজন $(q-p)$ গ্রাম।

(1) ও (2) সমীকরণের অজ্ঞাত রাশির মান নির্ণয়ের এই পদ্ধতিকে সমীকরণের সমাধান করা বলে।

(ii) আবার বাম পাল্লায় $(x-a)$ গ্রাম যদি ডান পাল্লার b গ্রামের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখে, তাহলে আমরা

$x-a=b$ সমীকরণটি পাই।

উভয় পাল্লায় 'a' গ্রাম ওজন যোগ করলে ভারসাম্য বজায় থাকে।

$$\therefore \quad (x-a)+a=b+a$$

বা, $x=b+a.$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সমীকরণের বাম পার্শ্বে অবস্থিত '$-a$' পার্শ্ব পরিবর্তন করে ডান পার্শ্বে এসে '$+a$' হয়ে গেছে। আবার (2) ও (3) থেকে দেখা গেছে বাম পার্শ্বে অবস্থিত '$+p$' পার্শ্ব পরিবর্তন করে ডান পার্শ্বে এসে '$-p$' হয়ে গেছে।

নিয়ম :—

সমীকরণে কোন পদ পার্শ্ব পরিবর্তন করলে চিহ্ন পরিবর্তন করে।

(iii) মনে করা যাক বাম পাল্লার x গ্রাম বস্তু ডান পাল্লার 25 গ্রাম বাটখারার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখে। স্পষ্টতঃই x গ্রামের দুটি বস্তু 2×25 গ্রাম বাটখারার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখবে। অর্থাৎ

$$x=25$$
$$2x=2\times 25$$
$$3x=3\times 25$$
$$nx=n\times 25$$

দেখা যাচ্ছে, সমীকরণের উভয় পার্শ্বে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে দেখানো যেতে পারে যে, সমীকরণের উভয় পার্শ্ব একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যেতে পারে।

সমীকরণ সমাধান করে অজ্ঞাত রাশির যে মান পাওয়া যাবে, সেটি মূল সমীকরণে বসিয়ে মিল করে নিতে হবে।

খ। সহ-সমীকরণ (Simultaneous Equations) ঃ—

আমরা দেখেছি যে, সমীকরণে একটি অজ্ঞাত রাশি x থাকলে, x-এর একটি মান সমীকরণকে সিদ্ধ করে। সমীকরণে দুটি অজ্ঞাত রাশি x ও y থাকলে কি হয় দেখা যাক। মনে করা যাক সমীকরণটি

$$x+y=7$$

একে লেখা যেতে পারে $x=7-y$

এখানে দেখা যাচ্ছে y-এর প্রত্যেক মানের জন্য x-এর একটি অনুরূপ মান আছে। যেমন,

যদি $y=1$ হয়,	$x=7-1=6$
$y=2$ "	$x=7-2=5$
$y=7$ "	$x=7-7=0$
$y=10$ "	$x=7-10=-3$ ইত্যাদি।

সুতরাং x ও y-এর অসীমসংখ্যক মান আছে যারা সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে।

অনুরূপভাবে দেখানো যেতে পারে, x ও y-এর অসীমসংখ্যক মান আছে যারা $x-y=3$ সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে।

উভয় সমীকরণে x ও y-এর অসীমসংখ্যক মানের মধ্যে এমন মান পাওয়া যেতে পারে যা উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে।

$$x+y=7 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(1)$$

$$x-y=3 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(2)$$

(1) থেকে $x=7-y$

(2) থেকে $x=3+y$

সুতরাং উভয় সমীকরণে x-এর মান সমান হলে

$$3+y=7-y$$

$\therefore\ 2y=4$

বা, $y=2$

কারণ $x=7-y$; $\therefore\ x=7-2=5.$

এখানে দেখা যাচ্ছে, x ও y-এর একটি করে মান উভয় সমীকরণকে একই সঙ্গে সিদ্ধ করে এবং সেগুলি $x=5$, $y=2$.

দুটি অজ্ঞাত রাশিবিশিষ্ট এক জোড়া সমীকরণকে সহ সমীকরণ বলে।

সহ-সমীকরণের সমাধান ঃ—

উল্লিখিত সমীকরণ দুটি সমাধান করা হয়েছিল, উভয় সমীকরণ থেকে x-কে অপনয়ন করে, উহাদের একটি সরল সমীকরণে রূপান্তরিত করে।

সাধারণতঃ নীচের পদ্ধতিতে অপনয়ন করা হয়।

উদ্দাহরণ ১। x ও y-এর মান নির্ণয় করতে হবে, যারা নিম্নলিখিত সমীকরণ দুটিকে একই সঙ্গে সিদ্ধ করে।

$$3x-y=22 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(1)$$
$$x-y=8 \quad \cdots \quad \cdots \quad (2)$$

প্রত্যেক সমীকরণের বাম পক্ষ ডান পক্ষের সঙ্গে সমান। সুতরাং উভয়ের বাম পক্ষের অন্তরফল উভয়ের অনুরূপ ডান পক্ষের অন্তর ফলের সমান।

(2)-এর বাম পক্ষকে (1)-এর বামপক্ষ থেকে বিয়োগ করলে y-অপনীত হবে।

$\therefore$ (1)—(2) থেকে $\quad 2x=14$

$\therefore \quad x=7$

(1) অথবা (2), যে কোন সমীকরণে $x=7$ বসালেই y-এর মান নির্ণীত হবে।

(2)-এ $x=7$ বসাইয়া

$7-y=8$

$\therefore \quad y=-1$

মনে রাখতে হবে যে, একটি অজ্ঞাত রাশির মান বার করার পর সরলতর সমীকরণটি থেকে দ্বিতীয় অজ্ঞাত রাশির মান বার করতে হবে। উভয় অজ্ঞাত রাশির মান বার করার পর মূল সমীকরণ থেকে মান দুটি মিল করতে হবে।

উদাহরণ ২। সমীকরণ $\quad 7x+4y=5 \quad \cdots \quad \cdots(1)$

$$3x+2y=1 \quad \cdots \quad \cdots(2)$$

(2) কে 2 দিয়ে গুণ করে উভয় সমীকরণের y-এর সহগ সমান করে নিয়ে পূর্বের উদাহরণের মত সমাধান করতে হবে।

গ। দ্বিঘাত সমীকরণ (Quadratic Equations) :—

কোন সংখ্যাকে 0 শূন্য দিয়ে গুণ করলে গুণফল 0 হয়। সুতরাং, যদি $a\times b=0$, তা হলে হয় $a=0$ অথবা $b=0$; অথবা এই ক্ষেত্রে $a=0$ এবং $b=0$, কারণ $0\times 0=0$.

এখন, $(x-4)(x-7)=0$ সমীকরণটির কথা ধরা যাক।

এখানে হয় $x-4=0$ অথবা $x-7=0$.

যদি $x-4=0$ হয়, তাহলে $x=4$। যদি $x-7=0$ হয় তাহলে $x=7$। $x=4$ বা $x=7$, x-এর দুটি একান্তর মান যা $(x-4)(x-7)=0$ সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে।

$a\times b=0$ সমীকরণে, $a=0$ এবং $b=0$-ও একটি সম্ভাব্য সমাধান। এই সমাধানটি কিন্তু $(x-4)(x-7)=0$ সমীকরণের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ, যদি একই সঙ্গে, $x-4=0$ এবং $x-7=0$ হয় তা হলে $x=4$ এবং $x=7$ এই সঙ্গে হবে ; এর অর্থ $4=7$। সুতরাং $(x-4)(x-7)=0$ সমীকরণের $x=4$ বা $x=7$ সমাধান দুটি একান্তর, সহ-সমাধান নয়।

যে সমীকরণে অজ্ঞাত রাশির সর্ব্বোচ্চ ঘাত 2, তাকে দ্বিঘাত সমীকরণ বলে। যেমন,

$$x^2=36 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(1)$$
$$x^2-4x=0 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(2)$$
$$x^2-9x=22 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(3)$$

দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান :—

উদাহরণ ১। সমীকরণ (1)

সমীকরণটিকে লেখা যেতে পারে $x^2-36=0$

অথবা, $x^2-6^2=0$

বা, $(x+6)(x-6)=0$

তা হলে, হয় $x+6=0 \quad \therefore \quad x=-6$

অথবা, $x-6=0 \quad \therefore \quad x=\ 6$

$\therefore$ সমাধান $x=\pm 6$.

উদাহরণ ২। সমীকরণ (2)

x^2-4x রাশিমালার x সাধারণ উৎপাদক।

$\therefore$ সমীকরণটিকে লেখা যেতে পারে

$$x(x-4)=0$$

তা হলে হয় $x=0$

অথবা, $x-4=0 \quad \therefore \quad x=4.$

সমাধান $x=0$ বা 4

যখন দ্বিঘাত সমীকরণে x-যুক্ত এবং x-বর্জিত পদ দুটিই থাকবে, তখন তিনটি বিশ্লেষণী-পদ্ধতিতে (Analytic Method) উহার সমাধান করা যেতে পারে।

পদ্ধতি ১। উৎপাদক নির্ণয়ের দ্বারা সমাধান :—

দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানে এই পদ্ধতিটি প্রথমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এটি ব্যর্থ হলে, অন্য দুটির যে কোন একটি অবলম্বন করা যেতে পারে।

সমীকরণ : $x^2+(a+b)x+ab=0$

ছাত্রেরা জানে $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

$\therefore \quad (x+a)(x+b)=0.$

তা হলে হয় $x+a=0 \quad \therefore \quad x=-a$

অথবা, $x+b=0 \quad \therefore \quad x=-b$

$\therefore$ সমাধান, $x=-a$ অথবা $-b$

$-a$, $-b$ মান দুটিকে $x^2+(a+b)x+ab=0$ সমীকরণের দুটি বীজ বলা হয়।

উদাহরণটি থেকে দুটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়—

(1) বীজদ্বয়ের যোগফল $-(a+b)=-$(x-এর সহগ)

(2) বীজদ্বয়ের গুণফল $ab=x$-বর্জিত পদ

এখানে মনে রাখতে হবে যে, তথ্য দুটি সত্য হবে যখন x^2-এ সহগ 1 হবে। এই তথ্য দুটির সাহায্যে সমাধান মিল করাও যেতে পারে। x-এর সহগ 1 ছাড়া অন্য কিছু থাকলে, মিল করার আগে সমীকরণটিকে x-এর সহগ দিয়ে ভাগ করে নিতে হবে।

দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান আকার $ax^2+bx+c=0$.

পদ্ধতি ২। বর্গপূরণের দ্বারা সমাধান (Solution by completing the square) ঃ

ছাত্রেরা জানে $x^2+2ax+a^2=(x+a)^2 \quad \cdots(1)$

$$x^2-2ax+a^2=(x-a)^2 \quad \cdots(2)$$

$x^2+2ax+a^2$ এবং $x^2-2ax+a^2$, দুটি পূর্ণ বর্গ দ্বিঘাত রাশিমালা। (1) ও (2)-এর সাহায্যে এমন একটি x-বর্জিত রাশি পাওয়া যাবে, যা x^2 ও x যুক্ত রাশিমালার সঙ্গে যোগ করলে একটি দ্বিঘাত পূর্ণ বর্গ রাশিমালা তৈরী হবে। এই x-বর্জিত রাশিটি বার করার প্রক্রিয়াকে বর্গপুরণের প্রক্রিয়া বলে। বর্গপুরণের আগে x^2-এর সহগকে 1 করে নিতে হবে।

উদাহরণ। সমীকরণ $3x^2-2x-6=0$.

x^2-এর সহগকে 1 করার জন্য সমীকরণটিকে 3 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে $x^2-\frac{2}{3}x-2=0. \quad \cdots(1)$

বামপক্ষে $(\frac{1}{3})^2$ যোগ করে বর্গপূরণ করি এবং ভারসাম্যের জন্য ডানপক্ষে $(\frac{1}{3})^2$ যোগ করি।

$$\{x^2-\frac{2}{3}x+(\frac{1}{3})^2\}-2=(\frac{1}{3})^2$$

বা, $(x-\frac{1}{3})^2-2=\frac{1}{9}$

পক্ষান্তর করে $(x-\frac{1}{3})^2=\frac{1}{9}+2=\frac{19}{9}$.

$\therefore \quad (x-\frac{1}{3})=\pm\sqrt{\frac{19}{9}}=\pm\frac{\sqrt{19}}{3}$.

তাহলে, হয় $(x-\frac{1}{3})=\frac{\sqrt{19}}{3}$.

$$x=\frac{\sqrt{19}}{3}+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}(\sqrt{19}+1).$$

অথবা, $(x-\frac{1}{3})=-\frac{\sqrt{19}}{3}$.

$$x=-\frac{\sqrt{19}}{3}+\tfrac{1}{3}=-\tfrac{1}{3}(\sqrt{19}-1).$$

$\sqrt{19}=4{\cdot}36$ (প্রায়)

$\therefore\ x=\frac{1}{3}(4{\cdot}36+1)=1{\cdot}79$ (প্রায়)

অথবা, $x=-\frac{1}{3}(4{\cdot}36-1)=-1{\cdot}12$ (প্রায়)

$\therefore$ সমাধান, $x=1{\cdot}79$ বা $-1{\cdot}12$ দু দশমিক স্থান পর্যন্ত।

পদ্ধতি ৩। সূত্রের সাহায্যে সমাধান (Solution by Formula) :—

বর্গপূরণ পদ্ধতিতে $ax^2+bx+c=0$ দ্বিঘাত সমীকরণটির বীজদ্বয়কে x^2 ও x-এর সহগ এবং ধ্রুবকের সাহায্যে প্রকাশ করে একটি সূত্র করা যেতে পারে।

উদাহরণ। সমীকরণ $ax^2+bx+c=0$.

x^2-এর সহগকে 1 করার জন্য সমীকরণটিকে a দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় $x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0.$

বামপক্ষে $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ যোগ করে বর্গপূরণ করি এবং ভারসাম্যের জন্য ডান পক্ষেও $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ যোগ করি।

$$\therefore\ \left\{x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2\right\}+\frac{c}{a}=\left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

বা, $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{c}{a}=\frac{b^2}{4a^2}$

পার্শ্বপরিবর্তন করে $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2}{4a^2}-\frac{c}{a}=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$

$$\therefore\ x+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}$$

তা হলে, হয় $x+\frac{b}{2a}=\frac{\sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}.$

$$x=-\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}=\frac{-b+\sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}$$

অথবা, $x+\frac{b}{2a}=-\frac{\sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}$

$$x=-\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}=\frac{-b-\sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}$$

বীজদ্বয় নীচের সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}$$

নিরূপক (Discriminant) ঃ—বর্গমূলের অন্তর্গত রাশিমালা (a^2-4ac)-কে নিরূপক বলে। এই রাশিমালাটিই দ্বিঘাত সমীকরণের বীজদ্বয়ের প্রকৃতি নির্ণয় করে।

(i) যদি b^2-4ac ধনাত্মক হয়, বীজদ্বয় বাস্তব ও বিভিন্ন হবে।

(ii) যদি $b^2-4ac=0$ হয়, বীজদ্বয় বাস্তব ও সমান এবং উভয় বীজই $-\frac{b}{2a}$ এর সমান।

(iii) যদি b^2-4ac ঋণাত্মক হয়, বীজদ্বয় কাল্পনিক।

(কোন দিক্-নির্দেশক সংখ্যার বর্গ ঋণাত্মক হয় না বলে কাল্পনিক।)

(কোন দিক্-নির্দেশক সংখ্যার বর্গ ঋণাত্মক হয় না বলে কাল্পনিক।)

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে সমস্যা-সমাধানের মধ্য দিয়েই সমীকরণ শেখাতে হবে।

সমস্যার তথ্যগুলি বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করতে পারলেই সমস্যা-সমাধান প্রায়ই খুব সহজ হয়। সমীকরণই সমস্যার বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশিত রূপ। সমস্যা সমাধানের জন্য বীজগণিতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করা হয়।

১। অজ্ঞাত রাশিকে বা রাশিগুলিকে x বা x, y প্রভৃতি বর্ণ ধরে নিতে হবে। বর্ণগুলি ধরে নেবার সময় তাহাদের এককগুলি বিবৃত করতে হবে।

২। অজ্ঞাত রাশি বা রাশিগুলি সম্বন্ধে সমস্যায় বিবৃত তথ্যগুলির সাহায্যে এক বা একাধিক (যতগুলি অজ্ঞাত রাশি আছে ততগুলি) সমীকরণ তৈরী করতে হবে।

৩। সমীকরণ বা সমীকরণগুলির সমাধান করতে হবে।

৪। অজ্ঞাত রাশি বা রাশিগুলির মানগুলিকে মিল করে দেখতে হবে।

৬। অমূলদ সংখ্যা (Irrational Numbers) ঃ—

উদ্ভূত সমস্যা ও তার সমাধানের ভিতর দিয়েই সংখ্যার ধারণার ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। প্রথমে 1, 2, 3, 4 প্রভৃতি স্বাভাবিক সংখ্যারই ধারণা ছিল। সংখ্যা বলতে ঐগুলিকেই বোঝাত। সংখ্যা মাত্রই বস্তুবাচক ছিল। ক্রমে বিমূর্ত সংখ্যার ধারণা জন্মায়। দুটি বিমূর্ত সংখ্যার (স্বাভাবিক) যোগ বা গুণফল দুটি বিমূর্ত সংখ্যা (স্বাভাবিক) হয়। কিন্তু উহাদের ভাগফল সকল সময়ে স্বাভাবিক সংখ্যা হয় না। এর থেকেই ভগ্নাংশ-সংখ্যার উৎপত্তি। আবার দুটি বিমূর্ত সংখ্যার বিয়োগফল ঋণাত্মক হলে প্রচলিত সংখ্যার ধারণা দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন সংখ্যার ধারণাকে আরো বিস্তৃত করা হল। সংখ্যাকে দিক্-নির্দেশক বলে অভিহিত করা হল। দিক-নির্দেশক সংখ্যাগুলি একটি সরলরেখার উপর অবস্থিত একটি মূল বিন্দু থেকে দুটি বিপরীত দিকে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বিন্দু বলে কল্পনা করা হয়। সমস্ত স্বাভাবিক ও ভগ্নাংশ (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) সংখ্যাকে এই ভাবে সরলরেখায় অবস্থিত বিন্দুর দ্বারা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু বিপরীত ক্রমে সরলরেখাটিতে অবস্থিত যে কোন বিন্দুকেই স্বাভাবিক বা ভগ্নাংশ

(ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যেমন একক বর্গের কর্ণের ($\sqrt{2}$ বা যার বর্গ 2) দৈর্ঘের সমান দূরত্বে (মূল বিন্দু থেকে) অবস্থিত বিন্দুটিকে কোন স্বাভাবিক সংখ্যা বা ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। মূল বিন্দুর দু দিকে সরলরেখাটির উপর অবস্থিত সমস্ত বিন্দুকেই সংখ্যা কল্পনা করতে হলে, যে সমস্ত বিন্দু $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ প্রভৃতিকে পরিমাপ করে, তারাও একটি করে সংখ্যাকে নির্দেশ করে। সংখ্যাকে সরল রেখায় অবস্থিত বিন্দু বলে কল্পনা করতে হলে $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{4}$ প্রভৃতিকেও সংখ্যা বলে স্বীকার করতে হয়। সংখ্যার ধারণা আরো বিস্তৃত হয়ে এখন আমরা দু রকমের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমতঃ স্বাভাবিক সংখ্যা ও ভগ্নাংশ (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) এবং দ্বিতীয়তঃ $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{4}$ জাতীয় সংখ্যা (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) যাদের রৈখিক দৈর্ঘ্য আছে অথচ যাদের স্বাভাবিক সংখ্যা বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় না। প্রথমোক্ত সংখ্যাকে **মূলদ সংখ্যা** (Rational Number) বলে এবং দ্বিতীয়োক্ত সংখ্যাকে **অমূলদ সংখ্যা** (Irrational Number) বলে। মূলদ সংখ্যা দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার অনুপাত রূপে প্রকাশযোগ্য। অমূলদ সংখ্যাকে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার অনুপাত রূপে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ইচ্ছামত অমূলদ সংখ্যার কাছাকাছি সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে। যেমন $\sqrt{2}$-র কাছাকাছি যে কোন মূলদ সংখ্যা নিয়ে ক্রমে ক্রমে তার চেয়ে বড় অথচ $\sqrt{2}$ চেয়ে ছোট মূলদ সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে। যথা, 1·4, 1·41, 1·414 ইত্যাদি।

পীথাগোরাসপন্থীরা আবিষ্কার করেন যে, বহু বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যকে স্বাভাবিক সংখ্যা বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় না। তাঁরা এই জাতীয় সংখ্যাকে **অমেয়** (incommeasurable) আখ্যা দেন।

করণী (surds), π প্রভৃতি সংখ্যা অমূলদ।

৭। করণী (Surds) :—

কোন সংখ্যার বর্গমূল বলতে আমরা বুঝি এমন একটি সংখ্যা যার বর্গ হবে প্রদত্ত সংখ্যাটি। যথা $\sqrt{25} = \pm 5$, $\sqrt{81} = \pm 9$.

খুব কম সংখ্যাই আছে যাদের সঠিক বর্গমূল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখা যেতে পারে $\sqrt{2}$-র মান বার করার প্রক্রিয়াটি অনন্তকাল চালিয়ে গেলেও সঠিক মান পাওয়া যাবে না। $\sqrt{2}$-জাতীয় সংখ্যা, যাদের অন্য কোন রূপে সঠিক ভাবে প্রকাশ করা যায় না, করণী (Surd) বলে। $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt[3]{10}$, $\sqrt[4]{17}$ প্রভৃতি ইহার আরো উদাহরণ।

যদিও করণীকে মূলদ সংখ্যা রূপে প্রকাশ করা যায় না, কখন কখন ইহাকে একটি মূলদ সংখ্যা ও একটি করণীর গুণফল রূপে প্রকাশ করা যায়। যেমন, $\sqrt{12} = \sqrt{4.3} = \sqrt{4}.\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$। $\sqrt{18} = \sqrt{9.2} = \sqrt{9}.\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$। $\sqrt{500} = \sqrt{100 \cdot 5} = \sqrt{100}.\sqrt{5} = 10\sqrt{5}$।

যখন কোন ভগ্নাংশের হরে করণী-সংখ্যা থাকে, তখন হরটিকে করণীমুক্ত করলে বা মূলদ সংখ্যায় প্রকাশ করলে ভগ্নাংশটির আসন্ন মান বার করতে সুবিধা হয়। হরকে করণীমুক্ত করার প্রক্রিয়াকে হরের করণী-নিরসন (rationalising the denominator) বলে।

উদাহরণ। $\frac{5}{\sqrt{3}}$ র দু দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় কর।

প্রদত্ত $\sqrt{3}=1{\cdot}732$

হরের করণী-নিরসন হবে যদি ভগ্নাংশটিকে $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$ দিয়ে গুণ করা যায়।

$$\frac{5}{\sqrt{3}}=\frac{5}{\sqrt{3}}\,\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{5\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2}=\frac{5\sqrt{3}}{3}.$$

$\sqrt{3}=1{\cdot}732$ ধরলে,

$\frac{5}{\sqrt{3}}=\frac{5\times 1{\cdot}732}{3}=2{\cdot}89$, দু দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান।

আমরা জানি, $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

a-র বদলে $\sqrt{x}$ এবং b-র বদলে $\sqrt{y}$ বসালে পাই

$$(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})=(\sqrt{x})^2-(\sqrt{y})^2$$

$$\therefore\ (\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})=x-y.$$

কোন ভগ্নাংশের হর $(\sqrt{x}+\sqrt{y})$ বা $(\sqrt{x}-\sqrt{y})$ আকারের হলে, হরের করণী-নিরসন উল্লিখিত সূত্রের সাহায্যে করা যেতে পারে।

উদাহরণ। $\frac{12}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ র এক দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় কর।

প্রদত্ত $\sqrt{5}=2{\cdot}236$ ও $\sqrt{2}=1{\cdot}414$

$$\frac{12}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}=\frac{12}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}\ \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}=\frac{12(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{5-2}$$

$$=4(\sqrt{5}+\sqrt{2})$$

$$=4(2{\cdot}236+1{\cdot}414)$$

$$=14{\cdot}6.$$

Al-kho-warizmi (825 খৃঃ) মূলদ সংখ্যাকে 'audible' বা যা শোনা যায়, বলেছেন এবং surd সম্বন্ধে বলেছেন, inaudible বা যা শোনা যায় না। এই inaudible শব্দ থেকেই surd শব্দটি এসেছে বলে মনে হয়। Surd কথাটির মানে বোবা (deaf, mute)। আরবরা ও হিব্রুরা surdকে 'non-expressible number' বা 'যে সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায় না'—বলতেন।

৮। সূচক (**Indices**) :—

কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে যতবার গুণ করা হয় তাহা স্থচকের দ্বারা প্রকাশিত হয়। যেমন,

$a \times a$ a-বর্গ এবং লেখা হয় a^2

$y \times y \times y$. y-ঘন এবং লেখা হয় y^3

$b \times b \times b \times b$ b-র চতুর্থ শক্তি এবং লেখা হয় b^4.

উল্লিখিত ফলগুলির সামান্যীকৃত আকার

$a^n = a \times a \times a \times \cdots\cdots n$ উৎপাদক পর্যন্ত$\cdots(1)$

a^nকে a-র n-তম শক্তি বলে।

সূচক-সূত্র (Laws of Indices) :—

স্থচক-চিহ্নের সাহায্যে গণিতের ফলগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে ও পরিচ্ছন্নভাবে লেখা যায়। স্থচক স্থত্রগুলির সঠিক প্রয়োগের উপর ফলগুলির যাথার্থ্য নির্ভর করে। সাধারণতঃ ছাত্রদের এই ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তি ঘটে, কারণ তারা ঠিক বুঝতে পারে না স্থচকগুলি (1) গুণ করতে হবে, না যোগ করতে হবে ; (2) ভাগ করতে হবে, না, বিয়োগ করতে হবে। স্থচক নিয়মগুলি যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিলে এই বিভ্রান্তি দূর হয়।

(1) **গুণের নিয়ম :** কোন রাশির শক্তিগুলিকে গুণ করতে হলে, স্থচকগুলি যোগ করতে হবে।

উদাহরণ ১। $2^2 \times 2^3 = (2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2) = 2^5 = 2^{2+3}$.

উদাহরণ ২। $a^m \times a^n$.

(1) থেকে $a^m = a \times a \times a \times a \times \cdots\cdots m$ উৎপাদক পর্যন্ত

(1) থেকে $a^n = a \times a \times a \times \cdots\cdots\cdots n$ উৎপাদক পর্যন্ত

$a^m \times a^n = (a \times a \times a \times \cdots\cdots m$ উৎপাদক পর্যন্ত $) \times$

$(a \times a \times a \times \cdots\cdots n$ উৎপাদক পর্যন্ত $)$

ডান পক্ষে মোট $(m+n)$ উৎপাদক আছে যার প্রত্যেকটি a

$\therefore\ a^m \times a^n = a \times a \times a \times \cdots\cdots (m+n)$ উৎপাদক পর্যন্ত

$a^m \times a^n = a^{m+n}$.

(2) **ভাগের নিয়ম :** কোন রাশির শক্তিগুলিকে ভাগ করার সময় স্থচকগুলি বিয়োগ করতে হবে।

উদাহরণ ১। $2^5 \div 2^3 = \dfrac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 2} = 2^2 = 2^{5-3}$.

উদাহরণ ২। $a^m \div a^n = \dfrac{a \times a \times a \times \cdots\cdots m \text{ উৎপাদক পর্যন্ত}}{a \times a \times a \times \cdots\cdots n \text{ উৎপাদক পর্যন্ত}}$

লবের m-সংখ্যক উৎপাদকের মধ্যে n-সংখ্যক উৎপাদক, হরের n-সংখ্যক উৎপাদকের সঙ্গে কেটে দিলে, লবে $(m-n)$ উৎপাদক অবশিষ্ট থাকবে।

$\therefore\ a^m \div a^n = a \times a \times a \times \cdots\cdots (m-n)$ উৎপাদক পর্যন্ত

$\therefore\ a^m \div a^n = a^{m-n}.$

দ্রষ্টব্য ঃ এখানে mকে n অপেক্ষা বড় ধরা হয়েছে। m, n অপেক্ষা ছোট হওয়ার ক্ষেত্রটি পরে আলোচিত হবে।

(3) **শক্তির নিয়ম ঃ** কোন রাশির শক্তিকে অন্য কোন শক্তিতে উন্নীত করতে হলে শক্তিগুলি গুণ করতে হবে।

উদাহরণ ১। $(2^3)^2 = (2\times 2\times 2)\times(2\times 2\times 2)$

$= 2^6 = 2^{3\times 2}$

উদাহরণ ২। $(a^3)^4 = a^3 \times a^3 \times a^3 \times a^3$

$= a^{3+3+3+3}$ (সূচকের প্রথম নিয়ম অনুসারে)

$= a^{12} = a^{3\times 4}.$

উদাহরণ ৩। $(a^m)^n = a^m \times a^m \times a^m \cdots\cdots n$ উৎপাদক পর্যন্ত।

$= a^{m+m+m+\cdots\cdots m}$ পদ পর্যন্ত

$= a^{mn}$

$\therefore\ (a^m)^n = a^{mn}.$

শূন্য সূচক ঃ—

সূচক সূত্র (2) অনুসারে $2^4 \div 2^4 = 2^{4-4} = 2^0$

কিন্তু $2^4 \div 2^4 = 1$

$2^0 = 1$

অনুরূপে $a^n \div a^n = a^{n-n} = a^0$

কিন্তু $a^n \div a^n = 1$

$\therefore\ a^0 = 1$

সুতরাং কোন রাশির 0 শক্তি হলে তার মান 1 হবে।

সূচকের অর্থের বিস্তৃতি ঃ—

এ পর্যন্ত সূচকগুলিকে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ধরা হয়েছে। $a^n = a\times a\times a\ldots n$ উৎপাদক পর্যন্ত, a^n-এর এই সংজ্ঞাতে n ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। n-এর যে কোন বাস্তব মানে অর্থাৎ n ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ হলেও সূচক সূত্রগুলি যদি খাটে তাহলে সূচকের বাস্তব প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। সূচক সূত্রগুলি থেকেই সূচকের অর্থের এই বিস্তৃতি করা যেতে পারে।

ভগ্নাংশ সূচক ঃ—

আমরা দেখেছি $a^m \times a^n = a^{m+n}$.

m ও n এর বদলে $\frac{1}{2}$ বসালে,

$a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = a.$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে $a^{\frac{1}{2}}$ রাশিটির বর্গ a। তাহলে বর্গমূলের সংজ্ঞা অনুসারে $a^{\frac{1}{2}}$কে a-র বর্গমূল ধরা যেতে পারে।

$$\therefore \quad a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$$

$a^{\frac{1}{n}}$-এর অর্থ :

সূচক সূত্র অনুসারে

$a^{\frac{1}{n}} \times a^{\frac{1}{n}} \times a^{\frac{1}{n}} \cdots n$ উৎপাদক পর্যন্ত $= a^{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdots}$ n পদ পর্যন্ত

$$= a^{\frac{1}{n} \cdot n} = a.$$

$$\therefore \quad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$। সুতরাং $a^{\frac{1}{3}}$ a-র ঘনমূল।

$a^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{a}$। সুতরাং $a^{\frac{1}{4}}$ a-র চতুর্থ মূল।

উদাহরণ। $\sqrt{n^4} = (n^4)^{\frac{1}{2}}$

$= n^{4 \cdot \frac{1}{2}}$ (তৃতীয় সূত্র অনুসারে)

$\sqrt{n^4} = n^2$

অনুরূপে $\sqrt[n]{a^m} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = a^{m \cdot \frac{1}{n}} = a^{\frac{m}{n}}$.

তাহলে, দেখা যাচ্ছে কোন রাশির মূল বার করতে হলে রাশির সূচককে মূল নির্ণায়ক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে।

ঋণাত্মক সূচক :—

প্রথম সূত্র অনুযায়ী $a^m \times a^n = a^{m+n}$

m-এর বদলে $-n$ বসালে।

$$a^{-n} \times a^n = a^{-n+n} = a^0 = 1$$

উভয় পক্ষকে a^n দ্বারা ভাগ করিলে

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

সুতরাং a^{-n}, a^n-এর অন্যোন্যক (reciprocal).

৯। অপেক্ষক (function) :—

পর নির্ভরতার ধারণার সঙ্গে অপেক্ষক শব্দটি বিশেষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। কাজেই অপেক্ষক বোঝাতে হলে ছাত্রদের পর নির্ভরতা সম্বন্ধে ধারণাটিকে কাজে লাগাতে হবে। তারা জানে খাদ্য, বস্ত্র, টাকা পয়সা প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্য তাদের পিতামাতার উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের কাপড়-

চোপড় পরিষ্কার করার জন্য তারা ধোবার শরণাপন্ন হয়। শিক্ষার জন্য সাহায্য নিতে হয় শিক্ষকের। অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে বহু জিনিস ও ব্যক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের বোঝানো যেতে পারে যে প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এই পর-নির্ভরতা অবশ্যম্ভাবী। মজুর খেটে রোজগার করে। যে পরিমাণ সে কাজ করতে পারে সেই পরিমাণ তার আয় হয়। মজুরের আয় তার কাজের উপর নির্ভর করছে। বনভোজনে খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করবে ছাত্রের সংখ্যার উপর। ট্রেনের ভাড়া নির্ভর করছে গন্তব্য স্থলের দূরত্বের উপর। ছাত্রদের এইরূপ বহুবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে একটি জিনিস কেমন করে অন্যবস্তুর উপর নির্ভর করে। যা অপরের উপর নির্ভর করে তাকে নির্ভরশীল বস্তুর অপেক্ষক বলে গণিতে। যেমন, মজুরের আয় তার কাজের পরিমাণের অপেক্ষক, খাদ্যের পরিমাণ, ছাত্রের সংখ্যার অপেক্ষক; ট্রেনের ভাড়া দূরত্বের অপেক্ষক; পেন্সিলের দাম পেন্সিলের সংখ্যার অপেক্ষক ইত্যাদি।

পরবর্তী স্তরে উদাহরণ নিয়ে তাদের ধারণা আরো পরিষ্কার এবং বিস্তৃত করা যেতে পারে। যেমন, আয়তক্ষেত্রের

A (ক্ষেত্রফল) $= l$ (দৈর্ঘ্য) $\times\ b$ (প্রস্থ)

এই সূত্রে যদি b (প্রস্থ) অপরিবর্তনীয় হয় এবং l (দৈর্ঘ্য) পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে A (ক্ষেত্রফল) পরিবর্তনশীল হবে। আবার l অপরিবর্তনীয় হয়ে b পরিবর্তনশীল হলেও A পরিবর্তনশীল হবে। সুতরাং A, l ও bর অপেক্ষক।

অনুরূপভাবে দেখানো যেতে পারে, বর্গের পরিসীমা তার বাহুর অপেক্ষক; বৃত্তের পরিধি তার ব্যাসার্ধের অপেক্ষক; ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তার ভূমি ও উচ্চতার অপেক্ষক; শঙ্কুর আয়তন তার উচ্চতা ও ভূমির ব্যাসার্ধের অপেক্ষক; সমগতিতে ধাবমান বস্তুর দূরত্ব সময়ের অপেক্ষক।

এইভাবে প্রচুর উদাহরণের মধ্য দিয়ে অপেক্ষকের ধারণাটি ছাত্রেরা সঠিক উপলব্ধি করলে $y=2x$, $y=5x$, $y=f(x)$-এ y-কে x-এর অপেক্ষক বলে ধারণা করতে ছাত্রেরা পারবে।

১০। চিত্রলেখ (Graph):—

চিত্রলেখ আবিষ্কারের কৃতিত্ব Descartes-এর। প্রাচীন গ্রীকদেরও এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু বীজগণিতে তাঁরা খুব অগ্রসর ছিলেন না বলে তখন এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি।

পাটীগণিত ও বীজগণিতের সম্বন্ধ-নির্দেশক জ্যামিতিক চিত্রকে চিত্রলেখ বলে। চিত্রলেখ অঙ্কন করতে হলে পাটীগণিত ও বীজগণিতের দু দল তথ্য দরকার হয়। এই দু দলের মধ্যে একদল অবশ্যই তার এক দলের উপর নির্ভরশীল হবে। কাজেই চিত্রলেখ সুরু করার আগে অপেক্ষক সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণাটি পরিষ্কার আছে কিনা যাচাই করে দেখে নিতে হবে।

কোন বিষয়ের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে এক নজরে ধারণা করা যায় বলে চিত্রলেখের ব্যবহার বাস্তব জগতে এখন বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছেলে মেয়েরা তাদের ব্যবহারিক জীবনেই চিত্রলেখের সঙ্গে পরিচিত হয়। খবরের কাগজে, মাসিক পত্রিকায় ও নানা বিজ্ঞাপনে আজকাল প্রায়ই চিত্রলেখ দেখা যায়। তাপের ওঠা-নামার চিত্র, জন্ম-মৃত্যুর হারের চিত্র, বস্তুর মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির চিত্র, দৃষ্টিপাতের চিত্র প্রভৃতি খবরের কাগজে দেখা যায়। হাসপাতালে রোগীর তাপ (temperature) লিপিবদ্ধ করা হয় এখন চিত্রলেখে। বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, সরকারী দপ্তরে চিত্রলেখের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। চিত্রলেখ ও পরিসংখ্যানগত তথ্যের ব্যাখ্যা আজকাল আর বিশেষজ্ঞের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বহু বৃত্তিতে সাধারণ কর্মীকেই আজকাল এই কাজ করতে হয়। এইজন্য চিত্রলেখ সম্বন্ধে জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে বিদ্যালয়েই। এই শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে গণিতই উপযুক্ত বিষয়। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষায় গণিতের পাঠক্রমে চিত্রলেখের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীতে নিত্যই নানা ঘটনা ঘটছে। সকল ক্ষেত্রেই সততই কিছু-না-কিছু পারবর্তন হচ্ছে। বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি থেকে এই পরিবর্তনের রূপটি ঠিক অনুধাবন করা সহজ নয়। ঘটনাগুলিকে ঠিক মত সাজিয়ে চিত্ররূপে প্রকাশ করতে পারলে পরিবর্তনের রূপটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। চিত্রলেখ হচ্ছে চিত্ররূপে প্রকাশিত ঘটনানির্ভর সুস্পষ্ট বিবৃতি। চিত্রলেখের চিত্রটি সাধারণতঃ রেখা (সরল অথবা বক্র) অথবা ক্ষেত্র (area) দ্বারা প্রকাশিত হয়।

বীজগণিত মূলতঃ বিশ্লেষণ (analysis) ও সামান্যীকরণ (generalisation) করে। এ দুটি কাজই চিত্রলেখ দ্বারা বিশেষভাবে সম্পন্ন হয়। অনেকগুলি ঘটনা থেকে সামান্যীকরণ করে একটি নিয়ম আবিষ্কার করতে চিত্রলেখ সাহায্য করে।

এই অতি বৈচিত্র্যময় জগৎ যে একটি ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত, নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের পরিবর্তনগুলি যে একটি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ, আপাত বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি যে অবিচ্ছিন্ন ও পরস্পর নির্ভরশীল—এই চিরন্তন সত্যটি গণিত নানাভাবে, নানা সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেছে। চিত্রলেখের মাধ্যমে গণিত ঐ সত্যকে রূপদান করেছে।

চিত্রলেখ কখন সুরু করা হবে এবং কিভাবে শেখানো হবে ?

ছাত্রদের অপেক্ষক (function) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হবার পর চিত্রলেখ আরম্ভ করা উচিত। এই কারণে আমাদের মনে হয় সপ্তম শ্রেণীর শেষ অথবা অষ্টম শ্রেণী থেকেই চিত্রলেখ শেখানো সুরু করা ভাল।

চিত্রলেখ দু দল তথ্যের চিত্ররূপ। ইহাদের মধ্যে একদল অপর দলের উপর নির্ভরশীল। এই চিত্ররূপ দেবার একটি প্রচলিত রীতি আছে। এই রীতি অনুযায়ী দুটি পরস্পর লম্ব সরলরেখা নেওয়া হয়। ইহাদের একটি অনুভূমিক (horizontal)

এবং অপরটি উল্লম্ব (vertical)। অনুভূমিক সরলরেখাটিকে X-অক্ষ এবং উল্লম্ব সরলরেখাকে Y-অক্ষ বলে। অক্ষ দুটির ছেদবিন্দুকে মূল বিন্দু বলা হয়। দু দল ঘটনাকেই সাংখ্যমানে প্রকাশ করা হয়। দু দলের অন্তর্গত ঘটনা-নির্দেশক দুটি অনুরূপ (corresponding) সংখ্যাকে X ও Y-এর ধারক সমতলের উপর অবস্থিত একটি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। অক্ষদ্বয় থেকে এই বিন্দুটির লম্ব দূরত্বদ্বয় সাংখ্যমানে প্রকাশিত ঘটনাদ্বয়কে নির্দেশ করে। সমতলটির উপর অঙ্কিত এইরূপ বিন্দুগুলি দু দলের অন্তর্গত দুটি করে অনুরূপ ঘটনার সম্বন্ধ নির্ণয় করে। এই বিন্দুগুলির সংযোজক রেখাই দু দল ঘটনার সম্বন্ধ-নির্ণায়ক চিত্ররূপ।

চিত্রলেখ শেখানোর স্থরুতেই সমতলে অবস্থিত যে কোন বিন্দুর অবস্থানকে দুটি পরস্পর লম্ব সরলরেখা থেকে লম্ব রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করার উপায়টি শেখাতে হয়। কিন্তু বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ে কেন যে পরস্পর লম্ব অক্ষ দুটি নেওয়া হয় তা প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে একটা রহস্য থেকে যায়। এর ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না। তাকে দেখানো হয় যে ঐভাবে একটি বিন্দুর সঠিক অবস্থান জানা যায়। কিন্তু কোন নিয়মকে প্রচলিত রীতি বলে ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। 'জানা থেকে অজানায়' এই নীতি বাক্য অনুসরণ করে তাদের শেখাতে হবে। একেবারে নতুন কিছু—সম্পূর্ণ অজানা বিষয়বস্তু তারা ধারণা করতে পারে না—যদি না তা তাদের জানা তথ্যের ভিতর দিয়ে পরিবেশন করা হয়।

ছাত্রেরা দিক-নির্দেশক সংখ্যায় শিখেছে যে একটি নির্দিষ্ট সরলরেখার উপর অবস্থিত বিন্দুসমূহ বিভিন্ন দিক-নির্দেশক বাস্তব সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে। সরলরেখা এক মাত্রাবিশিষ্ট। এখন বিন্দুটি নির্দিষ্ট সরলরেখার উপর অবস্থিত না হয়ে যদি একটি সমতলে থাকে, তা হলে তাকে একটি দিক-নির্দেশক সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সমতল দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। স্থতরাং বিন্দুটি চিহ্নিত করতে দুটি সংখ্যার দরকার—একটি দৈর্ঘ্যের দিকে ও অপরটি প্রস্থের দিকে। কাজেই দুটি পরস্পর লম্ব অক্ষের সাহায্যে সমতলস্থিত বিন্দুটি চিহ্নিত করার রীতিটি অবলম্বন করা হয়। অবশ্য সমতলে অবস্থিত বিন্দুকে চিহ্নিত করার জন্য এটিই একমাত্র উপায় নয়। অন্যান্য নানা রকম উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন মূল বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট বিন্দুর দূরত্ব-নির্ণায়ক রেখাটি একটি নির্দিষ্ট সরলরেখার সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহা। কিন্তু এখানেও দুটি সংখ্যার প্রয়োজন—একটি দূরত্ব-নির্দেশক এবং অপরটি কোণ-নির্দেশক। নির্দিষ্ট কোণে অবস্থিত দুটি পরস্পরচ্ছেদী সরলরেখা দ্বারা কি ভাবে সমতলে অবস্থিত একটি বিন্দুকে দুটি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করা যায় তাও ছাত্রদের দেখানো যেতে পারে। ছাত্রদের বাস্তব জীবনের উদাহরণের সাহায্যে আবার দেখাতে হবে যে, সমতলে অবস্থিত একটি বিন্দু চিহ্নিত করতে দুটি সংখ্যা দরকার হয়। যেমন, ক্লাসের কোন ছাত্রের অবস্থান নির্ণয় করতে হলে জানতে হবে সে কোন্ বেঞ্চে আছে এবং বেঞ্চের কত নম্বর ছাত্র সে। সহরের কোন্ বাড়ীর অবস্থান জানতে হলে চাই রাস্তার নাম ও বাড়ীর নম্বর। সকল ক্ষেত্রেই কিন্তু চাই দুটি সংখ্যা। চিত্রলেখ অঙ্কনে দুটি পরস্পর ছেদী লম্ব সরলরেখা নেওয়া

প্রচলিত রীতি মাত্র। এই রীতি অধিক সুবিধাজনকও বটে। চিত্রলেখ অঙ্কনের প্রথম ধাপ হিসাবে বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করা শিখতে ছাত্রদের বেশ কিছু সময় লাগবে এবং তাদের জন্য এই সময়টি ব্যয় করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। অঙ্কনের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হবার আগেই ছাত্রদের কাছে কয়েকটি চিত্রলেখ উপস্থাপন করে কি ভাবে ঐগুলি অঙ্কন করা হয়েছে এবং কি ভাবে উহাদের পাঠ করতে হয় তার আলোচনা করা দরকার। এতে ছত্রাদের চিত্রলেখ সম্বন্ধে ধারণাটি পরিষ্কার হবে এবং তারা চিত্রলেখের পাঠোদ্ধার করতে শিখবে ও তার প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে পারবে।

চিত্রলেখ যদিও বীজগণিতের অঙ্গ, কিন্তু ইহার সুরুতে পাটীগণিতের তথ্য ব্যবহার করাই সমীচীন। এই তথ্যগুলি যেন ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। যেমন শ্রেণীতে ছাত্রদের দৈনন্দিন উপস্থিতি, দিনের বিভিন্ন সময়ের তাপমাত্রা অথবা ছায়ার দৈর্ঘ্য, ছাত্রদের ওজন বা উচ্চতা প্রভৃতির সাহায্যে চিত্রলেখ অঙ্কন।

বিচ্ছিন্ন বা যতিবহুল শ্রেণীর (discrete series) তথ্য দিয়েই সুরু করতে হবে। যেমন, প্রতিদিনের শ্রেণীতে ছাত্র-উপস্থিতির সংখ্যাগুলির সাহায্যে চিত্রলেখ অঙ্কন সুরু করা যায়। এইরূপ প্রতিমাসের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির সাহায্যে চিত্রলেখ অঙ্কন করা চলে। এইরূপ চিত্রলেখ অঙ্কনে অনুভূমিক রেখার উপর সমান দূরত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিন্দু নিয়ে তাদের মধ্য দিয়ে উল্লম্ব-রেখা টেনে পরিমাণগুলি প্রকাশ করতে হয়। অনুভূমিক রেখার উপর কোন মাপ নেবার দরকার এখানে হয় না। কারণ অন্তর্বর্তী সময়ের মাপের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। যেমন 15 তারিখের ও 16 তারিখের ছাত্র-উপস্থিতি -সংখ্যা দেওয়া থাকলেও 15 ও 16 তারিখের অন্তর্বর্তী কোন সময়ের উপস্থিতির প্রশ্ন আসে না। এইভাবে সুরু করে ধীরে ধীরে পরিসংখ্যানমূলক (statistical) চিত্রলেখে আসতে হবে। এই জাতীয় চিত্রলেখ বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে অঙ্কন করতে হয় (পরিসংখ্যান দ্রষ্টব্য) এবং ইহার সাহায্যে প্রদত্ত তথ্যগুলি ছাড়া আরো বহুবিধ তথ্য জানা যায়। ক্রমশঃ জটিল চিত্রলেখ অঙ্কনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

চিত্রলেখ-অঙ্কনে গ্রাফ-কাগজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করতে হবে। গ্রাফ-কাগজের ব্যবহারে সময়সংক্ষেপ হয় এবং অঙ্কন নির্ভুল হয়। পরিসংখ্যানমূলক চিত্রলেখে অক্ষদ্বয়কে একক দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, সময়ের একক ঘণ্টা, মিনিট বা সেকেণ্ড; উচ্চতার একক মিটার, সেন্টিমিটার, এবং ওজনের একক কিলোগ্রাম, গ্রাম ইত্যাদি।

পরিসংখ্যানমূলক চিত্রলেখ শেখানো শেষ হলেই বীজগণিতের চিত্রলেখ ধরা উচিত। বীজগাণিতিক চিত্রলেখে অক্ষদ্বয়কে একক চিহ্নিত করার দরকার হয় না।

বীজগণিতে অনুভূমিক (horizontal) অক্ষকে X-অক্ষ এবং উল্লম্ব-রেখাকে Y-অক্ষ বলা হয়। অক্ষদ্বয়ের ছেদবিন্দুকে **মূল বিন্দু** বলা হয় এবং O বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। কোন বিন্দুর Y-অক্ষ থেকে X-অক্ষের সমান্তরাল যে দূরত্ব, তাকে ভুজ এবং X-অক্ষ থেকে Y-অক্ষের সমান্তরাল দূরত্বকে কোটি বলা হয়।

প্রথমে $x=3$, $y=4$ জাতীয় চিত্রলেখ অঙ্কন করে পরে $y=x$, $y=2x$,

$y=3x$ থেকে সুরু করে $y=ax$ জাতীয় চিত্রলেখ অঙ্কন করতে হবে। এই অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা বুঝতে পারবে যে x ও y-অক্ষে একটি মান (scale) ধরা দরকার। গ্রাফ-কাগজের আকার অনুযায়ী এই মান ঠিক হবে। তা ছাড়া মানটি এমন হওয়া চাই যাতে অন্তর্বর্তী কোন বিন্দুর অবস্থান সহজে বার করা যায়।

$y=ax$ জাতীয় সমীকরণের চিত্রলেখগুলি অঙ্কনের পর ঐগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করতে হবে। ছাত্রেরা দেখবে ঐগুলির প্রত্যেকটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখা অর্থাৎ যখন x ও y চলরাশি দুটি একই হারে পরিবর্তিত (বৃদ্ধি বা হ্রাস) হবে তখন উহার চিত্রলেখ একটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখা হবে। যেমন, একটি গাড়ী যদি ঘণ্টায় 20 কিলোমিটার বেগে চলে, তাহলে x ঘণ্টায় ইহা $20x$ কিলোমিটার যাবে। এই সম্পর্কটি $y=20x$ সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। চিত্রলেখটি হবে মূলবিন্দুগামী একটি সরলরেখা যার উপরে অবস্থিত যে কোন বিন্দুর সময় নির্দেশ করবে ভুজ ও কোটি গাড়ীর দূরত্ব নির্দেশ করবে।

আবার $y=ax+c$ জাতীয় সমীকরণের চিত্রলেখটিও একটি সরলরেখা, কিন্তু ইহা মূলবিন্দুগামী নয়। এই জাতীয় চিত্রলেখের সাহায্যে টেলিফোনের বিল বা মেসের খরচ প্রভৃতির হিসাব পাওয়া যায়। টেলিফোনের বিলে ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট টাকা এবং call-এর সংখ্যা অনুযায়ী টাকা দিতে হয়। মেসেও establishment বাবদ নির্দিষ্ট খরচ এবং বোর্ডারের সংখ্যার অনুপাতে আর একটি খরচ হয়।

পরবর্তী স্তরে বক্ররেখার চিত্রলেখ অঙ্কন করতে হবে।

যেমন,
$$y=x(x-5)$$
$$y=x(x+1)(x-3)$$
$$y=\frac{5}{x}$$
অথবা, $$y=\frac{x-4}{x-3}$$

$y=f(x)$ জাতীয় চিত্রলেখগুলি শেষ করে ধরতে হবে $f(x, y)=0$ জাতীয় চিত্রলেখ। যেমন,

$$x^2+y^2-25=0 \quad \text{(বৃত্ত)}$$
$$y^2-4ax=0 \quad \text{(অধিবৃত্ত)}$$
$$\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{25}-1=0 \quad \text{(উপবৃত্ত)}$$
$$\frac{x^2}{49}-\frac{y^2}{36}-1=0 \quad \text{(পরাবৃত্ত)}$$

চিত্রলেখের সাহায্যে সমস্যারও সমাধান করা যায়। অনেক সময় সমাধান করা সহজও হয়। যেমন, রাম ঘণ্টায় $2\frac{1}{2}$ মাইল বেগে যাত্রা করল। হরি 2 ঘণ্টা পরে

একই দিকে ঘণ্টায় 3 মাইল বেগে যাত্রা করল। উভয়ে কতক্ষণ পরে এবং কতদূরে মিলিত হবে ?

এখানে $y=\frac{5}{2}x$-এর চিত্রলেখ দ্বারা রামের সময়-দূরত্ব জানা যাবে এবং $y=3(x-2)$ চিত্রলেখ দ্বারা হরির সময়-দূরত্ব জানা যাবে। উভয় চিত্রলেখ যে বিন্দুতে মিলিত হবে তার ভুজ ও কোটি দ্বারা যথাক্রমে তাদের মিলনের সময় ও দূরত্ব জানা যাবে।

আবার $f(x)=0$ জাতীয় সমীকরণের সমাধানে চিত্রলেখের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক $f(x)=0$ সমীকরণটি $x^2-2x-143=0$

এখানে $y=x^2$ এবং $y=2x+143$

সমীকরণ দুটির চিত্রলেখদ্বয়ের ছেদবিন্দুগুলি নির্ণেয় সমাধান।

চিত্রলেখ কেন শেখানো হবে ?

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের গণিতের পাঠক্রমে চিত্রলেখ অন্তর্ভুক্ত। চিত্রলেখকে পাঠক্রমে এরূপ গুরুত্ব দেবার কারণগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল।

১। বাস্তব জগতে আজকাল চিত্রলেখের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। খবরের কাগজ, মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায়, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক চিত্র, পরিসংখ্যান, সরকারী কাজ প্রভৃতিতে চিত্রলেখের সাহায্যে তথ্য পরিবেশন আজকাল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বহু শিল্পে আজকাল সাধারণ কর্মীকেই চিত্রলেখ অঙ্কন ও তার ব্যাখ্যা করতে হয়। কাজেই চিত্রলেখের জ্ঞান থাকা সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে।

২। চিত্রলেখকে ready-reckoner হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইহার সাহায্যে একটি পরিমাপ থেকে অপর পরিমাপের সহজেই হিসাব পাওয়া যায়।

৩। প্রদর্শনীর কাজে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

৪। ইহা বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহকে একসূত্রে গ্রথিত করে এবং তাদের গতিপ্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে।

৫। পরিসংখ্যানমূলক কাজে ইহা একটি অপরিহার্য যন্ত্র।

৬। বিজ্ঞান ও অন্যান্য বহু বিষয় শিক্ষা করতে ও উপলব্ধি করতে ইহা যথেষ্ট সাহায্য করে।

৭। তথ্য উপস্থাপন, তুলনা করা ও সম্বন্ধ নির্ণয় করার ইহা একটি ফলপ্রদ উপায়। ইহা কল্পনা ও সৃজনী শক্তির বিকাশ সাধন করে। ইহার সাহায্যে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

৮। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং সামাজিক সমস্যার সমাধানে ইহা অপরিহার্য।

৯। চিত্রলেখ পরিচ্ছন্নতা, সাবধানতা ও নির্ভুলতার শিক্ষা দেয়।

১০। চিত্রলেখ ছাত্রকে আত্ম সমালোচনার সুযোগ দেয়।

১১। ঘটনাসমূহের চিত্ররূপ সৌন্দর্য ও রসের সৃষ্টি করে।

১২। চিত্রলেখ ছাত্রদের ধারণা উন্নত ও সুদৃঢ় করে।

১৩। চোখে দেখা জিনিস অনেক দিন মনে থাকে। চোখে দেখা জিনিসকে বিশ্লেষণ করা ও ব্যাখ্যা করা সহজ। চিত্রলেখ নানাবিধ ঘটনা ও সমস্যাকে চিত্রাকারে সুসম্বন্ধভাবে চোখের সামনে উপস্থিত করে।

১৪। ইহা সমস্যা-সমাধানে ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

১৫। অনেক পরিশ্রমসাধ্য গণনা ইহার দ্বারা সহজে হয়। কাজেই, অনেক সময় ও পরিশ্রম বাঁচে।

১৬। চিত্রলেখ মূর্ত ও বাস্তব। কাজেই বীজগণিত শুধুমাত্র সূত্র ও নিয়মগুলির যান্ত্রিক প্রয়োগের মধ্যেই সীমিত থাকে না।

১৭। বহু দুঃসাধ্য সমস্যার ইহা সমাধান করে।

১৮। বীজগণিতে অপেক্ষক একটি খুব প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু। ইহা অপেক্ষক সম্বন্ধে ছাত্রদের পরিষ্কার ধারণা দেয়।

১১। লগারিদ্‌ম (**Logarithm**) :—

গণিতের ইতিহাসে এমন কোন আবিষ্কারই নেই যা একক প্রচেষ্টার ফল। সমস্ত আবিষ্কারের পিছনেই দেখা যায় যে, অন্য কোথায় তার বীজ বপন করা হয়েছিল। এর একমাত্র ব্যতিক্রম লগারিদ্‌ম্‌-আবিষ্কার।

লগারিদ্‌ম্‌-আবিষ্কারের তিনশত বৎসর পূর্তিদিবসে Edinburg-এ আয়োজিত বিশ্বসভায় (July 1914) লর্ড Moulton বলেন 'The invention of logarithm came to the world as a bolt from the blue. No previous work had led up to it; nothing had foreshadowed it or heralded its arrival. It stands isolated, breaking in upon human thought abruptly without borrowing from the work of other intellects or following known lines of mathematical thought. It reminds one of those islands in the ocean which rise suddenly from great depths and which stand solitary, with deep water close around all their shores.

John Napier কুড়ি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে 147 পাতার একখানি বই 1614 সালে প্রকাশ করেন। ইহার 90 পাতা অধিকার করে আছে তাঁর দ্বারা প্রস্তুত লগারিদ্‌ম্‌-তালিকা। বইটির নাম Mirifici Logarithmoruni Canonis scriptio'—A description of an admirable table of logarithms. এ ছোট্ট বইটি গণনা-পদ্ধতিতে একটা যুগান্তর এনে মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সা করেছে। গণিতবিদ্‌, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্বিদ্‌, পূর্তবিদ্‌ প্রভৃতি যিনিই গণনা-সংক্র কাজের সঙ্গে যুক্ত—এই আবিষ্কার তাঁর যে কত সময় ও পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এই পরিশ্রম বাঁচানোর

কৌশলটির মৌলিক ধারণাটি একটি সরল উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে :—

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

2-কে যখন 0, 1, 2, 3,......10 শক্তিতে উন্নীত করা হয় উহার মানগুলি তালিকাটি থেকে পাওয়া যায়। তালিকাটির সাহায্যে আবার 16×32-এর গুণফলটিও পাওয়া যেতে পারে।

$$16 = 2^4$$
$$32 = 2^5$$
$$\therefore \quad 16 \times 32 = 2^4 \times 2^5 = 2^9$$

তালিকা থেকে $2^9 = 512$

$$\therefore \quad 16 \times 32 = 512$$

এখানে 16×32 গুণ-ক্রিয়াটি 4 ও 5 সূচক দুটির যোগক্রিয়ার দ্বারা সারা হয়েছে। পদ্ধতিটির সার্বজনীন প্রয়োগ করতে হলে, যে কোন সংখ্যার (পূর্ণ বা ভগ্নাংশ) সঙ্গে সমান করতে পারে এমন 2-এর শক্তিগুলির যে কোন দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ মান বার করতে হবে। উপরোক্ত শক্তিগুলির মানের নিধান (base) বলা হয় 2-কে।

নিধান হিসাবে 10 সংখ্যাটি খুব সুবিধাজনক। কারণ ইহাতে তুলনামূলকভাবে ছোট তালিকার সাহায্যে সকল সংখ্যার অনুরূপ শক্তির মান পাওয়া যায়। এই তালিকাটি প্রস্তুত করা আছে। ইহাকে **সাধারণ লগারিদম্ তালিকা** বলা হয়।

আধুনিক দৃষ্টিতে লগারিদম্‌কে একটি সূচক বলেই ধরা হয়।

সংজ্ঞা : লগারিদম্ এমন একটি সূচক নিধান যাতে উন্নীত হলে নির্দিষ্ট সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

লগারিদম্‌কে সংক্ষেপে log লেখা হয়।

উদাহরণ। 3 নিধান-বিশিষ্ট 81-র লগ নির্ণয়।

$$81 = 3^4$$

$\therefore$ 3 নিধানবিশিষ্ট 81-র লগ $= 4$.

গণিতের প্রতীকমূলক ভাষায় লেখা হয়

$$\log^3 81 = 4.$$

এখন $\sqrt{10} = 3{\cdot}16$ (আসন্ন)

বা, $10^{\frac{1}{2}} = 3{\cdot}16$ বা $10^{0\cdot5} = 3{\cdot}16$

$\therefore$ লগারিদমের সংজ্ঞা অনুসারে,

$$\log_{10} 3{\cdot}16 = 0{\cdot}5 \qquad \cdots(1)$$

সূচকের প্রথম সূত্র অনুসারে

$10^{\frac{3}{2}} = 10^1 \times 10^{\frac{1}{2}}$

$= 10 \times 3{\cdot}16 = 31{\cdot}6$

$\therefore \quad 10^{1\cdot5} = 31{\cdot}6$

$\therefore$ লগারিদমের সংজ্ঞা অনুসারে

$\log_{10} 31{\cdot}6 = 1{\cdot}5 \qquad \cdots(2)$

অনুরূপে $10^{\frac{5}{2}} = 10^2 \times 10^{\frac{1}{2}}$

$= 100 \times 3{\cdot}16 = 316$

$\therefore \quad 10^{2\cdot5} = 316$

$\therefore \quad \log_{10} 316 = 2{\cdot}5 \qquad \cdots(3)$

সাধারণ লগারিদমে নিধান 10 কে লেখা হয় না। যেমন, $\log_{10} 316 = 2{\cdot}5$ বদলে লেখা হয় $\log 316 = 2{\cdot}5$। নিধান 10 উহ্য থাকে। (1), (2), (3), ফলগুলিকে লেখা যেতে পারে।

$\log 3{\cdot}16 = {\cdot}5$

$\log 31{\cdot}6 = 1{\cdot}5$

$\log 316 = 2{\cdot}5$

অনুরূপে দেখানো যেতে পারে,

$\log 3160 = 3{\cdot}5$

$\log 31600 = 4{\cdot}5$ ইত্যাদি।

উল্লিখিত লগারিদমগুলির প্রাপ্ত মানগুলি থেকে 10-নিধান ব্যবহার করার সুবিধাটি বোঝা যায়। log 3·16 মানটি জানা থাকলে, 31·6, 316, 3160, 31600 প্রভৃতি সংখ্যার লগারিদমের মানগুলিও জানা যায়। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, মানগুলির দশমিক বিন্দুর আগেকার পূর্ণ সংখ্যাতেই মাত্র পরিবর্তন হচ্ছে। লগারিদমের মানের এই পূর্ণ সংখ্যামূলক অংশটিকে **পূর্ণক** (characteristic) বলে ; দশমিক ভগ্নাংশটিকে **অংশক** (Mantissa) বলে।

(1), (2), (3), থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি ক্ষেত্রেই লগারিদমের পূর্ণক, সংখ্যাটির পূর্ণ অংশের অঙ্ক সংখ্যা থেকে 1 কম। এই থেকেই একের চেয়ে বড় কোন সংখ্যার লগারিদমের পূর্ণক নির্ণয়ের নিয়মটি পাওয়া যায়।

নিয়ম ঃ লগারিদমের পূর্ণক সকল ক্ষেত্রেই সংখ্যাটির পূর্ণ অংশের অঙ্ক সংখ্যা থেকে এক কম।

যেমন log 8473·6-এ 8473·6 সংখ্যাটির পূর্ণ অংশে চারটি অঙ্ক আছে—8, 4, 7, 3। কাজেই

পূর্ণক $= 4 - 1 = 3$

অংশক (Mantissa) :

লগারিদ্‌মের অংশক সাধারণ লগারিদমের তালিকা থেকেই সকল সময় বার করতে হয়।

ভগ্নাংশের লগারিদম ঃ

সূচক সূত্র অনুসারে,

$$10^{-1}=\frac{1}{10}=0.1$$

$$\therefore \quad \log 0.1=-1.0000 \qquad \cdots \qquad \cdots(1)$$

আবার $10^{-2}=\frac{1}{10^2}=0.01$

$$\therefore \quad \log .01=-2.0000 \qquad \cdots \qquad \cdots(2)$$

অনুরূপে $10^{-3}=\frac{1}{10^3}=0.001$

$$\therefore \quad \log .001=-3 \qquad \cdots \qquad \cdots(3)$$

এই ফলগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, 0 থেকে 1 এর মধ্যে অবস্থিত যে কোন সংখ্যার লগারিদ্‌মের পূর্ণক ঋণাত্মক এবং প্রতি ক্ষেত্রেই পূর্ণকের সাংখ্যমান হবে সংখ্যাটির দশমিক বিন্দু ও প্রথম সার্থক (Significant) অঙ্কের মধ্যে অবস্থিত শূন্যগুলির সংখ্যার চেয়ে এক বেশী।

নিয়ম ঃ

একের চেয়ে ছোট কোন ধনাত্মক সংখ্যার লগারিদ্‌মের পূর্ণক ঋণাত্মক হবে এবং তার সাংখ্যমান দশমিক বিন্দু ও প্রথম সার্থক অঙ্কের মধ্যে অবস্থিত শূন্যগুলির সংখ্যার চেয়ে এক বেশী হবে।

লগারিদ্‌মের অংশককে সকল সময় ধনাত্মক ধরা হয়। পূর্ণক ঋণাত্মক হলে পূর্ণকের মাথায় বারচিহ্ন দিয়া প্রকাশ করা হয়। যেমন $-3=\bar{3}$।

উদাহরণ। Given $\log 2=.3010$, find the values of $\log 0.2$ and $\log 0.002$.

এখানে .2 ও .002 সংখ্যাদ্বয় 1-এর চেয়ে ছোট ধনাত্মক সংখ্যা।

0.2 সংখ্যায় দশমিক বিন্দুর পরেই সার্থক সংখ্যা আছে; একটিও শূন্য নেই। কাজেই

পূর্ণক $=-(0+1)=\bar{1}$.

0.002 সংখ্যায় দশমিক বিন্দু ও সার্থক সংখ্যার মধ্যে দুটি শূন্য আছে। সুতরাং

পূর্ণক $=-(2+1)=\bar{3}$.

$\therefore \log 0.2=\bar{1}.3010$ এবং $\log 0.002=\bar{3}.3010$.

উভয় ক্ষেত্রেই অংশকটি log 2 এর অংশকের সঙ্গে সমান হবে। কারণ আগেই আমরা দেখিয়েছি যে, সাধারণ লগারিদ্‌মে দশমিক বিন্দুর স্থান পরিবর্তন করলে লগারিদমের অংশকের কোন পরিবর্তন হয় না।

$\log_a 1$-এর মান ঃ

সূচক সূত্রে আমরা দেখেছি $a^0=1$.

$\therefore$ লগারিদমের সংজ্ঞানুযায়ী $\log_a 1=0$.

সুতরাং নিধান যা-ই হোক না, 1-এর লগারিদ্‌ম 0.

ঋণাত্মক সংখ্যাব লগারিদ্‌ম হয় না। কারণ n ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যা-ই হোক না, a^n-এর মান ঋণাত্মক হয় না।

আবার $a^1=a \quad \therefore \quad \log_a a=1$.

সুতরাং নিধানের লগারিদ্‌মের মান 1 হবে।

লগারিদ্‌মের সূত্রাবলী ঃ

সূচককেই আমরা লগারিদ্‌ম নামে অভিহিত করেছি। সূচকের তিনটি সূত্র থেকে সহজেই লগারিদ্‌মের নিম্নলিখিত সূত্র তিনটি পাওয়া যায়।

(1) $\log_a(x\times y)=\log_a x+\log_a y$.

(2) $\log_a(x\div y)=\log_a x-\log_a y$.

(3) $\log_a x^n=n\log_a x$.

নিধান পরিবর্তনের সূত্র ঃ

মনে করা যাক, a-নিধান লগারিদ্‌মগুলির মান জানা আছে। x-সংখ্যার b-নিধান লগারিদ্‌ম মান বার করতে ঃ

মনে করি, $\log_b x=l \quad \therefore \quad b^l=x$.

$\log_a x=m \quad \therefore \quad a^m=x$.

এবং $\log_a b=n \quad \therefore \quad a^n=b$.

$$\therefore \quad a^m=x=b^l=(a^n)^l=a^{nl}$$

$$\therefore \quad m=nl$$

বা $l=\dfrac{m}{n}$

$$\therefore \quad \log_b x=\frac{\log_a x}{\log_a b}.$$

১২। সমান্তর শ্রেণী (Arithmetical Progression ঃ সংক্ষেপে A.P.) ঃ

কতকগুলি সংখ্যা যখন এমন ক্রমে থাকে যে, প্রথম সংখ্যার পরবর্তী যে কোন সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে উৎপন্ন হয়, তখন তাকে শ্রেণী বলে।

শ্রেণীর সংখ্যাগুলিকে **পদ** বলে।

1, 2, 3, 4, 5⋯, একটি শ্রেণী। এখানে যে কোন পদ ঠিক পূর্ববর্তী পদ অপেক্ষা 1 বড়।

100, 70, 40, 10, −20,⋯একটি শ্রেণী যার প্রত্যেক পদ ঠিক পূর্ববর্তী পদ অপেক্ষা 30 কম।

4, 2, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, একটি শ্রেণী যার প্রত্যেক পদ ঠিক পূর্ববর্তী পদের অর্ধেক।

সমান্তর শ্রেণী এমন একটি শ্রেণী যার যে কোন পদ ঠিক পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে একটি ধ্রুবক সংখ্যা (constant quantity) যোগ বা বিয়োগ করে উৎপন্ন হয়। সমান্তর শ্রেণীতে দুটি ক্রমিক পদের মধ্যে যে ধ্রুবক অন্তরফল পাওয়া যায়, তাকে **সাধারণ অন্তর** বলে। উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী সমান্তর শ্রেণীর উদাহরণ।

সমান্তর শ্রেণীর সাধারণ পদ (General Term of an A. P.):

কোন সমান্তর শ্রেণীর প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) হলে শ্রেণীটিকে লেখা যায় $a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d\cdots$

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, যে কোন পদে dর সহগ পদসংখ্যা অপেক্ষা 1 কম। যেমন, পঞ্চম পদ $a+4d$।

শততম পদ বা $T_{100}=a+99d$।

n-তম পদ বা $T_n=a+(n-1)d\cdots\cdots$(i)

n-এর মান 1, 2, 3, 4⋯দিলে, শ্রেণীটির সমস্ত পদই পাওয়া যায়। n-তম পদ বা T_n-কে সমান্তর শ্রেণীর **সাধারণ পদ** বলে।

সমান্তর শ্রেণীতে n-সংখ্যক পদ থাকলে, T_n ই শেষ পদ l। সুতরাং—

$$l=a+(n-1)d\cdots\cdots(2)$$

উদাহরণ ১। 3, 7, 11, 15, 19⋯শ্রেণীটির 36-তম পদটি নির্ণয় করতে হবে।

এখানে $a=3$, $d=4$

(1) সূত্রে n-এর মান 36, aর মান 3, ও dর মান 4 ধরিলে

$$T_{36}=3+(36-1).4$$
$$=3+35.4$$
$$=143.$$

উদাহরণ ২। কোন শ্রেণীর সাধারণ অন্তর −5 এবং 26-তম পদ 84। শ্রেণীটির প্রথম পদ নির্ণয় করতে হবে।

এখানে $d=-5$। মনে করি প্রথম পদ a।

(1) সূত্রে n-এর মান 26, d-র মান −5 এবং T_n-এর মান 84 ধরিলে

$$84=a+(26-1).-5.$$
$$=a+25,-5.$$
$$=a-125$$

$\therefore\ a=84+125=209.$

$\therefore$ প্রথম পদ 209.

উদাহরণ ৩। একটি সমান্তর শ্রেণীর 11-তম ও 16-তম পদ যথাক্রমে 38 ও 73। প্রথম পদ, সাধারণ অন্তর এবং 21-তম পদ নির্ণয় করতে হবে।

মনে করি প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d।

(1) সূত্র থেকে $T_{16}=a+15d=73$ ... (i)

$T_{11}=a+10d=38$ ... (ii)

(ii) থেকে (i) বিয়োগ করিলে $5d=35$ $\therefore\ d=7$

(ii) সমীকরণ থেকে $a=38-10d=38-70=-32.$

আবার $T_{21}=a+20d$

$=-32+140=108$

$\therefore$ প্রথম পদ$=-32$, সাধারণ অন্তর$=7$ এবং 21-তম পদ$=108.$

সমান্তর মধ্যক (Arithmetic Mean) :—

কোন সমান্তর শ্রেণার তিনটি ক্রমিক পদ a, b, c হলে শ্রেণীটির সাধারণ অন্তর $b-a$ বা $c-b$.

$$\therefore\ b-a=c-b.$$

$$\text{বা}\ \ 2b=a+c.$$

$$\therefore\ b=\frac{a+c}{2}.$$

অর্থাৎ $\frac{a+c}{2}$ কে a ও c-র সমান্তর মধ্যক বলে।

কোন সমান্তর শ্রেণীর প্রথম পদ ও শেষ পদের মধ্যবর্তী পদ সকলকে ঐ দুটি পদ যে সংখ্যা দুটিকে নির্দেশ করে, তাদের সমান্তর মধ্যকসমূহ বলে।

$1, 1\frac{1}{2}, 2$ শ্রেণীতে $1\frac{1}{2}$ সংখ্যাটি 1 ও 2-এর সমান্তর মধ্যক।

$1, 1\frac{1}{3}, 1\frac{2}{3}, 2$ শ্রেণীতে $1\frac{1}{3}, 1\frac{2}{3}$ সংখ্যাদ্বয় 1 ও 2 এর দুটি সমান্তর মধ্যক।

সমান্তর মধ্যক নির্ণয় :—

উদাহরণ। 8 ও 14-র মধ্যবর্তী 4টি সমান্তর মধ্যক নির্ণয় করতে হবে।

মনে করি, x_1, x_2, x_3, x_4 ঐ চারটি সমান্তর মধ্যক।

তাহলে $8, x_1, x_2, x_3, x_4, 14$ একটি সমান্তর শ্রেণী।

শ্রেণীটির প্রথম পদ 8 এবং ষষ্ঠ পদ 14।

$\therefore\ a=8$ এবং $T_6=a+5d=14$

সমাধান করে, $d=1\frac{1}{5}$

সুতরাং সমান্তর মধ্যকগুলি $9\frac{1}{5}, 10\frac{2}{5}, 11\frac{3}{5}, 12\frac{4}{5}.$

সমান্তর শ্রেণীর যে কোন সংখ্যক পদের সমষ্টি (Sum of any number of terms of an A. P.) :—

মনে করি,

n= শ্রেণীটির পদ সংখ্যা

s= n-সংখ্যক পদের সমষ্টি

l= শেষ পদ

আমরা আগেই দেখেছি $l=a+(n-1)d.$

এখন $s=a+(a+d)+(a+2d)+\cdots(l-2d)+(l-d)+l\cdots$(i)

আবার শ্রেণীটি বিপরীতক্রমে লিখলে,

$s=l+(l-d)+(l-2d)+\cdots(a+2d)+(a+d)+a\cdots$(ii)

(1) ও (2) যোগ করলে

$2s=(a+l)+(a+l)+(a+l)\cdots(a+l)+(a+l)+(a+l)$

$\therefore \quad 2s=n(a+l)$

$\therefore \quad s=\frac{n}{2}(a+l) \qquad \cdots\cdots \quad (3)$

আবার $l=a+(n-1)d$

$\therefore \quad s=\frac{n}{2}\{a+a+(n-1)d\}$

বা $\quad s=\frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\} \cdots \quad (4)$

উদাহরণ ১। $7+10\frac{1}{2}+14+\cdots 84$ শ্রেণীটি সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে।

প্রথমে শ্রেণীটির পদ সংখ্যা n নির্ণয় করতে হবে।

এখানে $a=7,\ d=3\frac{1}{2},\ l=84.$

$\therefore \quad l=a+(n-1)d$ সূত্র থেকে পাই

$84=7+(n-1).\ 3\frac{1}{2}$ বা $3\frac{1}{2}(n-1)=84-7=77$

$\therefore \quad n-1=22, \quad \therefore \quad n=23$

এখানে শেষ পদ জানা আছে বলে সূত্রটি হবে

$s=\frac{n}{2}(a+l)$

$=\frac{23}{2}(7+84)$

$=\frac{23}{2}\cdot 91=1046\frac{1}{2}.$

যখন প্রথম পদ ও সাধারণ অন্তর দেওয়া থাকবে তখন (4) সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে।

১৩। গুণোত্তর শ্রেণী (Geometrical Progression : সংক্ষেপে G.P.) :—

গুণোত্তর শ্রেণী এমন একটি শ্রেণী যাতে যে কোন পদ তার ঠিক পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে একটি ধ্রুবক অনুপাত উৎপন্ন করে।

ধ্রুবক অনুপাতটিকে গুণোত্তর শ্রেণীর সাধারণ অনুপাত বলা হয়। এটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে।

সংজ্ঞানুসারে, গুণোত্তর শ্রেণীতে

$\frac{T_n}{T_{n-1}}$ = ধ্রুবক অনুপাত

$\therefore \quad T_n = T_{n-1} \times$ ধ্রুবক অনুপাত

সুতরাং গুণোত্তর শ্রেণীতে প্রত্যেক পদকে তার ঠিক পূর্ববর্তী পদকে সাধারণ অনুপাত দিয়ে গুন করে পাওয়া যায়।

সাধারণ পদ :

যদি প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) r হয়, তাহলে গুণোত্তর শ্রেণীটি হবে

$$a, ar, ar^2, ar^3, ar^4 \ldots\ldots\ldots$$

এখানে দেখা যায় r-এর সূচক পদ-সংখ্যা অপেক্ষা 1 কম। যেমন, পঞ্চম পদ ar^4।

সুতরাং n-তম পদ বা $T_n = ar^{n-1}$ ... ...(1)

n-তম পদ T_nকে G. P.র সাধারণ পদ বলে।

শ্রেণীতে n-সংখ্যক পদ থাকলে,

শেষ পদ $l = ar^{n-1}$. ... ...(2)

গুণোত্তর মধ্যক (Geometrical Mean) :—

কোণ গুণোত্তর শ্রেণীর তিনটি ক্রমিক পদ a, b, c হল সাধারণ অনুপাত

$$r = \frac{b}{a} = \frac{c}{b}$$

$$\therefore \quad b^2 = ac$$

$$\therefore \quad b = \pm \sqrt{ac}$$

b-কে a ও cর গুণোত্তর মধ্যক বলে। দুটি সংখ্যার গুণফলের বর্গমূলই তাদের গুণোত্তর মধ্যক।

উদাহরণ। 2 ও $\frac{1}{8}$-এর মধ্যে তিনটি গুণোত্তর মধ্যক নির্ণয় করতে হবে।

মনে করি গুণোত্তর মধ্যক তিনটি x_1, x_2, x_3। তা হলে,

$2, x_1, x_2, x_3, \frac{1}{8}$ G. P.-তে আছে।

শ্রেণীটির সাধারণ অনুপাত r ধরলে,

$ar^4 = \frac{1}{8}$ যেখানে $a = 2$.

সুতরাং $2r^4=\frac{1}{8}$ বা $r^4=\frac{1}{16}$

$$\therefore\ r=\sqrt[4]{\frac{1}{16}}=\pm\frac{1}{2}$$

$\therefore$ শ্রেণীটি $2, \pm 1, \frac{1}{2}, \pm\frac{1}{4}, \frac{1}{8}$.

গুণোত্তর শ্রেণীর যে কোন সংখ্যক পদের সমষ্টি (Sum of any number of terms of a G.P.) :—

মনে করি $n=$ পদ সংখ্যা যাদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে,

$S=n$ সংখ্যক পদের সমষ্টি

তা হলে $S=a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-2}+ar^{n-1}\cdots\cdots\cdots$(i)

(i) এর উভয় পক্ষকে r দিয়ে গুন করলে

$rS=ar+ar^2+ar^3+\cdots\cdots+ar^{n-1}+ar^n\cdots\cdots$(ii)

(i) থেকে (ii) বিয়োগ করলে

$$S-rS=a-ar^n$$

বা, $S(1-r)=a(1-r^n)$

$$\therefore\ S=\frac{a(1-r^n)}{1-r}\quad\cdots\quad\cdots\text{(iii)}$$

r-এর সাংখ্যমান 1 অপেক্ষা ছোট হলে (iii) সূত্রটি ব্যবহার করা হয়

যদি $|r|>1$ হয়, (ii) থেকে (i) বিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে সূত্রটি হবে

$$S=\frac{a(r^n-1)}{r-1}\quad\cdots\quad\cdots\text{(iv)}$$

অসীম গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি (Sum of an infinite number of terms of a G.P.) :—

অসীমের প্রতীক চিহ্ন ∞ এবং অসীম শ্রেণীর সমষ্টিকে লেখা হয় S_∞ ।

গুণোত্তর শ্রেণীতে $r=1$ হলে, প্রত্যেক পদই সমান হয়।

$$\therefore\ S_\infty=\infty$$

$r>1$, কিছু সংখ্যক পদের পর প্রত্যেক পদই 1-এর চেয়ে বড় হয়।

$$\therefore\ S_\infty=\infty\text{ ।}$$

r প্রকৃত ভগ্নাংশ হলে, a গুণোত্তর শ্রেণীর n-সংখ্যক পদের সমষ্টি (iii) সূত্রানুযায়ী

$$S=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

$$=\frac{a}{1-r}-\frac{ar^n}{1-r}\quad\cdots\quad\cdots(2)$$

r প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে, n-এর মান বৃদ্ধি পেলে r^n-এর মান হ্রাস পাবে ; ফলে $\frac{ar^n}{1-r}$ এর মানও হ্রাস পাবে।

$$\text{যেমন,}\quad r=\tfrac{1}{2},\ n=26 \text{ ধরলে, } r^n<\frac{1}{1,000,000}\text{।}$$

অতএব, $\frac{ar^n}{1-r}$ মান দ্রুত হ্রাস পাবে, n-এর মান যত বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে দেখা যাবে $|r|<1$ হলে, n-এর মান অসীম বড় হলে, বা গণিতের ভাষায় n 'অসীমগামী' (approaches infinity) হলে, $\frac{ar^n}{1-r}$ এর মান শূন্যগামী হবে।

'n অসীমগামী হলে $\frac{ar^n}{1-r}$ শূন্যগামী হবে'—এই বিবৃতিকে গণিতের ভাষায় লেখা হয়,

$$n\to\infty,\ \frac{ar^n}{1-r}\to 0.$$

অসীম গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি S_∞-র মান পাওয়া যাবে,

(i) সূত্রে $\frac{ar^n}{1-r}$-র মান শূন্য ধরলে,

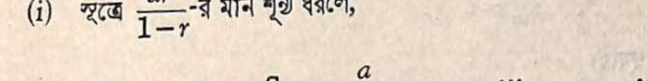
$$\therefore\quad S_\infty=\frac{a}{1-r}\qquad\cdots\qquad\cdots(\text{v})$$

অন্তিম সমষ্টি (Limiting sum) S_∞ কে অসীম পর্যন্ত সমষ্টি (Sum to infinity) বলা হয়।

নিম্নলিখিত গুণোত্তর শ্রেণীর চিত্রলেখের সাহায্যে অন্তিম সমষ্টি সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

$$1+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{8}+\tfrac{1}{16}+\cdots\cdots$$

$$\text{বা,}\quad 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+\cdots\cdots$$



2 একক দৈর্ঘ্যের একটি রেখা AB.

AB-র মধ্যবিন্দু a, aB-র মধ্যবিন্দু b, bB-র মধ্যবিন্দু c, cB-র মধ্যবিন্দু d, dB-র মধ্যবিন্দু e।

তাহলে $Aa=1,\ ab=\frac{1}{2},\ bc=\frac{1}{2^2},\quad cd=\frac{1}{2^3},\quad de=\frac{1}{2^5}$

মনে করি n-সংখ্যক পদের সমষ্টি S_n

তা হলে $Aa=S_1=1$

$$Ab=S_2=1+\frac{1}{2}$$

$$Ac=S_3=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}$$

$$Ad=S_4=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}$$

$$Ae=S_5=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}$$

শ্রেণীটির বৃহৎ সংখ্যক পদ এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পাওয়া যাবে। যখন পদ সংখ্যা n খুব বড়, মনে করি, AB-র উপর প্রান্ত বিন্দুটি Z. তাহলে Z, B-এর খুব নিকটবর্তী হবে। n অসীমগামী হলে Z, B-এর অসীম নিকটে থাকবে এবং শ্রেণীটির সমষ্টি AZ, AB-গামী হবে।

অর্থাৎ $n\to\infty\ S_n\to AB$.

সুতরাং অন্তিম সমষ্টি AB বা 2 একক হবে।

$$\therefore\ S_\infty=2$$

(v) সূত্র অনুযায়ী

$$S_\infty=\frac{a}{1-r}$$

এখানে $a=1,\ r=\frac{1}{2}$

$$\therefore\quad S_\infty=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2.$$

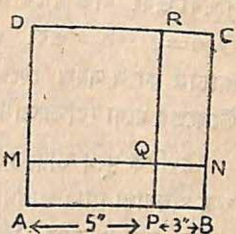
১৪। বীজগণিতে জ্যামিতির ব্যবহার (Use of Geometry in Algebra):

আধুনিক শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয় এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অনুবন্ধের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার ও পাকা হয়। বীজগণিতকে পাটীগণিতের বিস্তৃতিরূপে এবং পাটীগণিতের সঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। বীজগণিতের ধারণা পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন মত জ্যামিতিরও সাহায্য নেওয়া ও ব্যবহার করা উচিত। জ্যামিতির প্রয়োগে বীজগণিতের অমূর্ত ও প্রতীকসর্বস্ব ধারণা ও সূত্রগুলি মূর্তরূপে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। যেমন,

$$(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$$

সূত্রটিকে প্রমাণ করার জন্য জ্যামিতির সাহায্যে প্রথমে একটি মূর্ত ভিত্তি রচনা করা যেতে পারে। এতে সূত্রটির অমূর্ত প্রতীকমূলক ধারণাটি উপলব্ধি করতে ছাত্রদের সাহায্য হবে। ছাত্রদের বলা যেতে পারে একটি সরলরেখার উপর পাশাপাশি 5″ দৈর্ঘ্যের AP অংশ এবং 2″ দৈর্ঘ্যের PB অংশ নিয়ে প্রদত্ত চিত্রের মত ABCD বর্গটি অঙ্কন করতে।

অতপর P বিন্দু দিয়ে BC-র সমান্তরাল PR সরলরেখাটি তারা আঁকবে। PBNQ বর্গ এঁকে NQ কে M পর্যন্ত বর্ধিত করবে।



এখন তারা অনায়াসেই দেখতে পাবে বর্গ MQRD=5^2 বর্গ ইঞ্চি, বর্গ PBNQ=2^2 বর্গ ইঞ্চি, ABCD=$(5+3)^2$ বর্গ ইঞ্চি এবং আয়তক্ষেত্র APQM= আয়তক্ষেত্র QNCR=5×2 বর্গ ইঞ্চি।

সুতরাং তারা সহজেই দেখতে পাবে

$$(5+2)^2=5^2+2^2+2\times(5\times 2)$$

এই জাতীয় কয়েকটি পরীক্ষামূলক উদাহরণের সাহায্যে তারা সামান্যীকরণের মাধ্যমে $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$ সূত্রটি আবিষ্কার করবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যামিতি শিক্ষণ

[Teaching of Geometry]

জ্যামিতি ঃ—ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জ্যামিতি শব্দের অর্থ জমি জরিপ। জ্যা অর্থে পৃথিবী এবং মিতি মানে পরিমাপ। ইংরাজী Geometry শব্দটিও বাংলা শব্দটির সমার্থক। Geo=earth এবং metria=measurement। জমি জরিপের প্রয়োজনেই প্রাচীন কালে সমস্ত দেশেই জ্যামিতির সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন দেশে জমি জরিপের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্নতা ছিল।

বৈদিক যুগে ভারতে যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হত। কারণ সুল্ব ও বৈখানস সূত্র অনুযায়ী নানা জ্যামিতিক আকারযুক্ত যজ্ঞবেদী তখন নির্মাণ করা হত। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, 'প্রথমে সুলক্ষণযুক্ত পবিত্র ভূমি যজ্ঞক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত হত'। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেছেন—"আমরা এক সময়ে বার্ষ্মের জন্য যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করছিলাম, পথিমধ্যে সাত্যযজ্ঞের সহিত দেখা হলে তিনি বলেছিলেন, সকল স্থানেই যজ্ঞ হয়, তোমরা যেখানে মন্ত্রলাভ করবে সেখানেই বার্ষ্মকে নিয়ে যজ্ঞ করতে পার।" নাইল নদীর প্লাবনের পর প্রতি বৎসরই মিশর দেশে জমি জরিপ করতে ও তীরের বাঁধ দিতে নানারূপ জ্যামিতিক পরিমাপের প্রয়োজন হত এবং তার ভিতর দিয়েই সেদেশে জ্যামিতির উন্নতি ঘটে। গ্রীকেরা মিশরীয়দের কাছ থেকে জমি-জরিপের পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন এবং ঐ বিদ্যার নামকরণ করেন Geometry। রোমানরাও অন্যদেশ থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে জমি-জরিপ ও নগর নির্মাণের কাজে ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে জ্যামিতি তার মূলগত অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে না। ভারতে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, মুনীশ্বর, গণক প্রভৃতি জ্যামিতির যথেষ্ট অগ্রগতি করেন। ভাস্কর তাঁর লীলাবতী গ্রন্থে দেওয়াল, পুষ্করিণী কূপ, ছায়া প্রভৃতিতে জ্যামিতির ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। জ্যামিতিতে গ্রীকেরাই সবচেয়ে উন্নত ছিলেন। তাঁদেরই আধুনিক জ্যামিতির জনক বলা হয়। সংজ্ঞা (definitions), স্বতঃসিদ্ধ (axioms) ও স্বীকার্যকে (postulates) অবলম্বন করে গ্রীকগণ তাঁদের আবিষ্কৃত বিশুদ্ধ যুক্তি পদ্ধতির সাহায্যে জ্যামিতিকে তার বর্তমান উন্নতরূপে উত্তীর্ণ করেন। তাঁরাই জ্যামিতিকে বিমূর্ত বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। জ্যামিতিতে তাঁদের এই অবদানের কিন্তু তখনকার দিনে বিশেষ বাস্তব মূল্য ছিল না। যতদূর জানা যায় Thales-ই প্রমাণসিদ্ধ জ্যামিতির সূচনা করেন। কথিত আছে যে, তিনি জ্যামিতির ছটি উপপাদ্য প্রমাণ করেন। Thales-এর শিষ্য Pythagoras-ই জ্যামিতিকে প্রমাণসিদ্ধ নিখুঁত বিজ্ঞানে পরিণত করেন। তারপর Euclid বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। Euclid-এর জ্যামিতি বইটির নাম Elements। ইহা মোট তের খণ্ডে সম্পূর্ণ। এ প্রায় ৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দে

লিখিত। পরবর্তী ২০০০ বৎসর Euclid-এর জ্যামিতিই একাধিপত্য করেছে। দেড়েক বছর আগে Non-Euclidian Geometry-র উদ্ভব হয়েছে।

জ্যামিতি শিক্ষণের লক্ষ্য ঃ—

জ্যামিতি শিক্ষণের ফলে গণিত শিক্ষণের সবগুলি লক্ষ্যই আয়ত্ত হয়। সুতরাং গণিত শিক্ষণের লক্ষ্যগুলিই জ্যামিতি শিক্ষণের লক্ষ্য। জ্যামিতি শিক্ষণের অন্য কোন বিশেষ লক্ষ্য নেই।

জ্যামিতি শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ—

জ্যামিতি শিক্ষণে, প্রধানত দুটি পদ্ধতি দেখা যায়। একটি Euclid-এর পদ্ধতি এবং অপরটি আধুনিক পদ্ধতি। প্রথমটি যুক্তিসম্মত পদ্ধতি (Logical Method) ও দ্বিতীয়টি মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Psychological Method)।

১। **Euclid-এর পদ্ধতি বা যুক্তিসম্মত পদ্ধতি (Logical Method) ঃ—**

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর ভূমিকা ছিল গৌণ। শিশুকে মনে করা হত বয়স্ক লোকের ক্ষুদ্র সংস্করণ। শিক্ষার কাজ ছিল তাকে পূর্ণ বয়স্করূপে গড়ে তোলা। শিশুর মন কি ভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে শিক্ষকের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তাকে জানারও কোন আগ্রহ তাঁর থাকত না। ইউক্লিডের জ্যামিতি বয়স্ক লোকের বোধশক্তি বা বুদ্ধির তৃপ্তি সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং শিশুর বুদ্ধি উন্মেষের পক্ষে ইহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করে পাঠক্রমে ইহার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। ইহা শিশুর মনের উপযুক্ত কিনা তা মোটেই বিবেচনা করা হয়নি।

ইউক্লিডের পদ্ধতিতে প্রথমে কতকগুলি জ্যামিতিক আকারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যেমন, বিন্দু, সরলরেখা, কোণ, সমতল প্রভৃতি। এগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি শাশ্বত সম্বন্ধ স্বীকার করে নেওয়া হয় যেগুলি প্রমাণসাধ্য নয়। এগুলিকে বলা হয় স্বীকার্য (postulates)। তারপর ঐ মুষ্টিমেয় সংজ্ঞা ও স্বীকার্যকে অবলম্বন করে অবরোহী পদ্ধতিতে (Deductive Method) ধাপে ধাপে জ্যামিতিক আকার সম্বন্ধীয় অসংখ্য সূত্র গঠন করা হয়।

এই পদ্ধতিতে জ্যামিতির বাস্তব মূল্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখানে শৃঙ্খলামূলক মূল্যের জন্যই জ্যামিতি শিক্ষার ব্যবস্থা। ইহার সাহায্যে অনেকগুলি মানসিক ক্ষমতার বিকাশলাভ ঘটে—এইরূপ মনে করা হয়। যেমন, বিমূর্ত চিন্তা করা, নৈর্ব্যক্তিক ধারণা করা, যুক্তি করা, বিচার করা প্রভৃতি। তাছাড়া ইহা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, মনোযোগ, আত্মবিশ্বাস, নিয়মানুগ সুসম্বদ্ধ উপায়ে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করে বলেও মনে করা হয়।

ইউক্লিডের পদ্ধতিতে জ্যামিতি শিক্ষা দিলে পূর্বোক্ত গুণাবলীর বিকশিত হওয়া সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। পদ্ধতিটি শিশুমন সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে ইহা শিশু বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। শিশুরা 'মূর্ত থেকে অমূর্ত' নীতিতে শিক্ষা লাভ করে।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিশুরা প্রথমেই অমূর্ত ধারণার সম্মুখীন হয়। ফলে তারা বিষয়বস্তু বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে পারে না। তারা তখন পরীক্ষায় পাশ করার জন্য মুখস্থ করবার চেষ্টা করে। যাদের মুখস্থ করার শক্তি বেশী তারাই জ্যামিতি-বোদ্ধা বলে স্বীকৃত হয়। বিমূর্ত চিন্তা করার চেয়ে মুখস্থ করাই তাদের কাছে সহজ মনে হয় এবং মুখস্থ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। যাদের মুখস্থ করার ক্ষমতা দুর্বল তারা জ্যামিতির শিক্ষায় বিশেষ অগ্রসর হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইউক্লিডের পদ্ধতিতে বিমূর্ত ও নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতাকে উন্নত না করে ঠিক তার বিপরীত কাজ করে। এই ক্ষমতাগুলির উন্নতির পথ রুদ্ধ করে। অন্যান্য ক্ষমতাগুলির বিকাশ করা সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। শিশু মূর্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বিমূর্ত ধারণা করতে পারে। মূর্ত অভিজ্ঞতার অভাবে জ্যামিতির বিমূর্ত সংজ্ঞাগুলি শিশু উপলব্ধি করতে পারে না। সে হয়ত সংজ্ঞাগুলির ভাষাগত অর্থ বুঝতে পারে, কিন্তু তাদের যুক্তিগত সুসঙ্গতি (coherence) বা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা (rigidity) কিছুমাত্র অনুধাবন করতে পারে না। ফলে বিমূর্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তার কোন ধারণা হয় না। সংজ্ঞাগুলি দুর্বোধ্য হওয়ার ফলে বিষয়বস্তুকেও তার দুর্বোধ্য মনে হয়। বিষয়টি শিক্ষালাভের তার কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না।

২। আধুনিক পদ্ধতি বা মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Psychological Method) :—

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষা কার্যকরী করতে হলে তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে—শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও তার প্রয়োজন-বোধ।

শিশু কাজ করতে ভালবাসে। হাতে-কলমে কাজের ভিতর দিয়েই সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে শেখে। এইভাবে সে যা শেখে তা তার কাছে স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে উঠে। এইভাবে শিক্ষা দিলে শিশুর জ্যামিতি শিক্ষায় আগ্রহ হবে এবং বিষয়টি তার কাছে নীরস শুষ্ক বলে মনে হবে না।

জ্যামিতি শিক্ষণের প্রাথমিক অবস্থায় দৈনন্দিন জীবনে জ্যামিতির ব্যবহার ও উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা দিতে হবে। তাদের চার পাশে জগতে প্রতিদিন কত লোক কত ভাবে জ্যামিতির ব্যবহারে কত সহজে তাদের প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করেছে এগুলি উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে হবে। রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, কর্মকার, ছুতোর, যারা নক্সার কাজ করে, যারা জমি জরিপ করে, প্রভৃতি সকলেই জ্যামিতির ব্যবহারে উপকৃত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রশিল্পী, পূর্তবিদ্, শিল্পী প্রভৃতি যাঁরা সভ্যতা ও কৃষ্টির বিকাশে সাহায্য করছেন, তাঁদের কাছে জ্যামিতি অপরিহার্য। জ্যামিতির সঙ্গে ছাত্রেরা যতই পরিচিত হবে ততই তারা দেখবে—বিষয়টি জগতের রহস্য বুঝতে তাদের কত সাহায্য করে। Plato বলেছেন

—God eternally geometrises. ভগবান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জ্যামিতিকেই প্রকাশ করেছেন। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের দিকে দেখলে এ সত্য পরিস্ফুট হয়। আনারসের গায়ে বহুভুজ আকৃতি বিদ্যমান। ফার্ণ পাতা, তেঁতুল পাতা, পাইন গাছের ডাল ইত্যাদি সমান্তরালভাবে সাজানো। নানা আকারের গাছের পাতা ও ফল দেখা যায়। পেঁপে, নারিকেল প্রভৃতি গাছ চোঙ (Cylinder) আকারের। প্রাণী জগতে মাকড়সার জাল বহুভুজ, মৌচাকের খোপগুলি ষড়ভুজ। আবার আকাশের সূর্য ও চন্দ্র বৃত্তাকার। সূর্যের আপাত কক্ষপথ অর্ধবৃত্তাকার। এই সমস্ত প্রাকৃতিক আকার অবলোকন করেই মানুষ জ্যামিতিক আকার সম্বন্ধে ধারণা করেছে। আবার প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনেও মানুষ জ্যামিতিকে ব্যবহার করতে শিখেছে। রেখা, ত্রিভুজ, বহুভুজ, বৃত্ত প্রভৃতি নিয়ে জ্যামিতি যে সমস্ত সম্বন্ধ নির্ণয় করে সেগুলিই ঐ সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটনে মানুষকে সাহায্য করে। চন্দ্র-সূর্যের দূরত্ব কত? সেগুলি কত বড়? কোন নদী কতটা বিস্তৃত? কোন পাহাড়ের উচ্চতাই বা কি? —এ সমস্ত সমস্যার সমাধানে জ্যামিতি অপরিহার্য।

আধুনিক জ্যামিতি শিক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তিমূল শিশু মনোবিজ্ঞান। ইউক্লিডের পদ্ধতিতে কতকগুলি সংজ্ঞা ও স্বীকার্যকে ভিত্তি করে অবরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করে জ্যামিতি শেখানো হয়। এ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয় বলে ইহা প্রাথমিক অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছে। বিন্দু ও রেখার সংজ্ঞা বিমূর্ত। সংজ্ঞানুযায়ী বিন্দু ও রেখার ধারণা শিশুরা করতে পারে না। কারণ ঐ ধারণা বিমূর্ত। মূর্ত বস্তুর মাধ্যমেই তারা ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণা করে। অবরোহী পদ্ধতিও শিশুদের উপযুক্ত নয়। তাছাড়া Gestalt মতবাদ অনুসারে সমগ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করেই অংশ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত। বিন্দু থেকে আরম্ভ করে রেখা, সমতল, ঘনবস্তু—এইভাবে সমগ্র রূপের শিক্ষণ-পদ্ধতি বিপরীত ক্রিয়া। শিশু ঘনবস্তুর সঙ্গেই পরিচিত। সমগ্রকে সে জানে। ঘনবস্তু তার কাছে মূর্ত ও বাস্তব। বিন্দু, রেখা, তল প্রভৃতি বিমূর্ত ধারণার অন্তর্ভূত। এগুলি তার ধারণার বাইরে—অজানা। অজানা থেকে জানায় নিয়ে আসা শিক্ষণের মূলনীতি পরিপন্থী। এইজন্য আধুনিক পদ্ধতিতে ঘনবস্তুকে অবলম্বন করে তার অংশ হিসাবে তল, তলের অংশ হিসাবে রেখা এবং রেখার অংশ হিসাবে বিন্দু সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়। এতে ঐ ধারণাগুলি মূর্তরূপ পায় এবং সমগ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়ে সেগুলি শিশুর উপলব্ধির মধ্যে আসে।

আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই জ্যামিতির পাঠক্রম স্থির করা হয়। শিক্ষার্থীর মানসিক বয়স, আগ্রহ, মেজাজ প্রভৃতি বুঝে পাঠ দান করলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিসম্মত ভাবে বিষয়টির অগ্রগতি ঘটে না। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত। কারণ ইহা শিশুকে অনুসরণ করে চলে।

১২।১৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের যুক্তি-শক্তি বিশেষ উন্নত হয় না। তারা হাতে-কলমে কাজ করে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই শিক্ষা লাভ করতে পারে। হাতে-কলমে কাজ করতে তারা ভালোবাসে ও আনন্দ পায়। এইভাবে শিক্ষা দিলে

তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। হাতে কলমে কাজ করে শিশুদের বিষয়টি সম্বন্ধে একটা ধারণা হলে তারা যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে। এতে তাদের জ্ঞান পাকা হবে। একই সমস্যার একবার হাতে কলমে সমাধান করা এবং আর একবার যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ শিখলে তাদের সময়ের অপব্যয় হবে মনে করলে ভুল হবে। উপযুক্ত মানসিক বয়স না হলে তারা যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ বুঝবে না। কিন্তু তার আগে কাজের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করে রাখলে উপযুক্ত সময়ে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আয়ত্ত করতে তাদের সময় কম লাগবে অথচ সামগ্রিক ভাবে ধারণাগুলি পরিষ্কার হবে।

জ্যামিতি শিক্ষণে আধুনিক কালে দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়—(১) স্বজ্ঞা (*Intuition*) ও (২) আরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (*Induction*)। যা দেখেই সত্য বলে বোঝা যায় তাকে স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান বলে। যে উপপাদ্য স্বজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায় তাকে প্রমাণ করতে যাওয়া সময় ও পরিশ্রমের অপব্যয় মাত্র। অনেক সময় এই প্রমাণ দুর্বোধ্য ও দুরূহও হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'ত্রিভুজের যে কোন দুই বাহু তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড়' উপপাদ্যটি স্বজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যায়—প্রমাণ করতে হলে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। অনুরূপে একটি সরলরেখার সহিত আর একটি সরলরেখা মিলিত হলে, সন্নিহিত কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান' উপপাদ্য ও তার বিপরীত উপপাদ্যের প্রমাণ ছাত্রদের কাছে বিভ্রান্তিকর। কিন্তু স্বজ্ঞা দ্বারা এগুলি বুঝতে তাদের অসুবিধা হয় না। আধুনিক গণিতজ্ঞগণ যে সমস্ত উপপাদ্য স্বজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায় এবং যেগুলির প্রমাণের কঠিনতা (*rigour*) ছাত্রদের বোধগম্য নয়, সেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, স্বজ্ঞাই গণিতের জনক।

যেখানে স্বজ্ঞা দ্বারা কাজ হয় না, সেখানে আরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করে কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই প্রারম্ভিক স্তরে প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্য একটি বা দুটি দৃষ্টান্ত থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়। অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। জ্যামিতি সৃষ্টিতেও এই পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। যুক্তিসিদ্ধ জ্যামিতির সৃষ্টি হয় শেষ স্তরে। জ্যামিতির শিক্ষণে এই ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণ করাই শ্রেয়। বর্তমানে তিনটি স্তরে জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম স্তরকে বলা হয় পরীক্ষামূলক স্তর। ইহা ঐতিহাসিক ধারার *intutive* ও *inductive* স্তর। যুক্তিসিদ্ধ স্তরকে দুটি স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়—অবরোহী স্তর ও নিয়মানুগ স্তর। এই স্তর তিনটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

১ম স্তর। পরীক্ষামূলক স্তর (**Experimental stage**) :—

এই স্তরে প্রথমত শিশুর জ্যামিতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় এবং হাতে কলমে কাজের দ্বারা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার ও তাদের মধ্যে সম্বন্ধগুলি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়।

জ্যামিতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে শিশুদের উপযোগী করে জ্যামিতির ইতিহাস আলোচনা করা দরকার। এতে তারা বুঝবে যে, মানুষের প্রয়োজন মেটাতেই জ্যামিতির সৃষ্টি। বাস্তব জীবনে সভ্যতার বিকাশে ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে জ্যামিতি কত প্রয়োজন তাও শিশুদের উপযোগী করে উদাহরণের মাধ্যমে তাদের জানাতে হবে। এতে তারা জ্যামিতি শিখতে আগ্রহী হবে।

প্রথমে তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে ঘনবস্তুর সাহায্যে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। ঘনবস্তুর সাহায্যে এবং সমগ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করেই জ্যামিতিক মৌলিক ধারণাগুলি—যেমন, তল, রেখা, বিন্দু সম্বন্ধে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে। কোন রূপ সংজ্ঞা দেবার দরকার নেই। মূর্ত বস্তুগুলির সাহায্যে বিমূর্ত ধারণাগুলি যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে সেই চেষ্টাই করতে হবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে জ্যামিতি শেখানোর কোন দরকার নেই। বিন্দু, রেখা, তল, কোণ, লম্ব ইত্যাদি ও জ্যামিতিক সাধারণ আকারগুলি সম্বন্ধে তাদের ধারণা ঠিক মত হলে তাদের স্বজ্ঞার সাহায্যেই যতদূর সম্ভব জ্যামিতিক সিদ্ধান্তগুলি তারা করবে। যেখানে স্বজ্ঞা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়, সেখানে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা আরোহী পদ্ধতিতে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, পদ্ধতিটি হবে প্রত্যক্ষ (*Direct*)।

জ্যামিতির সহজ ও সরল যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করতে শিখবে। অঙ্কন ও পরিমাপের দ্বারা জ্যামিতিক সত্যগুলি তারা বুঝবে। দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও হাতে-কলমে কাজের ভিতর দিয়েই এই স্তরে জ্যামিতি শিখবে।

এই স্তরে বিন্দু, রেখা, কোণ, লম্ব, সমান্তরাল রেখা, ত্রিভুজ, বাহু, চতুর্ভুজ, বহুভুজ, বৃত্ত, ক্ষেত্রফল, অনুপাত, সম-দ্বিখণ্ডন, সর্বসমতা, সাদৃশ্য ও প্রতিসাম্য সম্বন্ধে ধারণাগুলি দেওয়া হবে।

স্কেলের সাহায্যে রেখার দৈর্ঘ্য এবং *protractor*-এর সাহায্যে কোণের পরিমাণ মাপতে শিশুরা শিখবে।

স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ মত চিত্র এঁকে সর্বসম ও সদৃশ আকারের ধারণা তারা করবে। এছাড়া কোণগুলি ও বাহুগুলির মধ্যে নানাবিধ সম্বন্ধ পরিমাপের সাহায্যে আরোহী পদ্ধতিতে আবিষ্কার করবে। যেমন, ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দু সমকোণ; সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের বিপরীত কোণগুলি সমান; বিপ্রতীপ কোণগুলি সমান; পীথাগোরাস উপপাদ্যের বাহুগুলির মধ্যে সম্বন্ধ ইত্যাদি। ত্রিভুজ, রেখা ও কোণ সমদ্বিখণ্ডন, সমান্তরাল রেখা, নির্দিষ্ট কোণের সমান কোণ প্রভৃতি অঙ্কন করা শিখবে। তা ছাড়া স্বজ্ঞা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ ও নানাবিধ জ্যামিতিক সম্বন্ধ তারা আবিষ্কার করবে।

২য় স্তর। অবরোহী স্তর (Deductive Stage) :—

এই স্তরে ছাত্রেরা উপপাদ্য ও নতুন সমস্যার (*problem or rider*) প্রমাণ

axiom বা স্বীকার্যকে স্বাধীন, অন্য নিরপেক্ষ বা স্বয়ম্ভূ মনে করা হয় আধুনিক গণিতে। যদি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমাদের ভৌত জগতের স্থান (*space*) সম্বন্ধে যাবতীয় ধারণা ভুল—যা আপেক্ষিক তত্ত্ব (*Theory of Relativity*) প্রমাণ করেছে—তা হলে আমাদের পদার্থবিদ্যার বইগুলি নতুন করে লিখতে হবে—কিন্তু জ্যামিতির কোন পরিবর্তন হবে না।

axiom সম্বন্ধে আধুনিক মতটি মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের মানসিক উপযোগী নয়। তারা সব কিছু জানতে চায়. বিবৃতিগুলি যাচাই করে নিতে চায়। সুতরাং তাদের জন্য *axiom* একটি নিশ্চিত সত্য হওয়া চাই যাতে বিবৃতিটি তার চার পাশের জগতের পক্ষে সত্য হয়। তাদের কাছে *axiom* হবে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবিশিষ্ট কিছু। সুতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য *axiom* কে তার পুরাতন অর্থেই ব্যবহার করতে হবে। তাদের জন্য *axiom*-এর অর্থ স্বতঃসিদ্ধ। ইহা এমন একটি সত্য যার প্রমাণের দরকার হয় না।

জ্যামিতি-শিক্ষণে সমস্যার স্থান ঃ—

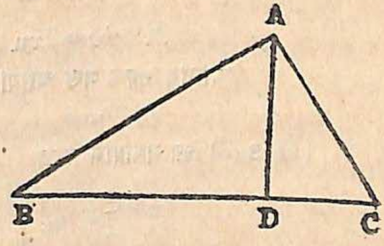
জ্যামিতি শিক্ষণে অনেক শিক্ষক শুধু বইয়ের উপপাদ্য শেখানোর উপর জোর দেন। আবার অনেকে মনে করেন সমস্যা সমাধান করাই বেশী প্রয়োজন। প্রাচীনপন্থীরা বইয়ের উপপাদ্যগুলির প্রমাণ শেখানোই যথেষ্ট বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন ছাত্রদের পক্ষে জ্যামিতির সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব কাজ এবং অপ্রয়োজনীয়ও বটে। অনেকের মতে প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে স্বাধীনভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। অন্ততঃ বেশ কিছু উপপাদ্য শেষ না করলে সমস্যা ধরা উচিত নয়। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, যে সমস্যাকে অবহেলা করা উচিত নয়। সমস্যা সমাধানের কাজ পরবর্তী স্তরে করা উচিত তাঁরা এমন মতও পোষণ করেন না। তাঁরা বলেন যে, প্রতিটি উপপাদ্য শেখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধানও ছাত্রদের করতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যা শেখানোর কোন মূল্যই নেই যদি না সেই বিদ্যাকে প্রয়োগ করা হয়। আদর্শ পাঠ তখনই কার্যকরী হবে যখন শিক্ষার্থী তাকে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। যাবতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। গণিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী। সৃষ্টিধর্মী স্বাধীন চিন্তা করতে শেখানোই গণিতের লক্ষ্য। তা ছাড়া শুধু বইয়ের উপাপাদ্যগুলির প্রমাণের উপর জোর দিলে ছাত্রদের কাছে জ্যামিতি অর্থহীন, কৃত্রিম ও যান্ত্রিক বলে মনে হবে। শিক্ষার্থীরা কাজের মধ্য দিয়েই শেখে। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়। সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়ে তারা লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করার সুযোগ পায়, স্বাধীন চিন্তা করতে শেখে, যুক্তি করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে লব্ধ জ্ঞানের অনুশীলন করে। জ্ঞান মূর্ত হয় প্রয়োগের ভিতর দিয়েই। উপপাদ্য শেখানোর পরই তৎসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করা দরকার। এতে উপপাদ্যের বিষয়টি তারা আরো ভালো করে উপলব্ধি করবে এবং বিষয়টিও তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক হবে। তা ছাড়া একটি উপপাদ্য শেখার পরেই সমস্যা সমাধান করলে সমাধানের সূত্রটি সহজেই ছাত্রেরা আবিষ্কার করবে। এতে তাদের স্মৃতির উপর বেশী চাপ পড়বে না। এতে তারা অনেকগুলি সমস্যার সমাধান কম সময়ের মধ্যে করতে পারবে এবং নিজের সাফল্যে

উৎসাহিত হয়ে জ্যামিতির শিক্ষায় অধিকতর আগ্রহী হবে। সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা আত্মনির্ভর হয়। তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি বিকশিত হয় এবং আবিষ্কারের মনোভাবও গড়ে ওঠে।

জ্যামিতিতে বীজগণিতের ব্যবহার :—

জ্যামিতি ও বীজগণিতের মধ্যে সম্বন্ধ শুধু চিহ্নিত পরিমাণের (*signed quantities*) মৌলিক ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনেক জ্যামিতিক সমস্যার সমাধানের জন্য বীজগণিতের সূত্র ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণ। *AD is perpendicular from the vertex A upon the base BC of a triangle ABC. If $AD^2 = BD.DC$, prove that the triangle is right-angled.*



এখানে প্রদত্ত সর্ত অনুসারে,

$AB^2 = AD^2 + BD^2 \cdots\cdots\cdots(1)$

$AC^2 = AD^2 + CD^2 \cdots\cdots\cdots(2)$

(1) ও (2) যোগ করে

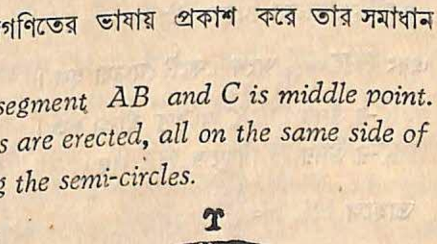
$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= BD^2 + CD^2 + 2AD^2 \\ &= BD^2 + CD^2 + 2BD\,CD \\ &= (BD + CD)^2 \end{aligned}$$

[বীজগাণিতিক সূত্র $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$]

$= BC^2$.

অনেক জ্যামিতিক সমস্যাকে বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করে তার সমাধান করলেই সমাধান করা সম্ভব হয়।

উদাহরণ ১। *Given a line segment AB and C is middle point. On AB, AC and CB semi-circles are erected, all on the same side of AB. To construct a circle touching the semi-circles.*



মনে করি নির্ণেয় বৃত্তটির ব্যাসার্ধ $= x$

এবং ছোট অর্ধবৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্ধ $= r$

তাহলে বড় অর্ধবৃত্তটির ব্যাসার্ধ $= 2r$.

এখন POC ত্রিভুজে

$OP^2 = PC^2 + OC^2$

$\quad = (CT - PT)^2 + OC^2$

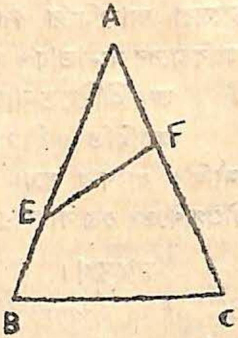
বা $(r+x)^2 = (2r-x)^2 + r^2$

বা $2rx = 4r^2 - 4rx$

বা $x = \frac{2}{3}r$.

অর্থাৎ $TP = \frac{1}{3}CT$.

উদাহরণ ২। *Draw a straight line which divides both the perimeter and the area of a given circle into equal parts.*



মনে করি ত্রিভুজটি ABC এবং ইহার A, B, C কোণ তিনটির বিপরীত বাহুগুলি যথাক্রমে a, b, c। ইহার পরিসীমা $2p$ and EF উদ্দিষ্ট সরলরেখা।

মনে করি $AE = x$ এবং $AF = y$.

এখন $\dfrac{\triangle ABC}{\triangle AEF} = \dfrac{bc \sin A}{xy \sin A} = \dfrac{bc}{xy}$

কিন্তু সমস্যা অনুযায়ী $\triangle ABC = 2\triangle AEF$

$\therefore\ bc = 2xy.$ ………(1)

আবার প্রদত্ত সর্ত অনুযায়ী

$x + y = p$ ……(2)

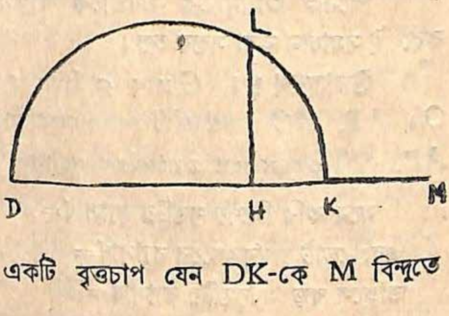
(1) ও (2) এর সমাধান করে

$$x = \frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - \frac{bc}{2}}$$

$$y = \frac{p}{2} \mp \sqrt{\frac{p^2}{4} - \frac{bc}{2}}$$

এখানে b, c ও p-এর মান প্রদত্ত। জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে x ও y এর দৈর্ঘ নিম্নলিখিতভাবে পাওয়া যাবে :—

একটি সরলরেখা থেকে $DH = b$



এবং $HK = \frac{c}{2}$ অংশ কেটে নেওয়া হল।

DK-র উপর DLK অর্ধবৃত্ত আঁকা হল।

DK-র উপর H বিন্দুতে HL লম্ব।

তাহলে $HL^2 = \dfrac{bc}{2}$

L-কে কেন্দ্র করে $\frac{P}{2}$ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ যেন DK-কে M বিন্দুতে ছেদ করল।

তাহলে $HM = \sqrt{LM^2 - HL^2}$

$$= \sqrt{\frac{p^2}{4} - \frac{bc}{2}}.$$

এখন $\frac{p}{2}$-র সঙ্গে HM যোগ ও বিয়োগ করে x ও y-র দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। এটি একটি জটিল সমস্যার উদাহরণ।

বীজগণিত ও পাটীগণিতের অনেক জটিল সমস্যাও জ্যামিতি শিক্ষণে প্রবর্তন করা যেতে পারে।

উদাহরণ ৩। *The area of a certain rectangle exceeds that of a square by 60 sq. in. The side of the square is $\frac{5}{4}$ of the shorter side of the rectangle and the longer side of the rectangle exceeds the shorter by 16 in. Find the dimensions of the rectangle.*

মনে করি আয়তক্ষেত্রের ছোট বাহুটির দৈর্ঘ্য x in.

তাহলে প্রশ্নানুসারে

$$x(x+16)=(\tfrac{5}{4}x)^2+60$$
$$=\tfrac{25}{16}x^2+60$$
বা, $16x^2+16^2x=25x^2+16.60$

বা, $9x^2-16^2x+16.60=0$

বা, $9x^2-216x-40x+16.60=0$

বা, $(x-24)(9x-40)=0$

$\therefore x=24$ বা $4\frac{4}{9}$ in.

উদ্দিষ্ট আয়তক্ষেত্রের দ্বিতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য 40 বা $20\frac{4}{9}$ in.

ঘন বা ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি (Solid or Three Dimensional Geometry) :—

ঘনবস্তুর মাঝেই শিশু বাস করে। যা কিছু সে দেখে, নাড়া-চাড়া করে তার সবই ঘন—ত্রিমাত্রিক। ঘন বস্তু তার ধারণার মধ্যে। কিন্তু ত্রিমাত্রার ধারণা করা তার পক্ষে কঠিন হয়। এই ধারণা বিমূর্ত। সুতরাং সামতলিক জ্যামিতির ধারণা বেশ পাকা না হলে ঘন জ্যামিতির সূত্রপাত করা উচিত হবে না। দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির বিস্তৃতি হিসাবেই ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি শেখানো মনোবিজ্ঞানসম্মত। অনেকের মতে সামতলিক ও ঘন জ্যামিতির শিক্ষা এক সঙ্গেই হওয়া উচিত। এতে ছাত্রদের উপলব্ধি ভালো হয় এবং সামতলিক ও ঘন জ্যামিতিকে দুটি বিচ্ছিন্ন বিষয় বলে তাদের মনে হয় না। তবে এ পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর বলে মনে হয় না। যে বয়সে শিশুরা সামতলিক জ্যামিতির শিক্ষা সুরু করে, সে বয়সে ঘন জ্যামিতির ধারণা তারা গ্রহণ করতে পারে না।

প্রকৃতির বাহ্যরূপ শুধু মাত্র দ্বিমাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ত্রিমাত্রিক আকার দিয়েই আমাদের চার পাশের জগৎ বেশী পরিব্যাপ্ত। সুতরাং প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে হলে ঘন জ্যামিতির জ্ঞান থাকা খুবই দরকার। গণিতের পাঠক্রমে ঘন জ্যামিতির অন্তর্ভুক্তি সেজন্য অপরিহার্য। তবে ছাত্রদের মানসিক বয়স উপযুক্ত না হলে ঘন জ্যামিতি শেখানো তাদের স্মৃতির উপর অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টিতে পরিণত হয়। বিন্দু, রেখা, সমতলের ধারণা বিমূর্ত হলেও মূর্ত বস্তুর সাহায্যে ঐ ধারণাগুলি দিতে খুব অসুবিধা হয় না। এই ধারণাগুলি চিত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ রূপায়িত করা চলে। কাজেই সামতলিক জ্যামিতি ছাত্রেরা

হৃদয়ঙ্গম করতে সহজে পারে। কিন্তু ঘন জ্যামিতির চিত্র তাদের কাছে বেশ বিভ্রান্তিকর। তাদের কল্পনাশক্তি যথেষ্ট উন্নত না হলে ঘন জ্যামিতি তাদের উপলব্ধির মধ্যে আসে না। এইজন্য ঘন জ্যামিতিকে ঐচ্ছিক গণিতের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ইহা দশম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযুক্ত বিষয় বলে বিবেচিত। বিজ্ঞান বিভাগে, বিশেষ করে পদার্থ বিদ্যার শিক্ষায় ঘন জ্যামিতির বিশিষ্ট অবদান আছে।

পদার্থ বিদ্যায় যদিও দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির যথেষ্ট প্রয়োগ আছে—ইহা মূলতঃ ত্রিমাত্রিক আকার নিয়েই আলোচনা করে। Mechanics, Hydrostatics, Optics প্রভৃতি বিষয়ের সূত্রগুলি ও তাদের কার্যকারিতা ঠিক মত বুঝতে হলে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির স্বাভাবিক বিস্তৃতি ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি। ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির শিক্ষার ফলে ছাত্রদের দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির ধারণাগুলির ভিত্তি দৃঢ়মূল হয়। সামতলিক জ্যামিতিতে তারা যেসব সূত্র শিখেছে, সেগুলি যে আপেক্ষিক—সকল সময় ধ্রুব হয় না তা তারা ঘন জ্যামিতির শিক্ষার মধ্য দিয়েই বুঝতে পারে। জ্যামিতিক মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামতলিক জ্যামিতির অনেক সূত্রই আর সত্য থাকে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্যামিতিক সম্বন্ধগুলি বিস্তৃত হয়। সেইজন্য ঘন জ্যামিতি শেখাবার সময় সামতলিক জ্যামিতির সঙ্গে তুলনা করে, তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেই শেখানো উচিত। এতে সামতলিক জ্যামিতির ধারণা পরিষ্কার হবে এবং ঘন জ্যামিতিও বুঝতে সহজ হবে। শিক্ষা 'জানা থেকে অজানা' নীতি অনুসরণ করে অগ্রসর হবে। ইহা মনোবিজ্ঞানের নির্দেশ। এটা করা যেতে পারে দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির সূত্রগুলিকে ত্রিমাত্রিক অবস্থানে পরীক্ষা করলে। যেমন, দ্বিমাত্রিক অবস্থানে দুটি সরলরেখা হয় পরস্পর ছেদ করে, না হয় তারা পরস্পর সমান্তরাল হয়। ছাত্রদের পরীক্ষা করে দেখতে বলা যেতে পারে ত্রিমাত্রিক অবস্থানে এর নিয়মটি খাটে কি না। এইভাবে Skew রেখা সম্বন্ধে তাদের ধারণা দেওয়া যেতে পারে। আবার ছাত্রেরা জানে যে সামতলিক জ্যামিতিতে একটি সরলরেখার উপর একটি বিন্দুতে একটিমাত্র লম্ব টানা যায়। এই সত্যটি ঘন জ্যামিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে ছাত্রেরা জ্যামিতি সম্বন্ধে নতুন ভাবে চিন্তা করবে এবং ঘন জ্যামিতি শিখতে আগ্রহী হবে। ঘন জ্যামিতিকে সামতলিক জ্যামিতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে শেখাতে হবে—দেখাতে হবে কোথায় উভয়ের মধ্যে মিল আর কোথায় বা তাদের মধ্যে অমিল। যেখানে ঘন জ্যামিতি সামতলিক জ্যামিতির সর্তগুলি পালন করবে সেখানে সামতলিক জ্যামিতির যাবতীয় সূত্র, স্বতঃসিদ্ধ প্রভৃতি ঘন জ্যামিতির ক্ষেত্রেও সত্য হবে। উদাহরণ, মডেল প্রভৃতির সাহায্যে ছাত্রদের কাছে এগুলি বোঝাতে হবে। যেমন, দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে একটি মাত্র সরলরেখা অঙ্কন করা যায়—এই স্বীকার্যটি উভয় জ্যামিতির ক্ষেত্রে সত্য। তিনটি নির্দিষ্ট বিন্দু একটি মাত্র সমতলে অবস্থিত। সুতরাং ঐ সমতলে অবস্থিত যাবতীয় জ্যামিতিক সম্বন্ধ উভয় জ্যামিতির ক্ষেত্রে সত্য হবে। আবার সামতলিক জ্যামিতির বহু সূত্রের সামান্য পরিবর্তন করলে ঘন জ্যামিতির অনুরূপ সূত্রগুলি পাওয়া যায়। যেমন, সামতলিক জ্যামিতিতে একটি সরল রেখার উপর একটি বিন্দুতে একটিমাত্র লম্ব টানা যায়। ঘন জ্যামিতিতে

একটি সমতলের উপর একটি বিন্দুতে একটি মাত্র লম্ব টানা যায়। ঘন জ্যামিতি শিক্ষণে মডেল ও বাস্তব উদাহরণের সাহায্য শিক্ষক নেবেন।

Non-Euclidean Geometry :—

বিজ্ঞানের ইতিহাসে *Non-Euclidean* জ্যামিতির অগ্রগতি একটি যুগান্তকারী ও বেগবান আন্দোলন। মিশরীয় যুগ থেকে যে সমস্ত জ্যামিতিক জ্ঞান স্বজ্ঞা দ্বারা এবং আরোহী পদ্ধতিতে অর্জিত হয়ে সঞ্চিত হয়েছিল, গ্রীকেরা তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। এই জ্ঞানকে গ্রীকেরা প্রমাণসিদ্ধ করেছিলেন এবং ইউক্লিড সেগুলিকে একত্রিত করে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করেন। প্রায় দু হাজার বৎসর ধরে ইউক্লিডের জ্যামিতি একক রাজত্ব করেছে। মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে ভৌত স্থানের পরিমাপের ক্ষেত্রে ইউক্লিড শাশ্বত সত্যের পথ দেখিয়েছেন—তিনি এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলেছেন। ইউক্লিডের জ্যামিতিকে এই সময়ে বেদবাক্য বলে মনে করা হয়েছে। ফলে প্রচুর গোঁড়ামিও দেখা দিয়েছিল। কোন গণিতজ্ঞ ইউক্লিডের জ্যামিতির শাশ্বতত্বে সন্দেহ প্রকাশ করলে তাঁকে শাস্তি পেতে হত—তাঁকে নিজের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য করানো হত এবং ইউক্লিডের সমর্থনে আরো প্রমাণ উপস্থিত করে রেহাই পেতে হত। এই অপমানের ভয়ে *Gauss*-এর মত প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ ইউক্লিডের জ্যামিতি সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা প্রকাশ করতে সাহস করেন নি।

স্থান ইউক্লিডকে অনুসরণ করে এবং ইউক্লিড স্থানকে অনুসরণ করে—দু হাজার বছর ধরে এই যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছিলেন দু হাজার বছরেরও পরে একজন জার্মান, একজন রাশিয়ান ও একজন হাঙ্গেরীয়ান।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন সবেমাত্র *Projective* ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আত্মপ্রকাশ করেছে সেই সময় আর একটি নতুন ও অনেক বেশী বিপ্লবাত্মক জ্যামিতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে যুগের সমস্ত প্রখ্যাত গণিতজ্ঞগণ এই জ্যামিতিকে বর্জন করেন।

ইউক্লিডের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম স্বীকার্যে (*postulate*) বলা হয়েছে যে, একটি প্রদত্ত সরলরেখার বহিঃস্থ কোন বিন্দু দিয়ে ঐ সরলরেখাটির সমান্তরাল একটিমাত্র রেখা টানা যেতে পারে। ইউক্লিডে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্যের মধ্যে সম্বন্ধটি ঠিক পরিষ্কার নয়। অনেকে ধারণা করেন যে, ইউক্লিড যখন তাঁর বিবৃতিটিকে স্বতঃসিদ্ধ না বলে স্বীকার্য বলেছেন তখন এটি স্বাধীন হওয়া সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই সন্দেহ ছিল। কাজেই দু হাজার বছর ধরে বহু গণিতজ্ঞ এই স্বীকার্যটিকে অন্যান্য স্বতঃসিদ্ধগুলির সাহায্যে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। *Ptolemy* এই স্বীকার্যটিকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। মধ্যযুগে *Nasir-al-din* এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে *Lamberd, Legendre* স্বীকার্যটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়নি ; যদিও এর ফলে তাঁরা কতকগুলি চিত্তাকর্ষক ফল আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। *Gauss*-ই প্রথম ধারণা করেন যে, স্বীকার্যটি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ থেকে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে অন্য কোন স্বীকার্য অবলম্বন করে যুক্তিসিদ্ধভাবে সম্পূর্ণ নতুন জ্যামিতির জন্ম দেওয়া যায়। *Gauss* (জার্মান) এই ধারণাটি মুদ্রিত করে

প্রকাশ করতে সাহস করেন নি। *Nicholaus, Ivanovitch Lobatchewsky* (রাশিয়ান) এবং *Johann Bolyai* (হাঙ্গেরিয়ান)—এই দুজন গণিতজ্ঞই দু হাজার বছরের অনড় ধারণাটির প্রথম প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং *Non-Euclidean* জ্যামিতির সৃষ্টি করেন।

নতুন ধারণাটি প্রথম প্রকাশ করেন *Lobatchewsky*. এ ঘটনা ঘটে *1826* খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে তিনি *Kazan*-এ অধ্যাপনা করতেন এবং সেখানে *Non-Euclidean* জ্যামিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। *1829-30* খৃষ্টাব্দে *Non-Euclidean* জ্যামিতি সম্বন্ধে তাঁর বইটি প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে *Bolyai*ও *1832* খৃষ্টাব্দে বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেন। তিনি ইউক্লিডের পঞ্চম স্বীকার্যকে একটি স্বাধীন স্বীকার্য বলে গ্রহণ করেন এবং আবিষ্কার করেন যে ঐ স্বীকার্যের বদলে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে সমতলস্থ একটি বিন্দু দিয়ে অসীম সংখ্যক রেখা টানা যায় যারা ঐ সমতলস্থ একটি নির্দিষ্ট রেখাকে ছেদ করবে না—তা হলে আর একটি জ্যামিতি গঠন করা সম্ভব।

Riemann 1850 খৃষ্টাব্দে আর এক জাতীয় *Non-Euclidean* জ্যামিতি প্রকাশ করেন।

আমরা এখন তিন রকমের স্বীকার্যকে ভিত্তি করে তিনটি জ্যামিতি পাচ্ছি—১। *Euclid*-এর। ২। *Lobatchewsky*-র এবং ৩। *Riemann*-এর।

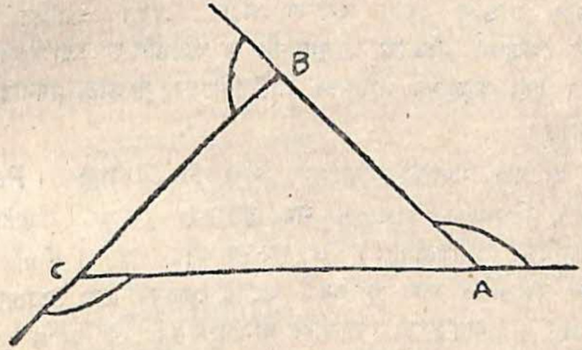
প্রথমটিকে বলা হয় *Euclidean* জ্যামিতি এবং অপর দুইটিকে বলা হয় *Non-Euclidean* জ্যামিতি। *Non-Euclidean* জ্যামিতিগুলিতে *Euclid*-এর পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছে। ইউক্লিডের পঞ্চম স্বীকার্য ছাড়া অন্যান্য স্বীকার্যগুলিকে মেনে নেওয়া হয়েছে। *Euclid*-এর জ্যামিতি যেমন যুক্তিসিদ্ধ, ঐগুলিও সেরূপ যুক্তিসিদ্ধ এবং তাদের যুক্তির মধ্যে কোন ফাঁক নেই। কিন্তু তিনটি জ্যামিতির উপপাদ্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

যে তিনটি জ্যামিতির বিষয় আমরা উল্লেখ করলাম, সেগুলি সম্ভাব্য অসীম সংখ্যক জ্যামিতির মধ্যে মাত্র তিনটি। যে কোন স্বীকার্যকে অবলম্বন করে একটি জ্যামিতি গঠন করা যেতে পারে, যদি-না তাতে পরস্পর বিরোধী ফল পাওয়া যায়। এইরূপ জ্যামিতি ইউক্লিডের জ্যামিতির মত সত্য হবে। যে কোন তলকে অবলম্বন করেই জ্যামিতি গঠন করা যেতে পারে—তলের বক্রতা যেমনই হোক না কেন। জ্যামিতির কাজ যুক্তিসম্মত কাঠামো নির্মাণ করা যার সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর বিরোধী হবে না। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় *Non-Euclidean* জ্যামিতির প্রয়োগের ফলে বহু পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে এবং বহু নতুন তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে।

আমরা আমাদের জানা দ্বিমাত্রিক তলের উপর *Non-Euclidean* জ্যামিতির প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বর্তমানে পদার্থবিদ্‌গণ আরো বেশী মাত্রাবিশিষ্ট স্থানে *Non-Euclidean* জ্যামিতির প্রয়োগ করেছেন। যে *space* এ আমরা সত্য

সত্য বাস করি তার সম্বন্ধে পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, *space* সরল নয়—বক্র। সুতরাং আমাদের সীমিত পার্থিব পরিবেশে ইউক্লিডের জ্যামিতি কার্যকরী হলেও দূর নীহারিকার অবস্থান নির্ণয় ইউক্লিডের জ্যামিতি কোন কাজে লাগে না। ইউক্লিড সময়কে মোটেই বিবেচনার মধ্যে আনেন নি। তাঁর কাছে সরলরেখা, কোণ বা কোন চিত্র অপরিবর্তনীয়, স্থির। কিন্তু আমাদের মাপতে হচ্ছে একটি পরিবর্তনশীল জগৎ। সুতরাং অপরিবর্তনীয় স্থির চিত্রের সাহায্যে যদি পরিবর্তনশীল জগৎ মাপা হয় তবে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা।

পরশেষে আমরা বলতে পারি যে ইউক্লিডের পঞ্চম স্বীকার্যটিকে বাদ দিয়ে যদি আমরা ইউক্লিডের জ্যামিতির উপপাদ্যগুলি বা উহার অধিকাংশ প্রমাণ করতে পারি তা হলে এই জ্যামিতিকেও আমরা *Non-Euclidean* জ্যামিতি আখ্যা দিতে পারি। বস্তুতঃ ইউক্লিডের জ্যামিতিতে পঞ্চম স্বীকার্যটি অপরিহার্য নয়। ইউক্লিড পঞ্চম স্বীকার্যের সাহায্য নিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন যে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি



2 সমকোণের সমান। এই উপপাদ্যটিকে পঞ্চম স্বীকার্যকে বাদ দিয়ে গতির উপর ভিত্তি করে প্রমাণ করা সহজ এবং ছাত্রদের কাছে এই প্রমাণ মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে। ছাত্রেরা জানে ত্রিভুজের যে কোন শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থিত অন্তঃকোণ ও বহিঃকোণের সমষ্টি 2 সমকোণ। কাজেই তিনটি শীর্ষ বিন্দুতে তিনটি অন্তঃকোণ ও তিনটি বহিঃকোণের সমষ্টি 6 সমকোণ হবে। এখন যদি দেখানো যায় যে, বহিঃকোণগুলির সমষ্টি 4 সমকোণ, তা হলেই উপপাদ্যটি প্রমাণিত হয়। মনে করা যাক একটি লোক A বিন্দুতে দাঁড়িয়ে D বিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে। সে পরে বাম দিকে ঘুরতে থাকল যতক্ষণ না তার দৃষ্টি B বিন্দুর দিকে পড়ে। এবার AB সরলরেখা বরাবর চলে B বিন্দুতে উপস্থিত হল। আবার বামাবর্তে ঘুরে C বিন্দুর দিকে তাকাল এবং BC রেখা বরাবর অগ্রসর হয়ে C বিন্দুতে পৌঁছল। পুনরায় বামাবর্তে ঘুরে A বিন্দুর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করল এবং CA বরাবর চলে A বিন্দুতে উপস্থিত হল অর্থাৎ এখন সে পুনরায় পূর্ব অবস্থানে ফিরে এসে D বিন্দুর দিকে তাকাবে। এই গতির ফলে লোকটি

কত কোণ ঘুরলো? সে একটি পূর্ণপাক ঘুরেছে অর্থাৎ 4 সমকোণ উৎপন্ন করেছে। কিন্তু গতির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সে মোট তিনটি বহিঃকোণ ঘুরেছে। অতএব তিনটি বহিঃকোণের সমষ্টি 4 সমকোণ।

পরিমিতি (Mensuration) :—

পরিমিতিকে সাধারণতঃ পাটীগণিতে জ্যামিতির প্রয়োগ হিসাবেই ধরা হয়ে থাকে। বাস্তবে পরিমিতি পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির সমন্বয়। গণিতের তিনটি শাখার সার্থক অনুবন্ধ হয়েছে পরিমিতির মধ্যে।

পরিমিতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে বলেই ইহাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বস্তুত ইহাকে ব্যবহারিক গণিত (*Practical Mathematics*) বলা যায়। ইহার ব্যবহারিক মূল্য (*utiliturian value*) খুব বেশী। তা ছাড়া ইহা কতকগুলি বিশেষ রকমের জ্যামিতিক আকারের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটায় এবং সেগুলি সম্বন্ধে তাদের ধারণা দেয়। এগুলির আয়তনের ঘনফল ও তাদের ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত বীজগাণিতিক সূত্রগুলি ছাত্রেরা অবগত হয় এবং সূত্রগুলির সাহায্যে ইহা ছাত্রদের নানারূপ পাটীগণিতের সমস্যার গণনায় দ্রুতি ও নির্ভুলতার শিক্ষা দেয়।

পরিমিতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সমকোণী চৌপল (*Rectangular Parallelopiped*), প্রিসম (*Prism*), লম্ব বৃত্তাকার চোঙ (*Right circular cylinder*), পিরামিড (*Pyramid*) ও লম্ব-বৃত্তাকার শঙ্কু (*Right circular cone*)—এই ঘন বস্তুগুলির তল ও সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এবং উহাদের আয়তনের ঘনফলগুলি সূত্রগুলি (প্রমাণ ছাড়া) ছাত্রদের জানতে হয়। ঐ সূত্রগুলির প্রমাণ উচ্চ গণিতের বিষয়ীভূত। সুতরাং সূত্রগুলির প্রমাণ ছাত্রদের শেখানো যায় না। সূত্রগুলি মুখস্থ করে ছাত্রেরা যান্ত্রিকভাবে তাদের প্রয়োগ করে। যান্ত্রিক কাজে ছাত্রদের বিশেষ উৎসাহ থাকে না—একথা আমরা বহুবার বলেছি। কাজের ভিতর দিয়ে, বাস্তব সমস্যার সমাধান করতেই তাদের উৎসাহ থাকে।

পাটীগণিতের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে ছাত্রেরা দেখেছে যে, প্রায় সকল সমস্যার সমাধানে ঐকিক নিয়ম দরকার হয়। তাদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে পাটীগণিতের সমস্যার সমাধানে ঐকিক নিয়মেরই প্রয়োগ হবে। পরিমিতি-সংক্রান্ত সরল পাটীগণিতে সমস্যা উত্থাপন করলে তারা বুঝবে যে পরিমিতির সূত্রগুলি শেখা একান্ত প্রয়োজন। পরিমিতি শিক্ষণে তাদের আগ্রহ উদ্দীপিত হলেই, মডেল, চার্ট, বাস্তব উদাহরণ প্রভৃতির সাহায্যে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলির জ্যামিতিক আকারের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করাতে হবে এবং বিভিন্ন বস্তুগুলির সংজ্ঞাগুলি তাদের বোঝাতে হবে। এই সংজ্ঞাগুলি ভালো করে বুঝলেই ছাত্রেরা আরোহী পদ্ধতিতে বুঝতে পারবে যে, যে আকারগুলির কথা বলা

হয়েছে সেগুলি দুটি দলের মধ্যে পড়ে। প্রথম দলটির নাম দেওয়া যেতে পারে প্রিসম দল (*Prism Group*)। এই দলে আছে সমকোণী চৌপল, লম্ব প্রিসম ও লম্ব বৃত্তাকার চোঙ। সমকোণী চৌপলকে বলা যেতে পারে এমন একটি লম্ব প্রিসম যার ভূমি আয়তক্ষেত্র। লম্ব-বৃত্তাকার চোঙকে বলা যেতে পারে এমন একটি লম্ব প্রিসম যার ভূমি অসীম-বাহু-বিশিষ্ট একটি সুষম বহুভুজ অর্থাৎ বৃত্ত। অনুরূপে দ্বিতীয় দলের নাম হবে পিরামিড দল (*Pyramid Group*)। এই দলে আছে লম্ব চতুস্তলক (*Right Tetrahedron*), লম্ব পিরামিড (*Right Pyramid*) ও লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু (*Right Circular Cone*)। এখন ছাত্রেরা বুঝবে যে দল দুটির অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুগুলি সংক্রান্ত সূত্রগুলি তাদের আর পৃথক পৃথকভাবে জানার দরকার নেই। দুটি দলের সাধারণ সূত্রগুলি জানলেই চলবে। এই ভাবে আরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিমিতির পাঠ্য-সূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুগুলিকে দুটি দলে বিভক্ত করে দেখালে ছাত্রেরা পরিমিতি শিখতে আগ্রহ বোধ করবে এবং বিষয়টি তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বেশ সুফল পেয়েছি। এখন তাদের নিম্নলিখিত সূত্রগুলি শেখানো যেতে পারে।

সূত্র ঃ—

১। প্রিসম দল ঃ—

আয়তন $= A.h$ ঘন একক
পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল $= P.h$ বর্গ একক
সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= P.h + 2A$ বর্গ একক

এখানে,

$A =$ ভূমির ক্ষেত্রফল
$h =$ উচ্চতা
$P =$ ভূমির পরিসীমা

২। পিরামিড দল ঃ—

আয়তন $= \frac{1}{3}.A.h$ ঘন একক
পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\ P.l$ বর্গ একক
সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\ (P.l + 2A)$ বর্গ একক

এখানে $l =$ পিরামিডের তির্যক উচ্চতা (*slant height*)

আবার দু দলের সূত্রগুলি তুলনা করলে যে সামঞ্জস্যগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলিও ছাত্রেরা উপলব্ধি করবে।

এখন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সূত্রগুলি প্রয়োগ করতে গিয়ে ছাত্রেরা নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হবে। যেমন ভূমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা। ভূমি আয়তক্ষেত্র হলে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ভূমি যদি ত্রিভুজ হয়, সুষম পঞ্চভুজ

ষড়ভূজ বা বৃত্ত হয়, তখন ক্ষেত্রফল কি হবে? এগুলি বার করার পদ্ধতি এবং যেখানে সূত্র আছে সেখানে সূত্রগুলি শিক্ষক শেখাবেন।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

এবং বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$.

সূত্র দুটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এগুলিতে ব্যবহৃত বর্ণগুলির (*letters*) অর্থ ছাত্রদের কাছে সুস্পষ্ট করতে হবে এবং সাংখ্যমানে বার বার প্রয়োগ করে তাদের অভ্যাস করাতে হবে। প্রিসম অথবা পিরামিডের উচ্চতার পাদবিন্দুর অবস্থান ও পিরামিড দলের অন্তর্গত তির্যক উচ্চতা নির্ণয়ও সমস্যার ভিতর দিয়ে ছাত্রদের শেখাতে হবে।

ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) :—

Trigonom (= ত্রিভুজ) ও *metria* (= মাপ)—এই দুটি শব্দের সংযোগে *Trigonometry* শব্দটি গঠিত। কোন ত্রিভুজের কয়েকটি অংশ জানা থাকলে অপর অংশগুলি বার করা এবং ত্রিভুজ সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা সমাধান করা এই বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব। ইহাকে জ্যামিতির একটি প্রশাখা বলা হয়ে থাকে; যদিও পাটীগণিতের এবং প্রচুর বীজগণিতের ব্যবহার ইহার মধ্য দিয়ে করা হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনে ত্রিভুজ-সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঐ সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্যই ত্রিকোণমিতির উদ্ভব। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের গ্রীক গণিতজ্ঞ হিপারকাসকেই (*Hipperchus*) ত্রিকোণমিতির জনক বলা হয়। গ্রীস তখন জ্যামিতির উচ্চ শিখরে অবস্থিত। *Euclid*-এর জ্যামিতি পূর্বেই প্রণীত হয়। জ্যামিতিকেই অবলম্বন করে হিপারকাস ত্রিকোণমিতির সূচনা করেন। ত্রিভুজের কোণ তিনটি জানা থাকলে বাহুগুলির আনুপাতিক মান তিনটি নির্ণয় করা সম্ভব হয় এই বিজ্ঞানের সাহায্যে। হিপারকাস ত্রিকোণমিতিক কোণের মান-নির্দেশক একটি সারণী প্রণয়ন করেন। টোলেমি (*Ptolemy*) হিপারকাসের সারণী অবলম্বন করে *Almagest* নামক একটি সুসম্বদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গ্রন্থটি গণিতের একটি পাঠ্যপুস্তক ছিল।

দুটি ত্রিভুজ সদৃশকোণী হলে উহাদের বাহুগুলি সমানুপাতী হবে—এই জ্যামিতিক সূত্রটিই ত্রিকোণমিতির ভিত্তিমূল। ত্রিকোণমিতিতে এইজন্য সমকোণী ত্রিভুজ নেওয়া হত। কারণ দুটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি করে সূক্ষ্মকোণ সমান হলে ত্রিভুজ দুটি সদৃশকোণী সুতরাং সদৃশ হয়। অতএব সমকোণী ত্রিভুজের আকার যাই হোক না কেন, একটি কোণ নির্দিষ্ট থাকলে বাহুগুলির পারস্পরিক অনুপাত স্থির থাকবে।

ঋজুরেখ ক্ষেত্রের মধ্যে ত্রিভুজের যে সুবিধা, বক্ররেখ ক্ষেত্রের ভিতর বৃত্তেরও সেই সুবিধা। যে কোন দুটি বৃত্ত সদৃশ ক্ষেত্র। দুটি বৃত্তের পরিধির অনুপাত

আবার এককেন্দ্রিক (*concentric*) দুটি বৃত্তের
তাদের ব্যাসার্ধের অনুপাতের সমান। কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তদ্বয়ে যে দুটি চাপ সৃষ্টি করে তাদের অনুপাত ও বৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্ধের অনুপাতের সমান। সুতরাং একই কেন্দ্রস্থ কোণের জন্য সমস্ত এককেন্দ্রিক বৃত্তের $\frac{\text{চাপ}}{\text{ব্যাসার্ধ}}$ স্থির থাকবে। এই চাপ ও ব্যাসার্ধের অনুপাতকেই পূর্বে কোণের পরিমাণ বলা হত। ইহাকেই বর্তমানে কোণের বৃত্তীয় মান (*circular measure*) বলা হয়। চাপের দৈর্ঘ্য ব্যাসার্ধের সমান হলে কেন্দ্রস্থ কোণের একক বৃত্তীয় মান পাওয়া যায়। কোণের একক বৃত্তীয় মানকেই বর্তমানে এক রেডিয়ান বলা হয়।

সমকোণী ত্রিভুজে কৌণিক বিন্দুকে কেন্দ্র করে এবং অতিভুজকে ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকলে, কোণের বিপরীত বাহুটি ঐ বৃত্তের একটি অর্ধ-জ্যা (*half chord*) হয়। কোণের বিপরীত বাহুকেই (সমকোণী ত্রিভুজে) পূর্ব কোণের *Sine* বলা হত। *Sine* শব্দটি *Sinus* শব্দ থেকে এসেছে—যার মানে 'বক্ষ রেখা'। কোণের বিপরীত বাহুকে বর্ধিত করে বৃত্তচাপের সঙ্গে মিলিত করলে একটি ধনুকের আকার হয়। বর্ধিত কোণ সংলগ্ন বাহুটি ঐ ধনুকের তীর।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনে ত্রিকোণমিতির আবিষ্কার হলেও ব্যবহারিক জীবনে ইহার মূল্য সমধিক। দূরত্ব-নির্ণয়, উচ্চতা-নির্ণয়, জমি-জরিপ প্রভৃতি কাজে ত্রিকোণমিতি অপরিহার্য। জমি জরিপ বা দেশের মানচিত্র রচনায় সমগ্র জমিকে ত্রিভুজসমূহে বিভক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলে Triangulation বা ত্রিভুজীকরণ। ত্রিভুজীকরণের সুবিধা এই যে কোণ মাপক যন্ত্রের সাহায্যে ত্রিভুজের দুটি কোণ মাপলেই তৃতীয় কোণটি জানা যায় এবং একটি বাহু মাপতে পারলেই ত্রিভুজটি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানা যায়।

এখন দেখা যাক ত্রিকোণমিতি কিভাবে শেখানো যাবে।

পাঠক্রমে ত্রিকোণমিতি ঐচ্ছিক গণিতের বিষয়ীভূত। ত্রিকোণমিতি শিক্ষণ সুরু হয় নবম শ্রেণীতে। ইতিমধ্যে ছাত্রেরা পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতিতে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছে। গণিতের বহু সূত্রের সঙ্গে তারা পরিচিত হয়েছে। যারা ঐচ্ছিক গণিতের ছাত্র তাদের দক্ষতার মাত্রা বেশী হবে আশা করা যায়। ছাত্রের বয়সও এখন 14+। সে তখন গণিতের যুক্তি কিছুটা অনুধাবন করে। সে আরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম এবং বিশ্লেষণমূলক অনুসিদ্ধান্তও করতে পারে। বিমূর্ত চিন্তনেও তার কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। এইজন্য সম্পূর্ণরূপে মূর্ত বস্তুকে অবলম্বন করে শিক্ষণ সুরু করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন মত মূর্ত বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

সুরু করা হবে খুব সহজ উচ্চতা-নির্ণয় সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা নিয়ে। যেমন, স্কুল বিল্ডিংএর উচ্চতা কত? ছাত্রেরা এতে বিষয়টি শেখার প্রয়োজনীয়তা বুঝবে এবং শিখতে আগ্রহী হবে। ছাত্রেরা দেখবে কেমন করে শুধু মাত্র একটি কোণ ও কিছুটা দৈর্ঘ্য মেপে উচ্চতাটি নির্ণয় করা যায়।

এখন বিষয়টি আরম্ভ করা যেতে পারে। সুরু করতে হবে সমকোণী ত্রিভুজ

নিয়ে। ছাত্রেরা আগেই জ্যামিতিতে পড়েছে যে সদৃশকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের বাহুগুলি সমানুপাতি। তারা সহজেই বুঝবে যে সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ নির্দিষ্ট হলে—ত্রিভুজটির আকার যাই হোক না কেন—বাহুগুলির অনুপাত স্থির থাকবে। এখন ত্রিভুজের তিনটি বাহু দ্বারা ছটি অনুপাত পাওয়া যায়। একটি কোণ স্থির থাকলে সমস্ত সমকোণী ত্রিভুজে এই ছটি অনুপাতের মান সমান হবে। এই স্থির অনুপাত-গুলির নিম্নোক্তভাবে নামকরণ করা হয়। যদি ABC সমকোণী ত্রিভুজের A কোণটি জানা থাকে—

$\frac{\text{বিপরীত বাহু}}{\text{অতিভুজ}}$ অনুপাতকে *sine* A এবং সংক্ষেপে *sin* A বলে।

$\frac{\text{সংলগ্ন বাহু}}{\text{অতিভুজ}}$ অনুপাতকে *cosine* A এবং সংক্ষেপে *cos* A বলে।

$\frac{\text{বিপরীত বাহু}}{\text{সংলগ্ন বাহু}}$ অনুপাতকে tangent A এবং সংক্ষেপে tan A বলে।

উল্লিখিত তিনটি অনুপাতের বিপরীত অনুপাতগুলি যথাক্রমে cosecant A, secant A ও cotangent A বলা হয় এবং সংক্ষেপে cosec A, sec A এবং cot A বলে।

ছাত্রেরা সহজেই দেখতে পাবে যে cos A, Aর পূরক কোণের sine। এইজন্য এই অনুপাতের compliment sine A নামকরণ হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ঐ নাম cosine A এবং cos Aতে সংক্ষেপিত হয়েছে। cot A সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

এখানে দুটি বিষয় ছাত্রদের কাছে পরিষ্কার করতে হবে—

১। A কোণের মাপ ঠিক থাকলে, sin A, cos A প্রভৃতির মানগুলি, সমকোণী ত্রিভুজের আকারের উপর নির্ভর করে না। উহারা স্থির থাকে।

২। sin A, cos A প্রভৃতি এক একটি অনুপাত অর্থাৎ সংখ্যা। উহারা কোণ নয়।

এই ধারণা দুটি পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন হলে সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন ও তাদের বাহুগুলি পরিমাপ করে ছাত্রেরা দেখতে পারে। (14+ বয়সের এবং ঐচ্ছিক গণিতের অধিকাংশ ছাত্রের ধারণা পরিষ্কার করতে জ্যামিতিক প্রমাণই যথেষ্ট। তবে নিম্নমানের কিছু সংখ্যক ছাত্র শ্রেণীতে থাকতে পারে—তাদের জন্য এই পদ্ধতির প্রায়োজন আছে।) যেমন, শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রই একটি নির্দিষ্ট কোণ-বিশিষ্ট (মনে করা যাক 30°) একটি করে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকবে। তারপর তারা বাহুগুলি পরিমাপ করে sin 30°, cos 30° প্রভৃতির মানগুলি বার করবে এবং দেখবে প্রত্যেকের ফলগুলি অন্য সকলের ফলগুলির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

এখন ছাত্রেরা আরো কয়েকটি ত্রিকোণমিতিক সম্বন্ধ সহজেই দেখতে পাবে। যেমন,

$$\text{cosec } A=\frac{1}{\sin A}, \qquad \sec A=\frac{1}{\cos A}$$

$$\tan A=\frac{1}{\cot A}, \qquad \tan A=\frac{\sin A}{\cos A}$$

$$\cot A=\frac{\cos A}{\sin A}, \qquad \sin^2 A+\cos^2 A=1,$$

$$\sec^2 A-\tan^2 A=1, \qquad \text{cosec}^2 A-\cot^2 A=1.$$

এই সূত্রগুলির সাহায্যে ছাত্রদের দেখানো যেতে পারে—যে কোন ত্রিকোণমিতিক অনুপাত জানা থাকলে কি করে বাকী অনুপাতগুলি বার করা যাবে। সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করেও অনুপাতগুলি সহজেই বার করা যায়। যেমন, মনে করা যাক $\sin A=x$, জানা আছে। এখানে সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ A হলে এবং অতিভুজকে একক দৈর্ঘ্যের মনে করলে, A কোণের বিপরীত বাহু x হবে এবং A কোণ সংলগ্ন বাহুটি হবে $\sqrt{1-x^2}$। এখন সমকোণী ত্রিভুজটির তিনটি বাহুরই মান জানা। সুতরাং cos A, tan A প্রভৃতি অন্যান্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলি সহজেই পাওয়া যাবে।

এখন 30°, 45°, 60° কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলি নির্ণয় করে একটি সারণী তৈয়ারী করা যেতে পারে। এই সারণীর সাহায্যে ছাত্রেরা নানারূপ সমস্যার সমাধান করবে। সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তারা আরো নতুন নতুন সমস্যায় সম্মুখীন হবে যেগুলির সমাধানের জন্য আরো পাঠের অগ্রগতির দরকার হবে।

স্থানাঙ্ক জ্যামিতি (Co-ordinate Geometry) :—

স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বীজগণিত ও জ্যামিতির সমন্বয়ে গঠিত। ইহার সাহায্যে জ্যামিতিক আকারের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সরলরেখা, বৃত্ত, অধিবৃত্ত, উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত প্রভৃতিকে ইহা বীজগণিতের সমীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে Descartes স্থানাঙ্ক জ্যামিতির উদ্ভাবন করেন।

ছাত্রদের দিক নির্দেশক সংখ্যায় জ্ঞান আছে এবং চিত্রলেখে তারা শিখেছে—সমতলে অবস্থিত একটি বিন্দুকে কি করে দুটি স্থানাঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। সুতরাং স্থানাঙ্ক জ্যামিতি শিক্ষণ সুরু করতে শিক্ষকের বিশেষ অসুবিধা হবে না। দুটি পরস্পর লম্ব অক্ষরেখা ও জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে একটি রেখার দৈর্ঘ্য, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল প্রভৃতির সূত্রগুলি ছাত্রদের বোঝাতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। স্থানাঙ্ক জ্যামিতি সুরু করা হয় দশম শ্রেণীতে এবং ইহা ঐচ্ছিক গণিতের বিষয়ীভূত। ছাত্রদের মানসিক বয়সও বিষয়টি বুঝবার উপযোগী।

স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে বিন্দুকে ক্রম-অনুসারে লিখিত দুটি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমন, (2, 5) বিন্দু। সংখ্যা দুটির ক্রমের পরিবর্তন হলে বিন্দুটিরও অবস্থানের পরিবর্তন হয়। যেমন (2, 5) ও (5, 2) বিন্দুদ্বয় ভিন্ন।

স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে জ্যামিতিক আকারকে একটি বিন্দুর সঞ্চারপথ (locus) রূপে কল্পনা করা হয়। ছাত্রেরা এই সঞ্চারপথের ধারণাটি ঠিক করতে পারে না। শিক্ষকও শুধু সঞ্চারপথের সংজ্ঞাটি বলে দিয়ে পাঠে অগ্রসর হন। কিন্তু স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ভিত্তিমূল এই সঞ্চারপথ। সঞ্চারপথের ধারণা পরিষ্কার থাকলে ছাত্রদের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি শিখতে খুব বেগ পেতে হয় না। বিন্দুর সঞ্চারপথ বোঝাতে এবং ঐ সম্বন্ধে ধারণা দিতে শিক্ষক যথেষ্ট সময় নিয়োগ করবেন।

সঞ্চারপথ (Locus) :—

এক বা একাধিক সর্ত (নিয়ম) পালন করে কোন বিন্দু যে পথে চলে, সেই পথকে বিন্দুটির সঞ্চারপথ বলে।

এই সংজ্ঞায় নিহিত নিম্নলিখিত চারটি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষক ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

১। প্রত্যেক সঞ্চারপথের ক্ষেত্রেই এক বা একাধিক সর্ত থাকবে। ঐ সর্ত বা সর্তগুলি পালন করেই বিন্দুটি চলবে বিন্দুটির যে কোন অবস্থানেই উহা ঐ সর্ত বা সর্তগুলি পালন করবে। নিঃসর্তভাবে বা স্বাধীনভাবে কোন বিন্দু চললে কোন সঞ্চারপথ হয় না।

২। প্রদত্ত সর্ত বা সর্তগুলি থেকে সঞ্চারপথটিকে জ্যামিতির সাহায্যে পাওয়া যাবে, অর্থাৎ প্রত্যেক সঞ্চার পথের একটি জ্যামিতিক আকার থাকবে।

৩। স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে বিন্দুকে দুটি স্থানাঙ্কের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। চলমান বিন্দুকে (x, y) ধরা হয়। সুতরাং চলমান বিন্দু যে সর্ত পালন করে তাকে x বা y বা উভয়ের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। অতএব প্রদত্ত সর্ত বা সর্তগুলির সাহায্যে x বা y বা x ও y-এর একটি সমীকরণ পাওয়া যাবে। এই সমীকরণটি সঞ্চার পথের উপর অবস্থিত যে কোন বিন্দুর দ্বারা সিদ্ধ হবে। এই সমীকরণকেই সঞ্চার পথের সমীকরণ বলা হয়। স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে এই সমীকরণই সঞ্চারপথের প্রতিনিধিত্ব করে।

৪। যদি কোন বিন্দু ৩-এ বর্ণিত সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে তা হলে বিন্দুটি সঞ্চার পথের উপর অবস্থিত থাকবে।

মনে রাখতে হবে যে, সঞ্চার পথ একটি চলমান বিন্দু দ্বারা অঙ্কিত পথ। সুতরাং ইহা একটি রেখা—সরল অথবা বক্র। রেখাটির আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ভর করবে—বিন্দুটি যে সর্ত বা সর্তগুলি পালন করে চলবে তার উপর। জ্যামিতিতে বৃত্ত একটি সীমাবদ্ধ স্থান। স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে ঐ সীমাবদ্ধ স্থানের পরিধিকেই বৃত্ত বলে।

পাঠ পরিকল্পনা

[Planning of Lessons]

শিক্ষণে সফলতা অর্জন করতে হলে পূর্ব-পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষকের জ্ঞান যতই থাকুক না কেন, পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া সামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। ছাত্রদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে তাদের মানসিক বয়সের উপযোগী করে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করা দরকার। বিষয়বস্তুর কতটুকু পরিবেশন করতে হবে—কতটুকু বাদ দিতে হবে, ছাত্র কতটুকু নিতে পারবে—এগুলি আগে থেকে চিন্তা করে শিক্ষককে পাঠদানে অগ্রসর হতে হয়। এর জন্য পূর্ব পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন। পরিকল্পনা মত পাঠদান করলে বিষয়বস্তু বেশ গুছিয়ে ধারাবাহিকভাবে ছাত্রদের বোঝান যায়। অবান্তর বিষয় এসে পড়ে না। সময়ের অপব্যয় হয় না। গণিতে পাঠ পরিকল্পনার বিশেষ দরকার আছে। গণিতের শিক্ষা ছাত্রদের চিন্তা, বিচার ও যুক্তি ক্ষমতার উন্নতি করে। ছাত্রদের চিন্তা, বিচার ও যুক্তি ক্ষমতার যাতে প্রয়োগ হয় এমন প্রশ্নের সাহায্যে গণিতের পাঠ পরিকল্পনা করতে হয় শিক্ষককে। পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলে প্রশ্নগুলি সুচিন্তিত ও সুসম্বদ্ধ হয় না।

গণিত শিক্ষককে তিনটি স্তরে পাঠ পরিকল্পনা করতে হয়।

॥ ১ ॥ সারা বৎসরের পাঠ্য-সূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে কোনটির জন্য কত সময় দেওয়া হবে, তা ঠিক করা।

॥ ২ ॥ পূর্ব-নির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়বস্তুকে প্রয়োজন মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এমনভাবে ভাগ করা যাতে একদিনে একটি ক্ষুদ্র অংশে একটি সম্পূর্ণ পাঠ হয়।

॥ ৩ ॥ দৈনন্দিন পাঠের সম্পূর্ণ টীকা তৈরী করা।

বি-এড পাঠক্রমে পাঠ পরিকল্পনার স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বিষয়ের মত গণিত 'মেথড' পরীক্ষায় পাঠটীকা তৈরী করা একটি আবশ্যিক প্রশ্ন। তা ছাড়া 'প্র্যাকটিস টিচিংয়ে'র সময়ও বহু পাঠটীকা পরীক্ষার্থীদের তৈরী করতে হয় এবং পরিকল্পনা মত শ্রেণীতে পড়াতে হয়। এর জন্য কিছু নম্বরও থাকে। আর সবচেয়ে

বড় কথা চূড়ান্ত 'প্র্যাকটিক্যাল' পরীক্ষায় একটি পাঠটীকা তৈরী করতে ও শ্রেণীতে পড়াতে হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট থাকে একশত নম্বর। সুতরাং পাঠ পরিকল্পনার রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য হার্বার্টীয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতির মূল নীতি হচ্ছে—পূর্বজ্ঞানের ভিত্তির উপর নতুন জ্ঞান দান করা। 'জানা থেকে অজানার' নীতি অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়া হয় এই পদ্ধতিতে। আরোহী পদ্ধতিতে যুক্তি অনুসরণ করে ধাপে ধাপে পাঠ অগ্রসর হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে ছকে বাঁধা হার্বার্টীয় পদ্ধতিই গণিতে অনুসরণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যদি অধিকতর সুফল পাওয়া যায় তাহলে বিজ্ঞানসম্মত ব্যতিক্রম সমর্থনযোগ্য হবে।

হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনা করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার ঃ

॥ ১ ॥ গণিতের পাঠ মূলতঃ যুক্তি-অনুসারী। গণিত উপলব্ধির বিষয়। এর প্রতিটি পদক্ষেপ যুক্তির দ্বারা চালিত। এখানে heuristic প্রশ্ন খুব কার্যকর।

॥ ২ ॥ গণিতে কতকগুলি সূত্র বা নিয়ম শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়। আরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই সূত্রগুলি যাতে ছাত্রেরাই আবিষ্কার করতে পারে সে দিকে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে।

॥ ৩ ॥ গণিতে সংশ্লেষণ পদ্ধতি অপেক্ষা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, অবরোহী পদ্ধতি অপেক্ষা আরোহী পদ্ধতি শ্রেয়।

॥ ৪ ॥ গণিত একটি ধারাবাহিক বিষয়। ইহার কোন বিচ্ছিন্ন অংশ নেই। পাঠ পরিচালনার সুবিধার জন্য বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে। কোন একটি দিনের পাঠ এইরূপ সম্পূর্ণ একটি অংশ হতে পারে কিংবা একটি বৃহৎ অংশের অংশও হতে পারে। বৃহত্তর অংশটিতে 'সাধারণ পাঠ' (Major unit) এবং দিনের পাঠটিকে 'বিশেষ পাঠ' (Minor unit) আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু দেখতে হবে যে দিনের পাঠের এককটি যেন একটি সম্পূর্ণ পাঠ হয়। ছাত্রেরা যেন পাঠশেষে উপলব্ধি করে যে একটা নতুন কিছু তারা শিখেছে।

॥ ৫ ॥ পাঠের একটি সুচিন্তিত উদ্দেশ্য থাকা উচিত। উদ্দেশ্য একাধিক হলে একটি হবে মুখ্য এবং অপরগুলি হবে গৌণ, ছাত্রদের বিষয়বস্তু শেখানোই হবে মুখ্য বা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য। তবে উদ্দেশ্যকে মুখ্য ও গৌণ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—এই দুভাবে আলাদা না করলেও চলে। বরং উভয়ের সমন্বয়ে একটি উদ্দেশ্য স্থির করাই

অনেক সময় ভালো। নতুন পাঠের উদ্দেশ্যটি ছাত্রদের পরিষ্কারভাবে শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন।

॥ ৬ ॥ উদ্দেশ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ছাত্রদের মানসিক বয়স, যুক্তি করার ক্ষমতা, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, উপকরণ, পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য এবং শিক্ষকের দক্ষতার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

॥ ৭ ॥ পূর্বজ্ঞান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সত্যই আগে যা পড়ানো হয়েছে তাকেই ভিত্তি করতে হবে। এখানে আন্দাজে কিছু করা চলে না।

॥ ৮ ॥ এমন কোন উপকরণের কথা পাঠটীকায় উল্লেখ করা যাবে না যা বাস্তবে সংগ্রহ বা উপস্থাপন করা যাবে না। উপকরণে বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিত নয়। বিষয়টি মূর্ত করার জন্যই উপকরণের দরকার। উপকরণ হবে সুনিয়ন্ত্রিত, আকর্ষণীয় ও স্বল্প সংখ্যক।

॥ ৯ ॥ পাঠঘোষণাটি সুগঠিত হওয়া উচিত। 'আমরা আজ এই বিষয়টি পড়বো'—হঠাৎ এভাবে পাঠঘোষণা করা উচিত নয়।

॥ ১০ ॥ উপস্থাপনের সময়ও ছাত্রদের মানসিক বয়সের দিকে নজর রাখতে হবে। বিষয়বস্তু যেন ছাত্রেরা বুঝতে পারে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে। লাভ-ক্ষতি সপ্তম শ্রেণীতেও শেখানো হয় আবার নবম শ্রেণীতেও শেখানো হয়। দুই ক্ষেত্রে বিষয়ের গুরুত্বের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে।

নতুন বিষয়কে অবলম্বন করেই পদ্ধতিগত প্রশ্ন করতে হবে। এ সময়ে ধাপে ধাপে ছোট ছোট প্রশ্ন করে বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রশ্নগুলিকে সমস্ত ক্লাসেই ছড়িয়ে করা উচিত। মনে রাখতে হবে যে, এই স্তরের প্রশ্নগুলি ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নয়—নতুন জ্ঞান উপলব্ধি করার সহায়তা করার জন্য। তাই প্রশ্নগুলি হবে যুক্তিযুক্তভাবে পর পর ধাপে একটি শৃঙ্খলে (chain) আবদ্ধ। এই প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য হবে ছাত্রদের যুক্তি শক্তি, বিচার শক্তি, বিশ্লেষণ শক্তি, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি বাড়ানো।

ঠিক মত প্রশ্ন করা একটি নিপুণ কলা। শিক্ষক প্রশ্ন করা সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম অভ্যাস করবেন। প্রথমত মনে রাখতে হবে যে কোন প্রশ্ন দ্ব্যর্থবোধক হবে না। প্রতি প্রশ্নের উত্তর যেন একটি হয় এবং এমন ভাবে প্রশ্নটি করতে হবে যাতে উত্তর দেবার সময় ছাত্রকে অন্তত একটি পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতে হয়; হ্যাঁ বা না বলে উত্তর করা যায় না। আবার দেখতে হবে প্রশ্নের মধ্যেই যেন উত্তরের সঙ্কেত না থাকে।

দু ধরনের প্রশ্ন করাই সমীচীন। (১) ছাত্রদের তথ্যভাণ্ডার উন্মোচনের জন্য এবং (২) তাদের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য। প্রথম ধরনের প্রশ্নগুলি কি, কখন বা কোথায় শব্দগুলির সাহায্যে করতে হবে এবং দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নগুলি করতে হবে কেন বা কি ভাবে শব্দগুলির সাহায্যে।

॥ ১১ ॥ সামান্যীকরণ বা সূত্র নির্ধারণ ছাত্রদের সহায়তায় আরোহী পদ্ধতিতে করা উচিত। উপস্থাপনের মূর্ত স্তর থেকে ধীরে ধীরে বিমূর্ত স্তরে অগ্রসর হতে হবে। ছাত্রদের মানসিক বয়সের দিকে দৃষ্টি রেখে উপমা, তুলনা প্রভৃতির মাধ্যমে এবং সুকৌশলে প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় সূত্র বা নিয়ম গঠন করবেন।

॥ ১২ ॥ অভিযোজনের প্রশ্নগুলি হবে দিনের অধীত বিষয়ের প্রয়োগ মূলক। এখানে সমগ্র বিষয়টির উপর ৩।৪টি প্রশ্ন থাকলেই হবে।

॥ ১৩ ॥ গৃহ কাজের উদ্দেশ্য হবে দিনের শ্রেণীপাঠের অভ্যাস করা। পরের দিনের কাজের প্রস্তুতি হবে না। যে তত্ত্ব সূত্র বা নিয়ম ছাত্রেরা বুঝতে পেরেছে তারই অভ্যাসের জন্য গৃহ কাজ থাকবে। যে কয়েকটি জিনিস মনে রাখা দরকার সেগুলি যাতে ছাত্রেরা স্মৃতিতে ধারণ করতে পারে গৃহ কাজে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গণিতের পাঠটীকা প্রস্তুতের বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রম অনুসারে স্তরগুলি কিভাবে সাজানো হবে তা পর পৃষ্ঠায় দেখানো হল।

পাঠটীকা

বিদ্যালয়………	বিষয়…………
শ্রেণী…………	সাধারণ পাঠ…
ছাত্রসংখ্যা ……	বিশেষ পাঠ…
গড় বয়স……	পাঠক্রম ……..
সময়…………	* (১)
তারিখ…… …	(২)
শিক্ষক/শিক্ষিকা…	(৩)
	*অদ্যকার পাঠ।

উদ্দেশ্য (Aim) :—

উপকরণ (Apparatus) :—

আয়োজন (Preparation) :—

পাঠঘোষণা (Announcement) :—

উপস্থাপন (Presentation) :—

সূত্র নির্ধারণ (Generalization) :—

অভিযোজন (Application) :—

গৃহকাজ (Home Task) :—

মূল পদ্ধতিতে হার্বার্ট চারটি ধাপ রাখেন। এগুলি—১। স্পষ্টতা (clearness) ২। অনুষঙ্গ (association) ৩। সুসংবদ্ধতা (system) ও ৪। নিয়মানুগ অনুশীলন বা পদ্ধতি (Method)

হার্বার্ট শিষ্য জিলার (Ziller) প্রথম ধাপ স্পষ্টতাকে দুটি ধাপে বিভক্ত করেন। যথা,—আয়োজন (preparation) ও উপস্থাপন (presentation)। পরে রিড (Reid) অয়োজন ধাপে 'উদ্দেশ্য' (aim) নামে একটি উপধাপ সংযোজন করেন। বাকী তিনটি ধাপের নামও আধুনিক হার্বার্টীয়গণ পরিবর্তন করেন। ফলে হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে পাঁচটি ধাপ আছে। বর্তমানে তিনটি ধাপেই পাঠটীকা সম্পূর্ণ করা হয়। প্রথম ধাপ আয়োজন। এই ধাপের প্রথমে উদ্দেশ্য ও উপকরণ থাকে এবং শেষে পাঠঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় ধাপ উপস্থাপন। এই ধাপের শেষে

সামান্যীকরণ বা সূত্র নির্ধারণ করা হয়। তৃতীয় ধাপ অভিযোজন। এই ধাপের শেষে গৃহকাজ থাকে।

উল্লিখিত স্তর বিন্যাস মনে রাখলে পাঠটীকা তৈরী করা সহজ হবে।

পরিশেষে বলা দরকার যে, পূর্ব পরিকল্পনা মত পাঠটীকা প্রস্তুত করলেও ক্লাসে পড়াবার সময় সেই পাঠটীকাকে যন্ত্রের মত অনুসরণ করতে হবে এমন নয়। পাঠটীকা তৈরী করা হয় পূর্ব ধারণা অনুযায়ী। কিন্তু ক্লাসের পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হতে পারে। পাঠটীকা ঠিক মত অনুসরণ করা নাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে শিক্ষককে মনে মনে নতুন পরিকল্পনা তৈরী করে নিতে হবে। তৈরী করা পাঠটীকা থেকে প্রয়োজন মত কিছু বিচ্যুতিও সমর্থন যোগ্য হবে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে পাঠটীকার মূল উদ্দেশ্য বিষয়টিকে ছাত্রদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা—তাদের বিষয়টি শিখতে আগ্রহী করা ও সাহায্য করা।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে কয়েকটি পাঠটীকার নমুনা দেওয়া হল।

পাঠটীকা—১

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—VI
ছাত্রসংখ্যা—40
গড় বয়স—11+
সময়—40 মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক/শিক্ষিকা—

বিষয়—পাটীগণিত
সাধারণ পাঠ—দশমিক ভগ্নাংশ
বিশেষ পাঠ—দশমিক ভগ্নাংশের প্রথম পাঠ
(অদ্যকার পাঠ)

উদ্দেশ্য—দশমিক ভগ্নাংশের অর্থ বুঝতে ছাত্রদের সাহায্য করা এবং তাদের যুক্তি ও চিন্তা শক্তির বিকাশ সাধন করা।

উপকরণ—শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—ছাত্রদের পাঠে আগ্রহী করার জন্য তাদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষক নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করবেন :

(1) $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{5}{18}$ বলতে কি বুঝ ? এগুলিকে কি সংখ্যা বলে ?
(2) 10 ভাগের 1 ভাগকে ভগ্নাংশে কি ভাবে লিখবে ?
(3) 100 ভাগের 1 ভাগকে ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।
(4) একক স্থানের 4 সংখ্যাকে দশক স্থানে লিখলে তার মান কি হয় ?
(5) একক স্থানের 4 সংখ্যাকে শতক স্থানে লিখলে তার মান কি হবে ?

পাঠঘোষণা—"যে নিয়মে অখণ্ড সংখ্যাগুলি লেখা হয়, যার বিস্তৃতি করে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে অনেক সুবিধা হয়—সেই দশমিক ভগ্নাংশ সম্বন্ধে আজ আমরা আলোচনা করব।"—এই কথা বলে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন।

উপস্থাপন—শিক্ষক ব্ল্যাক-বোর্ডে নিম্নলিখিত চার্টটি লিখবেন। তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হবেন।

দশমিক চার্ট

সহস্রক 1000	শতক 100	দশক 10	একক 1	দশাংশ $\frac{1}{10}$	শতাংশ $\frac{1}{100}$	সহস্রাংশ $\frac{1}{1000}$
			7			
		7	0			
	7	0	0			
7	0	0	0			
				7		
				0	7	
				0	0	7

বিষয়	পদ্ধতি
7	ছবিতে প্রথম সারিতে যে সংখ্যা লেখা আছে তার মান কত ?
70	দ্বিতীয় সারিতে যে সংখ্যা লেখা আছে তার মান কত ?
এককের ঘরে আছে।	প্রথম সারিতে 7 কোন ঘরে আছে ?
দশকের ঘরে আছে।	দ্বিতীয় সারিতে 7 সংখ্যাটি কোন ঘরে আছে ?
10 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।	এখানে 7 এর মান কত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
শতকের ঘরে 7এর মান 700 এবং উহা এককের ঘরের 7এর মানের চেয়ে 100 গুণ বড়।	শতকের ঘরে যে 7 সংখ্যাটি আছে তৃতীয় সারিতে তার মান কত এবং উহা এককের ঘরের 7 সংখ্যার চেয়ে কত গুণ বড় ?
সহস্রকের ঘরে 7-এর মান 7000 এবং উহা এককের ঘরের 7 সংখ্যাটির চেয়ে 1000 গুণ বড়।	সহস্রকের ঘরে 7 বসালে ইহার মান কত হয় এবং উহা এককের 7 সংখ্যার চেয়ে কত গুণ বড় ?
এককের ঘর থেকে 7 সংখ্যা দশকের ঘরে বসলে বাম দিকে এক ঘর সরছে এবং মান 10 গুণ বাড়ছে।	এককের ঘর থেকে 7 সংখ্যাটি দশকের ঘরে বসলে কোন দিকে কত ঘর সরছে ? মান কত বাড়ছে ?
শতকের ঘরে 7 সংখ্যা এলে একক থেকে বাম দিকে দু ঘর সরছে এবং মান 100 গুণ বাড়ছে।	শতকের ঘরে 7 সংখ্যাটি এলে একক ঘর থেকে কোন দিকে কত ঘর সরছে ? মান কত বাড়ছে ?

অনুরূপে সহস্রকের ঘরে 7 সংখ্যাটি এলে শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় দেখাবেন যে, সংখ্যাটি একক থেকে বাম দিকে তিন ঘর সরছে এবং ইহার মান 1000 গুণ বাড়ছে।

সহস্রকের 7 সংখ্যাটি শতকের ঘরে বসলে, ডান দিকে এক ঘর সরছে এবং মান 10 ভাগ কমছে।	সহস্রকের 7 সংখ্যাটি শতকের ঘরে বসলে, কোন দিকে কত ঘর সরছে এবং মান কত ভাগ কমছে ?

বিষয়	পদ্ধতি
7 সংখ্যাটি দশকের ঘরে বসলে সহস্রক থেকে ডান দিকে দু ঘর দূরে থাকে এবং মান 100 ভাগ কমে।	7 সংখ্যাটি দশকের ঘরে বসলে সহস্রক থেকে কোন দিকে কত ঘর দূরে থাকে? মান কত ভাগ কমে?

অনুরূপে এককের ঘরে 7 সংখ্যাটি এলে কি হয় শিক্ষক বোঝাবেন। শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় নিম্নলিখিত নিয়মটি গঠন করবেন ঃ

যে কোন অঙ্ক সংখ্যা তার অবস্থান থেকে বাম দিকে এক ঘর সরলে তার মান 10 গুণ বৃদ্ধি পায় এবং ডান দিকে এক ঘর সরলে তার মান 10 ভাগ হ্রাস পায়।

একক থেকে 7 অঙ্ক সংখ্যাটি ডান দিকে এক ঘর সরলে মান 10 ভাগ কমে এবং তখন মানটি $\frac{7}{10}$ হয়।	এককের 7 অঙ্ক সংখ্যাটি ডান দিকে এক ঘর সরলে তার মান কত ভাগ কমে এবং মানটি কত হয়?
7 অঙ্ক সংখ্যাটি একক থেকে ডান দিকে দু ঘর দূরে বসলে মানটি 100 ভাগ কমে এবং $\frac{7}{100}$ হয়।	এককের 7 অঙ্ক সংখ্যাটি ডান দিকে দু ঘর দূরে বসলে তার মান কত ভাগ কমে এবং মানটি কত হয়?
7 অঙ্ক সংখ্যাটি একক থেকে ডান দিকে তিন ঘর সরলে মানটি 1000 ভাগ কমে এবং $\frac{7}{1000}$ হয়।	এককের 7 অঙ্ক সংখ্যাটি ডান দিকে তিন ঘর সরলে তার মান কত ভাগ কমে এবং কি হয়?

শিক্ষক এককের ডানদিকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্থানগুলিকে যথাক্রমে দশাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ প্রভৃতি নামে অভিহিত করবেন ঃ—

শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় নিম্নলিখিত নিয়মটি গঠন করবেন ঃ

দশাংশে, শতাংশে, সহস্রাংশে 7 অঙ্ক সংখ্যাটি থাকলে উহারা ভগ্নাংশ সংখ্যা হয় এবং উহাদের মান যথাক্রমে $\frac{7}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{7}{1000}$ হয়।

তিনি আরও বলবেন যে, উল্লিখিত ভগ্নাংশগুলিকেই দশমিক ভগ্নাংশ বলে। এখন একই সংখ্যা অবস্থান ভেদে পূর্ণসংখ্যা হচ্ছে আবার দশমিক ভগ্নাংশও হচ্ছে। সুতরাং দশমিক ভগ্নাংশগুলিকে পূর্ণসংখ্যাগুলি থেকে পৃথক করার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। এখানে দশমিক চিহ্নের ক্রমবিকাশ শিক্ষক বিবৃত করবেন এবং বর্তমানে ব্যবহৃত চিহ্নটি (দশমিক বিন্দু) ছাত্রদের শিখিয়ে দেবেন। শিক্ষক ছাত্রদের দেখাবেন দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা কি ভাবে লিখতে হয়।

যেমন—$\frac{7}{10}$ = ·7, $\frac{7}{100}$ = ·07, $\frac{7}{1000}$ = ·007.

এর পর শিক্ষক দেখাবেন দশমিক পদ্ধতিতে কোন সংখ্যাকে দশ দিয়ে গুণ করলে

দশমিক বিন্দুটি ডান দিকে এক ঘর সরে যায় এবং 10 দিয়ে ভাগ করলে বাম দিকে এক ঘর সরে যায়।

অভিযোজন—ছাত্রেরা দশমিক ভগ্নাংশের অর্থ ঠিক বুঝছে কি-না এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে কি-না পরীক্ষা করার জন্য শিক্ষক নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করবেন :—

ক। দশমিক পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলি কি ভাবে প্রকাশ করবে ?

(1) $\frac{4}{10}$, $\frac{9}{10}$, $\frac{8}{100}$; (2) $5+\frac{2}{10}$, $3+\frac{6}{10}+\frac{5}{100}$;

(3) $4+\frac{3}{100}$, $8+\frac{7}{1000}$

খ। ভাষায় প্রকাশ কর :—3·4, ·27, ·042, 2·028

গ। গুণ ও ভাগ কর :—

(1) 5·3 কে 10 দিয়ে, (2) 8·33 কে 10 দিয়ে

(3) 3·0384 কে 100 দিয়ে (4) 23·723 কে 1000 দিয়ে

ঘ। (1) 17 টাকা 73 পয়সাকে টাকায় লেখ।

(2) 21 টাকা 5 পয়সাকে টাকায় লেখ।

(3) 9 3 পয়সাকে টাকায় লেখ।

(4) 325 গ্রামকে কিলোগ্রামে লেখ।

গৃহ-কাজ—ক। দশমিক ভগ্নাংশে লেখ :- $3+\frac{5}{10}+\frac{7}{100}$, $36+\frac{5}{100}+\frac{3}{1000}$

খ। ভগ্নাংশে লেখ :—5·84, 3·79, 104·025

গ। গুণ ও ভাগ কর :—

3·357 কে 10 দিয়ে, 36·456 কে 1000 দিয়ে

ঘ। (1) 1334 পয়সাকে টাকায় লেখ।

(2) 1527̇5 গ্রামকে কিলোগ্রামে লেখ।

পাঠটীকা—২

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—VII
ছাত্রসংখ্যা—40
গড় বয়স 12+

সময়—40 মিনিট

তারিখ—
শিক্ষক/শিক্ষিকা

বিষয়—পাটীগণিত
সাধারণ পাঠ—দশমিক ভগ্নাংশ
বিশেষ পাঠ—আবৃত্ত দশমিক
পাঠক্রম * (১) আবৃত্ত দশমিকের প্রথম পাঠ ও ধারণা
(২) আবৃত্ত দশমিক সংখ্যাকে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিবর্তন
* অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য—আবৃত্ত বা পৌনঃপুনিক দশমিকের জ্ঞান লাভে ছাত্রদের সহায়তা করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি শক্তির বিকাশ করে গণিতে আগ্রহী করা।

উপকরণ—শ্রেণী কক্ষের সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—ছাত্রদের অদ্যকার পাঠে আগ্রহী করার জন্য তাদের পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করা হবে।

(1) ·23 কে কিরূপ সংখ্যা বলে ?

(2) $\frac{71}{1000}$ কোন দশমিক ভগ্নাংশের সমান ?

(3) 1 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল কত ?

(4) $\frac{1}{3}$ কে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তরিত কর।

পাঠঘোষণা—"তোমরা দেখছ যে, $\frac{1}{3}$ ভগ্নাংশটিকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে গেলে ভাগফলে 3 সংখ্যাটি বার বার আসে। যে দশমিক ভগ্নাংশে এক বা একাধিক সংখ্যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়, আজ আমরা সেই সমস্ত আবৃত্ত বা পৌনঃপুনিক দশমিক সম্বন্ধে আলোচনা করব।"—এই বলে শিক্ষক পাঠঘোষণা করবেন।

উপস্থাপন—ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতার সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠে অগ্রসর হবেন।

বিষয় | **পদ্ধতি**

সমস্যা ১। $\frac{1}{9}$ ভগ্নাংশটিকে ভাগক্রিয়ার সাহায্যে দশমিক ভগ্নাংশে পরিবর্তন কর।

```
9)10('1111
   9
  ---
   10
    9
  ---
   10
    9
  ---
   10
    9
  ---
    1
```

ভাগফল '1111··· হয়।

$\frac{1}{9}$ কে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে ভাগফল কত হয়?

প্রতিবার ভাগ করার পর একই ভাগশেষ 1 থাকছে।

ভাগফল শেষ হচ্ছে না কেন?

1 সংখ্যাটি ভাগফলে বার বার ফিরে আসছে।

ভাগফলে কোন সংখ্যাটি পুনঃ পুনঃ ফিরে আসছে?

যতবার ভাগক্রিয়া চালান হবে ততবার ভাগফলে 1 সংখ্যাটি আসবে।

কতবার ভাগফলে 1 সংখ্যাটি আসবে?

শিক্ষক এখন ছাত্রদের বলবেন যে 1 সংখ্যাটি দশমিক অংশে পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হচ্ছে বলে উহাকে আবৃত্ত বা পৌনঃপুনিক দশমিক বলে।

সমস্যা 2। $\frac{3}{11}$ ভগ্নাংশটিকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় নিম্নলিখিতভাবে বোর্ডে অংকটি করবেন—

```
11)30('2727
   22
  ---
    80
    77
  ---
    30
    22
  ---
    80
    77
  ---
     3
```

বিষয়	পদ্ধতি
ভাগফলে 2 ও 7 সংখ্যা দুটি বার বার আসছে।	$\frac{3}{11}$ কে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করতে গিয়ে ভাগফলে কোন কোন সংখ্যা বার বার আসছে ?
ভাগক্রিয়ায় ভাগশেষে পর্যায়ক্রমে 8 3 সংখ্যা দুটি আসছে।	2 ও 7 ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা ভাগফলে আসছে না কেন ?
ভাগফলে যখন 2 বসছে তখন ভাগশেষ 8 থাকছে ; আবার যখন ভাগফলে 7 বসছে তখন ভাগশেষে 3 থাকছে।	ভাগশেষে কখন 8 ও কখন 3 হচ্ছে ?
ভাগক্রিয়া যতক্ষণ চালান হবে, ততক্ষণই 2 ও 7 পর্যায়ক্রমে আবৃত্ত হবে ?	ভাগফলে কতবার 2 ও 7 আবৃত্ত হবে ?
দশমিকের 2 ও 7 অর্থাৎ 27 আবৃত্ত দশমিক।	এখানে আবৃত্ত দশমিক কি হবে ?

সমস্যা ৩। $\frac{17}{66}$ ভগ্নাংশটিকে শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করবেন।

```
66)170('25757
   132
   ---
    380
    330
    ---
     500
     462
     ---
      380
      330
      ---
       500
       462
       ---
        38
```

পূর্বানুরূপ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক দেখাবেন যে, দশমিকের প্রথম সংখ্যা 2 আবৃত্ত হয়নি, কিন্তু পরবর্তী দুটি সংখ্যা 5 ও 7 ভাগফলে পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হচ্ছে।

শিক্ষক ছাত্রদের বলবেন যে, দশমিক ভগ্নাংশের যে অংশ পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় তাকে আবৃত্ত অংশ বলে এবং যে অংশটি আবৃত্ত হয় না তাকে অনাবৃত্ত অংশ বলে।

বিষয় — **পদ্ধতি**

অনাবৃত্ত অংশ 2।

·25757…… দশমিক ভগ্নাংশে অনাবৃত্ত অংশ কোনটি?

আবৃত্ত অংশ 57।

ঐ দশমিক ভগ্নাংশে আবৃত্ত অংশ কোনটি?

সমস্যা ৪। $2\frac{5}{22}$ কে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

ছাত্রদের সহায়তায় নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষক অংকটি করবেন—

$$2\frac{5}{22} = 2 + \frac{5}{22}$$

```
22)50(·22727
   44
   ---
    60
    44
    ---
    160
    154
    ---
      60
      44
      ---
      160
      154
      ---
        6
```

$$\therefore 2\frac{5}{22} = 2\cdot22727\ldots\ldots$$

আবৃত্ত অংশ 27।

এখানে আবৃত্ত অংশটি কি?

অনাবৃত্ত অংশ 2·2।

অনাবৃত্ত অংশটি কি এখানে?

এখন শিক্ষক বলবেন যে আবৃত্ত দশমিক অংশটিকে বার বার না লিখে উহাকে বোঝাবার জন্য একটি প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যে অংকটি বার বার আবৃত্ত হয়, সেটি বার বার না লিখে অংকটির মাথায় (˙) বিন্দু চিহ্নটি বসানো হয়। যদি একাধিক অংক আবৃত্ত হয় তা হলে প্রথম ও শেষ অংক দুটির মাথায় (˙) বিন্দু চিহ্নটি বসানো হয়।

$\cdot1111\ldots\ldots = \cdot\dot{1}$

·1111…… আবৃত্ত দশমিকটি প্রতীকের সাহায্যে লেখ।

বিষয়	পদ্ধতি
$\cdot 272727\cdots\cdots = \cdot\dot{2}\dot{7}$	$\cdot 272727\cdots$ কে কিভাবে লিখবে ?
$\cdot 25757\cdots\cdots = \cdot 2\dot{5}\dot{7}$	$\cdot 25757\cdots$ কে বিন্দু চিহ্ন দিয়ে লেখ।
$2\cdot 22727\cdots\cdots = 2\cdot 2\dot{2}\dot{7}$	$2\cdot 22727\cdots$ কে আবৃত্ত দশমিকে প্রকাশ কর।

এখন শিক্ষক বলবেন যে $\cdot\dot{5}$, $\cdot\dot{1}\dot{7}$ প্রভৃতি আবৃত্ত দশমিকে অনাবৃত অংশ নেই। এইরূপ আবৃত্ত দশমিককে বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক বলে। আবার $\cdot 2\dot{0}\dot{7}$, $2\cdot 4\dot{3}0\dot{6}$ প্রভৃতি আবৃত্ত দশমিকে অনাবৃত্ত অংশও আছে বলে এইরূপ সংখ্যাকে মিশ্র আবৃত্ত দশমিক বলে।

অভিযোজন—অদ্যকার পাঠ ছাত্ররা ঠিক আয়ত্ত করেছে কিনা জানার জন্য শিক্ষক নিম্নানুরূপ প্রশ্ন ও কাজের অবতারণা করবেন।

(1) $2\cdot 1\dot{2}0\dot{4}$ আবৃত্ত দশমিকে আবৃত্ত ও অনাবৃত্ত অংশগুলি বল।

(2) $\cdot 0\dot{1}\dot{7}$, $\cdot\dot{4}\dot{7}$, $1\cdot\dot{4}\dot{5}$, $\cdot\dot{1}47\dot{3}$ আবৃত্ত দশমিকগুলির মধ্যে কোনটি বিশুদ্ধ ও কোনটি মিশ্র আবৃত্ত দশমিক বল।

(3) আবৃত্ত দশমিকে প্রকাশ কর—

(ক) $\frac{4}{7}$ (খ) $3\frac{1}{6}$

গৃঃ কাজ—আবৃত্ত দশমিকে পরিণত কর—

(ক) $\frac{7}{90}$, (খ) $\frac{13}{99}$, (গ) $1\frac{5}{66}$

পাঠটীকা—৩

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—VII
ছাত্রসংখ্যা—40
গড় বয়স—12+
সময়—40 মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক/শিক্ষিকা—

বিষয়—পাটীগণিত
সাধারণ পাঠ—ঐকিক নিয়ম
বিশেষ পাঠ—ঐকিক নিয়মের প্রথম পাঠ ও
(1) গুণ ক্রিয়া নির্ভর সরল সমস্যার সমাধান
(2) ভাগ ক্রিয়া নির্ভর সরল সমস্যার সমাধান
(3) গুণ ও ভাগ ক্রিয়া সমন্বিত সরল " "
(4) গুণ ও ভাগ ক্রিয়া সমন্বিত ব্যস্ত " "
(অন্তকার পাঠ)

উদ্দেশ্য—ঐকিক নিয়মের সাহায্যে সমস্যা সমাধানে ছাত্রদের সাহায্য করা এবং তাদের যুক্তি ও বিচার শক্তি উন্নত করা।

উপকরণ—শ্রেণী কক্ষের সাধারণ সরঞ্জাম।

আয়োজন—ছাত্রদের পাঠে আগ্রহী করার জন্য তাদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন :—

(1) একটি ছাত্র বিদ্যালয়ে যাতায়াতে রোজ 2 মাইল হাঁটে। 6 দিনে সে কত মাইল হাঁটবে?

(2) একটি জামার দাম টা. 7·25। 8টি জামার দাম কত?

(3) 8টি চেয়ারের দাম 120 টাকা। একটি চেয়ারের দাম কত?

পাঠঘোষণা—"কয়েকটি জিনিসের দাম ওজন প্রভৃতি দেওয়া থাকলে একটি জিনিসের দাম, ওজন প্রভৃতি যে পদ্ধতিতে বার করা হয় তাকে ঐকিক নিয়ম বলে। ঐকিক নিয়ম অবলম্বন করে কি করে সমস্যা সমাধান করতে হয় আজ আমরা সেই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করব।"—এই বলে শিক্ষক পাঠঘোষণা করবেন।

উপস্থাপন—কয়েকটি সমস্যা আবিষ্কারমূলক পদ্ধতিতে সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠ দানে অগ্রসর হবেন।

বিষয়	পদ্ধতি
॥ সমস্যা ১ ॥ 7 জন লোকের একটি জমিতে লাঙ্গল দিতে 5 দিন সময় লাগে। একজন লোক ঐ জমি কদিনে লাঙ্গল দেবে? (গুণ ক্রিয়া নির্ভর সরল সমস্যা)	